২৩ অগস্ট ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

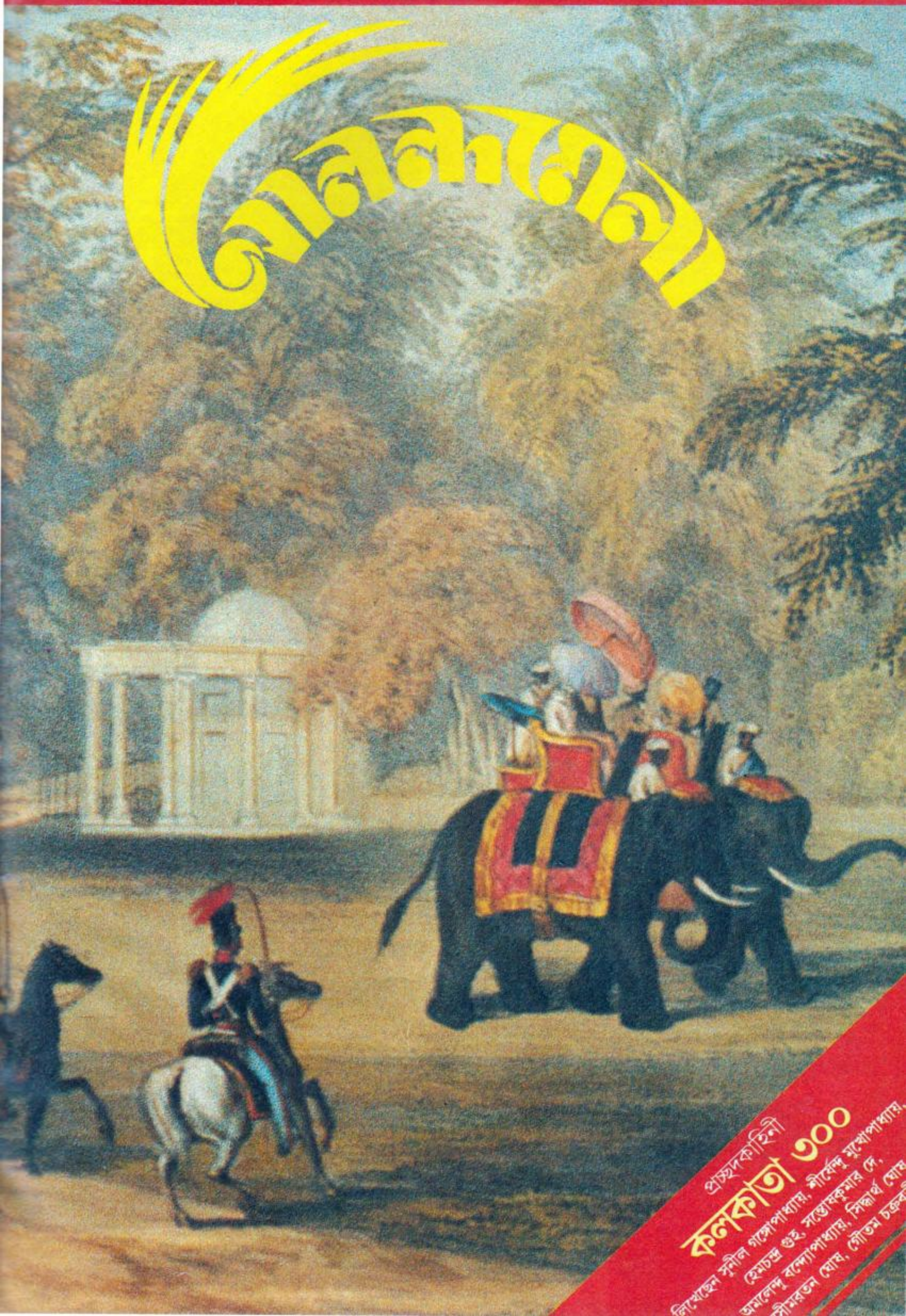

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্টিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

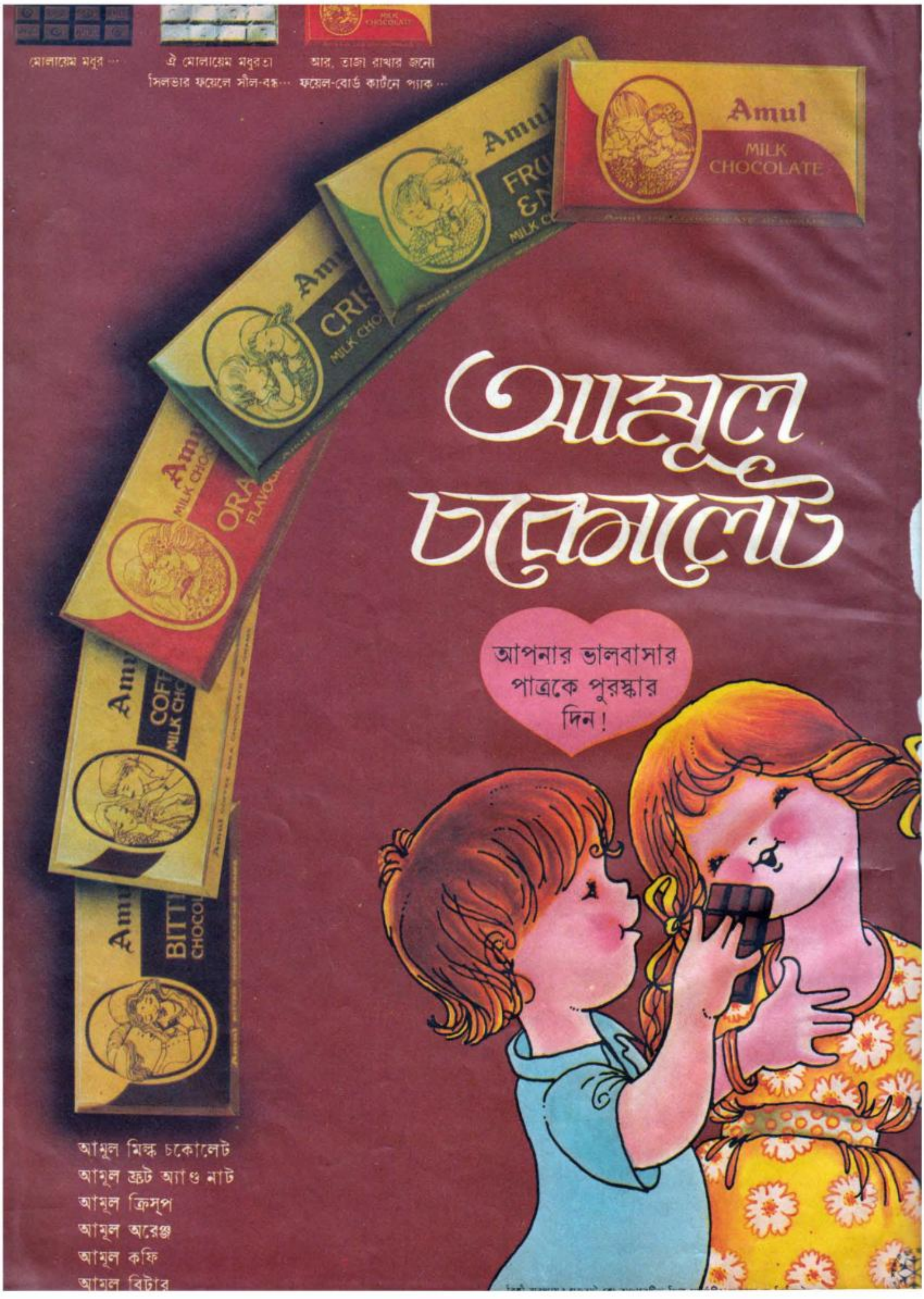
মোলায়েম মধুর ···
ঐ মোলায়েম মধুরতা
সিলভার ফয়েলে সীল-বন্ধ···
আর, তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কার্টনে প্যাক ···
Amul
MILK CHOCOLATE
আমূলে চকোলেট
আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন!
আমূল মিল্ক চকোলেট
আমূল ফ্রুট অ্যাণ্ড নাট
আমূল ক্রিস্‌প
আমূল অরেঞ্জ
আমূল কফি
আমূল বিটার

আপনার সোনামণিকে যখন স্কুলে পাঠাবেন,
দ্বিগুণ লাভ সঙ্গে দেবেন !
সুস্বাদ +
পুষ্টি দেয়
বনি মিক্স।
সেরা পুষ্টি যোগালেন মানে বাচ্চার প্রতি আপনার অর্ধেক দায়িত্ব সারলেন হ্যাঁ, আপনার বাচ্চাকে রোজই দিন দু' রকম লাভদায়ক বনি মিক্স। এতে আছে মুখরোচক আপেল, খেজুর, কিশমিশ ও বাদাম, আর বাছাইকরা খাদ্যশস্য – গম, চাল ও ভুট্টা। অর্থাৎ বনি মিক্স থেকে আপনার বাড়ন্ত বাচ্চা পায় বাড়তি পুষ্টি, যা তার দরকার !
আর তৈরী করাও কত সোজা !
রান্নার ঝামেলা নেই।
শুধু – একটি কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমতো বনি মিক্স ঢালুন ... ওতে আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান আর আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওয়ালা মালাইয়ের মত পরিজ বানান !
Bonny Mix
Bonny Mix
নিমেষে তৈরীর পরিজ
প্রস্তুতকারক : গ্লিণ্ডিয়া লিঃ (পূর্বকালীন গ্ল্যাক্সো) – পুষ্টিকর আহারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত নাম !

GL 3/89 BEN

Disproportionate
Returns for
SMALL
INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL
Sponsored & run
by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

সূচীপত্র ৬ ভাদ্র ১৩৯৬ □ ২৩ অগস্ট ১৯৮৯ □ ১৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

রেলগাড়ির কামরায় রতন ভট্টাচার্য ৭০

গল্প

দেশলাই অরবিন্দ গুহ ৩২
রানিপুরের রানিকুঠি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ৫৯

প্রচ্ছদকাহিনী

কলকাতা ৩০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৭, হেমচন্দ্র গুহ ১৯, কবিতা রায় ২০, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী ২৪, সন্তোষকুমার দে ২৫, সিদ্ধার্থ ঘোষ ২৭, অসীমরতন ঘোষ ২৯, গৌতম চক্রবর্তী ৩০

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯২
বিন্নির খই লাল বাতাসা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

কবিতা

যশোর রোডের পাশে তারাপদ রায় ৩৭
অমল চিরদিন শিবশম্ভু পাল ৭
দিনের পিঠে দিন চলে যায় শমীন্দ্র ভৌমিক ৭

ভ্রমণ

ঘরের পাশে ত্রিপুরা গোপাল লাহিড়ী ৫২

কমিকস

টারজান ৩১, গাবলু ৬৯, রোভার্সের রয় ৮৩, টিনটিন ৮৭, পঙ্করত্ন ৮৯

কেরিয়ার গাইড

অথই সমুদ্রে, জাহাজে জাহাজে দেবব্রত মল্লিক ৮৫

বিদ্যালয়-পরিচিতি

দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি হাই স্কুল
অঞ্জন সিকদার ৬৫

খেলাধুলো

ইউ এস ওপেনে... সুব্রত সরকার ৪১
খেলার খবর ৪২
নিঃশব্দে নিজের কাজ... সমীর চৌধুরী ৪৩
দুই ক্রিকেটার : সঞ্জয় ও সৌরভ মানস চক্রবর্তী ৪৪
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৬
এশিয়াজয়ী ইয়াসিন সুজন সেন ৪৮
অ্যালান বর্ডার ৪৯, মাইকেল চ্যাঙ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, কুইজ ৮, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১, আকাশে ওড়ার কথা ৩৬, দেহসৌষ্ঠব ৪৮, নিজের হাতে বানাও ৫৭, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৬৮, কে প্রথম ৮৬, বাইরের জানালা ৯১, শব্দসন্ধান ৯৪, ক্যাসেট ৯৫, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

৫২

জ্যোৎস্নারাতে জঙ্গল বড় মায়াময় হয়ে ওঠে। কিন্তু ত্রিপুরার সিপাহিজলার জঙ্গলে জ্যোৎস্না যে মায়াজাল ছড়িয়ে দেয় তার তুলনা আর কোথাও পাওয়া

১২

আজ যেখানে কলকাতা শহর, লক্ষ কোটি বছর আগে তার কাছেই কি ছিল দু' দুটো সমুদ্র ? অক্টারলোনি মনুমেন্টের চূড়ার কাছে কখনও কি বসেছিল মজার মজলিশ ? সারা ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গণনা-কেন্দ্র কি শুধু এই কলকাতাতেই ? এশিয়ার প্রথম গানের রেকর্ডও তৈরি হয়েছিল এখানে। ভারতের প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় এই শহরেই। সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে যে-শহর, সেই শহরের ৩০০ বছর উপলক্ষেই প্রকাশিত হল এবারের প্রচ্ছদকাহিনী। এতে যেমন আছে ইতিহাসের কথা, তেমনই আছে বিখ্যাত দুই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

যাবে কি না সন্দেহ। শুধু সিপাহিজলা নয়, এবারের ভ্রমণকাহিনীতে ত্রিপুরার দ্রষ্টব্য নানা স্থানের কথা বলা হয়েছে। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু জম্পুই পাহাড়—এরকম আরও অনেক দ্রষ্টব্য স্থান।

৮৫

বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি কঠিন না হলেও, ততটা সহজও নয়। এই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব জাহাজের প্রতিটি কর্মীর। এই চাকরি পেতে হলে কী কী পরীক্ষা দিতে হয়, কোথায় পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে আলোচনা করা হল কেরিয়ার গাইড বিভাগে।

৭০

গ্রাম ছেড়ে সে কোথাও যায়নি। হঠাৎ তাকেই যেতে হল মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে। রতন ভট্টাচার্যের উপন্যাস।

৪১

আর কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে ইউ এস ওপেন টেনিস-প্রতিযোগিতা। উইম্বলডনে খেলা হয় ঘাসের কোর্টে, আর এখানে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির হার্ড-কোর্ট সারফেস-এ। পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলসে কারা জিতবেন? কার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? একটি সমীক্ষা।

আগামী সংখ্যায়

সঙ্কর্ষণ রায় ও চঞ্চল পালের প্রচ্ছদকাহিনী

রত্ন-রহস্য

রতন ভট্টাচার্যের উপন্যাস (শেষাংশ)

রেলগাড়ির কামরায়

সমীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প

চাকা-চরিত

মণীশ প্রধানের চিকিৎসাবিজ্ঞান

করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি

Sreeleathers Sreeleathers Sreeleathers

বাবু বিবি ছুট্‌ফটে
খেয়ালী ও মজারু
বুদ্ধিমান প্রমাণ করে
পিঠে রেখে ক্যাঙারু

Kangaroo
School Bag,

- ওয়াটার প্রুফ
- শক্তপোক্ত
- সুন্দর দেখতে
- টেকসই
- টিফিন বক্স আর ওয়াটার বট্‌লের জন্য দু'টি আলাদা পকেট

A Quality Product of—
Sreeleathers
3, Lindsay Street, Calcutta-700 087
Phone : 29-9611

Sanchar

For trade enquiries write to :
SANCHAR
MEDIA COMMUNICATIONNETWORK
6A, Metropolitan Bldg
7, J. L. Nehru Road CAL-13 Tel: 28-8268

আকাশ-বাতাস-জল

আমরা আনন্দমেলা নিয়মিত পড়ি। ১২ জুলাই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'আকাশ বাতাস জল' পড়লাম। প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যে পূর্ণ লেখাটি আমাদের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু লেখাটির তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে লেখক লিখেছেন, 'বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে উষ্ণতা প্রচুর।' কিন্তু আমরা ভূগোল বইয়ে দেখেছি যে, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণতা কমে যায়। কোনটা ঠিক, যদি জানান ভাল হয়।

বাসবরাজ ঘোষ
বিপুলরাজ ঘোষ
উত্তরপাড়া উচ্চ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, হুগলি

অসীমরতন ঘোষের লেখা 'আকাশ বাতাস জল' এবং 'ছিল আর-এক সূর্য' লেখা দুটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই তথ্যনির্ভর। কিন্তু 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'-এর ব্যাপারটি যেন কিছুটা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়েছে। সূর্য থেকে আসে আলো ও উত্তাপের সঙ্গে আসে অতি শক্তিশালী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি। এই রশ্মি পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রকৃতিরই নিয়মে এই আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীর অভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে না। এর মুখ্য কারণ হল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজন গ্যাসের স্তর। এই স্তর আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। কিন্তু আন্টার্কটিকা মহাদেশের উপরে সেই ওজন-স্তরে একটা বিরাট ফুটো লক্ষ করেছেন বিজ্ঞানীরা, যা আশঙ্কাজনক। এর ফলে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে আর বাধা পাচ্ছে না। ফলে যেমন বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে পৃথিবীর সামগ্রিক উত্তাপ। পৃথিবী খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে পড়ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ বেশি গলছে, ফলে আবহাওয়াগত নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ দিন-দিন উঁচু হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম ভয়ঙ্কর রোগের।

বিজ্ঞানীরা বলছেন বায়ুমণ্ডলে 'ক্লোরোফ্লুরোকার্বন' নামক একপ্রকার উপাদান ওজন-স্তরকে দিন-দিন খেয়ে ফেলছে। পরিবেশগত দূষণ থেকে এই উপাদানের সৃষ্টি। পৃথিবীর সব উন্নত দেশ থেকে এই উপাদানের উৎপত্তি কমাতে না পারলে পৃথিবীকে বাঁচানো মুশকিল। মোটামুটি এই হল 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'।

সৈয়দ লুৎফুল্লাহ
আস্তুয়া, বীরভূম

নবম শ্রেণীর ছাত্র আমার নাতি, তার জন্যই আমি আনন্দমেলা পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। নাতির সঙ্গে-সঙ্গে আমিও মন দিয়ে আনন্দমেলা পড়ি। সম্প্রতি কয়েকটি সংখ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে ক'টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে দেখে খুব ভাল লাগল। ৫ এপ্রিল সংখ্যায় 'কাছের গ্রহ মঙ্গল' পড়লাম। ১৪ জুন সংখ্যায় দূরবিন নিয়ে দুটি লেখা পড়লাম। এর মধ্যে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যালিলিও-এর ওপর লেখাটি সুন্দর হয়েছে। ১২ জুলাই সংখ্যায় 'ছিল আর-এক সূর্য' লেখাটির ২১ পৃষ্ঠায় আছে 'ভয়েজার দুটিও একইভাবে শনির নানারকম খবর জানায়। পরে এরা নেপচুন ও প্লুটোর নানা খবর পাঠাতে থাকে।' এসব তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে? আজ পর্যন্ত কোনও মহাকাশযান নেপচুনের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। আগামী ২৪ অগস্ট ভয়েজার-২ সর্বপ্রথম নেপচুনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে। আর প্লুটোর কাছে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোনও মহাকাশযান পাঠাবার পরিকল্পনা পর্যন্ত এখনও করা হয়নি। এই সংখ্যায় 'বিজ্ঞানসাধক রাধাগোবিন্দ' লেখাটি সময়োপযোগী এবং আকর্ষক হয়েছে। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁর লেখায় গ্যালিলিও এবং রাধাগোবিন্দের জীবন-আলেখ্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার কথা হল, অমলেন্দুবাবুকে দিয়ে শুধু জীবনী লেখানো কেন হচ্ছে? মূল জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়গুলো তাঁকে দিয়ে লেখালে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। এ-ব্যাপারে ভেবে দেখবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৯১

লেখকের উত্তর :

'আকাশ-বাতাস-জল' এবং 'ছিল আর-এক সূর্য' প্রবন্ধ দুটি সম্পর্কে কয়েকটি চিঠিতে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যাতে কোনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় তার জন্য সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছি। বাসবরাজ ঘোষ ও বিপুলরাজ ঘোষের চিঠির উত্তরে জানাই : ভূগোল বইয়ে দেখা 'উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণতা কমে যায়'—এই তথ্য ট্রপোপজ পর্যন্ত সত্য। তারপরে স্ট্র্যাটোপজ পর্যন্ত উষ্ণতা আবার বাড়তে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়তে থাকলে উষ্ণতা কমতে থাকে। মেসোপজ থেকে উচ্চতার সঙ্গে উষ্ণতা দ্রুত বাড়তে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচশো-ছ'শো কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতা দাঁড়ায় ১২০০-১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এইরকম উষ্ণতার জন্য হালকা গ্যাসের দুষ্প্রাপ্যতার তথ্যটিতে কোনও ভুল নেই। সৈয়দ লুৎফুল্লাহের চিঠির উত্তরে বলি : 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' সম্পর্কে দু'-চার কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছি, যা পুরোপুরি ঠিক। গ্রিন হাউস এফেক্ট পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও দেখা যায়। এঁর দেওয়া গ্রিন হাউস এফেক্টের 'আউটলাইন'টি আদৌ ঠিক নয়। প্রবন্ধ দুটিতে সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছি। সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তরে জানাই : আমার মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল 'ভয়েজার দুটিও একইভাবে শনির নানারকম খবর জানায়। পরে এরা ইউরেনাস ও নেপচুন সম্পর্কে নানা খবর পাঠাতে থাকে।' তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যথেষ্ট প্রামাণ্য সূত্র থেকেই। কোনওভাবে ইউরেনাস হয়ে গেছে প্লুটো। ফলে লাইনটি কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আসলে এরা বৃহস্পতি ছাড়িয়ে, শনি পেরিয়ে আলাদা আলাদা পথ ধরেছে। ভয়েজার-১ চলেছে হেলিওস্ফিয়ারের আগার দিকে। ভয়েজার-২ চলেছে ইউরেনাস পেরিয়ে নেপচুনের দিকে। ১৯৮৯-এর অগস্ট মাস থেকে নেপচুন সম্পর্কে এর খবর পাঠানোর কথা। প্লুটো নিয়ে এখন যথেষ্ট চিন্তাভাবনা চলছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে প্লুটো চলে আসবে এখনকার চেয়ে সূর্যের অনেক কাছে, এমনকী নেপচুনের চেয়েও কাছে। ◼

আনন্দমেলা
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়
এক বৎসর
১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর
৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)
আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :
সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
ডাক মাশুল লাগবে না

অমল চিরদিন

শিবশম্ভু পাল

কলকাতাতে সন্ধে হলে জ্বলত গ্যাসের আলো,
গলির কোণে আঁধার জড়াজড়ি ;
সেই আলোতে বিদ্যাসাগর যখন ছিলেন বালক
পড়াশুনোর কাজ চালাতেন, গরিব।

দুপুর হলে হরেক রকম ফেরিওলার ডাক,
কত অমল উদাস হয়ে যেত ;
কত ছিনাথ বহুরূপী সাজত কেঁদো বাঘ,
গল্প ছিল পোড়োবাড়ির ভেতর।

পোড়োবাড়ি নেই কো কোথাও, ভূতেরা সব বেকার ;
রাস্তা ভেঙে রাস্তা হল চওড়া,
গ্যাসের বাতি উঠে গিয়ে মার্কারি ভেপার,
দ্বিতীয় সেতু পৌঁছে দেবে হাওড়া।
যা গেছে তা গেছে এবং যা আছে তা আছে
কিছু দৃশ্য তবু থেকেই যায় ;
ফুল ঝরেছে, নতুন করে ফুল ধরেছে গাছে,
কত যে জল বয়েছে গঙ্গায়।
ফেরিওলা না থাক পথে, না থাক দইওলা,
অমল ছিল, অমল থেকে যাবে ;
সুধা তাকে ভুলবে নাকো স্মৃতির ঢেউ তোলা,
মেঘের দিনে বিজলি চমকাবে।

মেঘের দিন ঘনিয়ে আসে, বালক একা থাকুক
আলো-আঁধার জড়িয়ে গেলে ক্ষণিক,
অনেক দূরে নিমেষহারা, যতই ভালবাসুক
স্পাইডারম্যান, ইন্দ্রজাল কমিকস।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

দিনের পিঠে দিন চলে যায়

শমীন্দ্র ভৌমিক

এই এখানে রোদের ঝিলিক, দেবলীনা তুই কোথায় ছিলি
চল একটু বেড়িয়ে আসি
দেবদারু শালবন।
পাতার ফাঁকে পাখপাখালি চিকির মিকির ডাকছে খালি
বসব কোপাই নদীর পাড়ে
ঠাণ্ডা হবে মন।
ঢেউ উঠেছে খোয়াই জুড়ে, এলেম যেন সমুদ্দুরে,
উত্তরে ওই ভুবনডাঙা—
দক্ষিণে প্রান্তিক,
যেন দূরের প্রান্ত থেকে ভোরের বেলার শিশির মেখে
আসছে চেনা আওয়াজখানি
কু-ঝিক-ঝিক-ঝিক।
ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে যাবে চোখের পলক ছাড়িয়ে যাবে
তাকাব সেই আবার ফিরে
শালবনে প্রান্তিকে,
কোপাইপাড়ে তিনটি বালক, একটি আলম, একটি নালক
নাম জানিনে আর একটি তার
সাঁতরায় তিনদিকে।
ধিতাং ধিতাং সান্তালিদের, দল চলেছে কোনদিকে রে ?
শ্যামবাটি না কঙ্কালিতে
কোন্‌খানে আজ হাট ?
ঝাঁকায় ভরে পসরা নিয়ে, রাঙামাটির রাস্তা দিয়ে
পেরিয়ে গেল সজনেডাঙা
হেতমপুরের মাঠ।
দিনের পিঠে দিন চলে যায়, সন্ধ্যা নামে দুপুর হারায়
তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে
আমবাগানে জোনাই।
রুকু তখন বোনকে ডেকে, বলছে রিয়া মনের থেকে
বলছি তোকে এই কবিতা
দ্যাখ তো কেমন শোনায়।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

আমাজন ও নীল নদ

আমাজন (পর্তুগিজ ভাষায় আমাজনাস) নীল নদের সঙ্গে বিশ্বের সম্ভবত দীর্ঘতম নদীর গৌরব ভাগ করে নিয়েছে।

পেরুর আন্দিজ পাহাড়ে ১৭,১৮৮ ফুট উঁচুতে হুয়ারকো নামের এক ঝরনায় আমাজনের সত্যিকারের উৎস আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৩ সালে। হুয়ারকোর উৎস থেকে শুরু করে ব্রাজিলের বেলেমের কাছে দক্ষিণ অতলান্তিকের মুখ পর্যন্ত আমাজনের দৈর্ঘ্য হয় ৪,০০৭ মাইল, না হয় ৪,১৯৫ মাইল। এটা নির্ভর করছে ব-দ্বীপের কোন শাখানদীর দৈর্ঘ্য এর মধ্যে ধরা হচ্ছে, তার ওপর। হুয়ারকোর জল শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ছে মারানন নদীতে। পেরু সীমান্তে এই মারানন নদীর নাম হচ্ছে সলিমোজ নদী। সলিমোজ যখন বিশাল নেগ্রো নদীর সঙ্গমে পৌঁছচ্ছে, তারপর এক হাজার মাইল তার নাম আমাজন। কোথাও কোথাও এই নদী চার-পাঁচ মাইল চওড়া। এর সর্বোচ্চ গভীরতা ২০০ ফুট। আমাজনের আছে প্রায় ১৫,০০০ শাখা নদী ও উপনদী। এদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ হল মাদেইরা নদী—২,১০০ মাইল। আরও তিনটি শাখানদীও ১,০০০ মাইলের বেশি দীর্ঘ। বিশাল আমাজন প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে ৩৫ লক্ষ কিউবিক ফুট জল অতলান্তিকে ঢালছে। এই বিপুল জলরাশিকে খোলা সমুদ্রে বেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত আলাদা করে চেনা যায়।

আসল আমাজন কিন্তু পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বইত, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের প্রায় আড়াআড়ি। ছ'কোটি বছর আগে আন্দিজ পাহাড় হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আমাজনের গতিপথ একেবারে বদলে দেয়। মানুষের প্রতি বৈরী এই আমাজন। এখানে হয় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। জলে কুমির, অ্যানাকোণ্ডা, পিরানহা। তার ওপর আবার দু'পাড়ে দুর্গম জঙ্গল। বন্যা তো লেগেই আছে। ফলে মানুষের পক্ষে বসবাসের যোগ্য নয় এই এলাকা। মানুষের বসতি যদিও বা দেখা যায়, তাও সেই প্রধান প্রধান সঙ্গমের কাছে উঁচু জায়গায়। পুরো আমাজন ধরে নৌকো বা লঞ্চ চলতে পারে, কিন্তু সমুদ্রগামী জাহাজ চলার মতো নদীপথ খুব কমই আছে। আমাজনের প্রধান বন্দর ব্রাজিলের মানাউস। সেখানে তিন লক্ষের বেশি লোক বসবাস করেন।

১৫৪১—১৫৪২-এ ফ্রান্সিসকো দ্য ওরেল্লানা নেহাতই আকস্মিকভাবে আমাজনে পাড়ি দিয়েছিলেন। অভিযানে বেরিয়ে, প্রচণ্ড দুর্ভোগে পড়ে গনজালো পিজারো আন্দিজের পার্বত্য এলাকা থেকে নীচে কোথাও গিয়ে খাবারের সন্ধান করতে বলেছিলেন ফ্রান্সিসকোকে। সম্পর্কে তিনি গনজালোর ভাই।

কিন্তু খাবার আনতে গিয়ে সেই যে তিনি আমাজনে গিয়ে পড়লেন আর নৌকো বেয়ে ওপরে উঠতে পারলেন না। ফ্রান্সিসকো ওরেল্লানা তখন পূর্ব দিকে আমাজন ধরে এগিয়ে গেলেন। পুরো মহাদেশ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। পরে তিনি তাঁর রিপোর্টে 'আমাজন' নামে একদল মহিলাযোদ্ধার কথা লেখেন। আদিবাসীদের মুখে তিনি ওদের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু আগে কখনও তাদের দেখেননি। ওই আমাজন থেকেই এসেছে নদীর নাম। ওরেল্লানারও চার দশক আগে অবশ্য এক শ্বেতাঙ্গ আমাজন পেরিয়েছিলেন। স্প্যানিশ সেই অভিযাত্রীর নাম ভিসেন্ত পিনজোঁ।

রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা আমাজন

হয়তো বিশ্বের দীর্ঘতম নদী হিসেবে আমাজনের সঙ্গে গৌরবের অংশীদার নীল নদ। আফ্রিকার অর্ধাংশের মধ্যে দিয়ে উত্তরে বয়ে গেছে নীল নদ, গিয়ে মিশেছে ভূমধ্যসাগরে। বেলজিয়ামের এম দেভ্‌রোভে মাপজোক করে বলেছেন, নীল নদের দৈর্ঘ্য ৪,১৪৫ মাইল। তখনও আসোয়ান বাঁধ তৈরি হয়নি। এই বাঁধের লেক নাসের-এর মধ্যে আছে নীল নদের বেশ কয়েক মাইল। অন্য সূত্র থেকে বলা হয়, সমুদ্র থেকে লেক ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত নীল নদের দৈর্ঘ্য ৩,৫০০ মাইল। কিন্তু দেভ্‌রোভের মতে, নীল নদের উৎস রুয়াণ্ডার কেগেরা নদী। সেই নদীর জল গিয়ে পড়ছে লেক ভিক্টোরিয়ায়। দেভ্‌রোভের সমীক্ষাকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয়। উগাণ্ডা ও সুদান জলবিদ্যুতের জন্য নির্ভর করে নীল নদের ওপর। কিন্তু মিশরের পুরো অস্তিত্বই নীল নদ ভিত্তিক। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে) বলেছেন, "মিশর হল নীল নদের দান।" আজকের নীল নদের বয়স প্রায় ৩০,০০০ বছর। আর ছ'হাজার বছরের মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই নদের উর্বর এলাকার ওপর।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) পৃথিবীতে কোন দেশে সর্বাধিক মুসলিম বাস করেন ? **শেখ আবদুর রব ও সৌমেন বসু**, মেমারি ।
(২) পাকিস্তানে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি 'কায়েদ এ আজম' নামে পরিচিত ? **রিয়াজুল আরেফিন**, কলকাতা-১৪ ।
(৩) টেবল-টেনিস বোর্ডের মাপ কত ? **রথীন্দ্রনাথ দে**, কোন্নগর ।
(৪) 'মাস্টার ক্লাস' বইটি কার লেখা ? **রিন্টু সাঁই**, বর্ধমান ।

(৫) কবি নজরুল ইসলামের জন্মস্থান কোথায় ? **শ্রাবন্তী মজুমদার**, আগরতলা ।
(৬) চাঁদে পদার্পণকারী দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কী ?
(৭) কলকাতার ফুটবলে কোন খেলোয়াড় 'চাইনিজ ওয়াল' নামে বিখ্যাত ছিলেন ? **সুদীপ মৈত্র**, বালি ।
(৮) এবারে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ানশিপে মহিলাদের সিঙ্গল্‌স খেতাব কে জিতেছেন ? **শুভস্মিত গোস্বামী**, জলপাইগুড়ি ।
(৯) 'ডন কুইকজোট' কার লেখা ?
(১০) এ বছর 'দাদাসাহেব ফাল্‌কে' পুরস্কার কে পেয়েছেন ? **উত্তম বসু**, সি এম কলেজ, দ্বারভাঙা ।
(১১) এ বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে 'অস্কার' কে পেয়েছেন ? **শান্তনু পাল**, আসানসোল-৪ ।
(১২) বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে মোটা লোকটির নাম কী ? **জুঁইমালা বসু**, বালুরঘাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ।
(১৩) থর মরুভূমি ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত ? **অর্ণব মুখোপাধ্যায়**, কান্দি রাজ কলেজ ।
(১৪) ভারতের কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি জাফরান পাওয়া যায় ? **শেখ রব**, বর্ধমান ।
(১৫) শীতল বায়ু ও উষ্ণ বায়ুর মধ্যে কোনটি হালকা ? **কিংশুক হাজরা**, সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল ।
(১৬) বন্দুকের গুলি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি ? **প্রসেনজিৎ পান্তি**, হৃদয়পুর ।
(১৭) 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গি লেন' ছবির পরিচালিকা কে ? **অরুণ, গৌতম, মাধুরী**, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ।

(১৮) 'বিটউইন দা লাইন্‌স' কার লেখা ? **অঞ্জন সেনগুপ্ত**, বসিরহাট ।
(১৯) কোন শহরকে 'সোনার শহর' বলা হয় ? **মলয় হোড়**, ঝাড়গ্রাম ।
(২০) ফ্লো-জোর ননদের নাম কী, যিনি নিজেও খেলাধুলোর জগতে যথেষ্ট পরিচিত ? **শোভনা রায়চৌধুরী**, আসানসোল ।
(২১) টিনটিনের লেখক

হার্জ-এর আসল নাম কী ?
(২২) বাণভট্ট কোন রাজার সভাকবি ছিলেন ? **কৌশিক হাজরা**, কলকাতা-১৯ ।
(২৩) বিশ্বের কোন দেশে সবচেয়ে বেশি সাইকেল চলে ? **অরণ্যবিনয় দাস**, হরিরামপুর ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) সুরিনাম ।
(২) ভিক্টর ট্রাম্পার ।
(৩) সম্রাট জাহাঙ্গির ।
(৪) Press Trust of India.
(৫) নিকোলো মেকিয়াভেলি ।
(৬) প্রবীণকুমার ।
(৭) উজবেকিস্তানে ।
(৮) নাগাল্যান্ড ।
(৯) প্রেমচন্দ ।
(১০) ৩০টি ।
(১১) ফিনল্যান্ড ।
(১২) কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

প্রেমচন্দ

আমুন্ডসেন

(১৩) রজার বিন্নি ।
(১৪) মহাশ্বেতা দেবী ।
(১৫) জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে ।
(১৬) চিত্রগুপ্ত ।
(১৭) ভুটানকে ।
(১৮) বেনজির ভুট্টোর ।
(১৯) রোয়াল্ড আমুন্ডসেন ।
(২০) মলয়ালম ছবি 'পিরভি' ।
(২১) United Nations International Childrens Emergency Fund.
(২২) ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেড্‌লিকে ।

বিষয় : ফ্রান্স

কুইজ

প্রশ্ন

(১) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস কোন নদীর তীরে অবস্থিত ?
(২) ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতের নাম কী ?
(৩) ফরাসি ব্রুটি কী ?
(৪) 'অর্লেয়াঁ-এর কন্যা' কাকে বলা হত ?
(৫) ফোটো প্রসেস-এর প্রথম কার্যকর উপায় এক ফরাসি প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম কী ?
(৬) নেপোলিয়ন-এর সমাধি কোথায় অবস্থিত ?
(৭) এক ফরাসি অ্যাডভেঞ্চারার ভারতে দু'টি বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নাম কী তাঁর ?
(৮) ফরাসি-ভারতে এক গভর্নর জেনারেল সারা ভারত জুড়ে ফরাসি সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে-স্বপ্ন প্রায় সার্থকও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি হতাশায় ও দারিদ্র্যে মারা যান। তিনি কে ?
(৯) ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার যে স্বপ্ন ফরাসিরা দেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে তা বিনষ্ট হয়ে যায় ?
(১০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের পর ফ্রান্সের একটি বন্দর থেকে ব্রিটিশ বাহিনীকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানো হয়। সেই ফরাসি বন্দরটি এইজন্যই বেশি পরিচিত। বন্দরটির নাম কী ?
(১১) কাদের বলা হয় 'মাকি' ?
(১২) কোন ফরাসি রাজাকে ক্যাথলিক চার্চ-এর সন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল ?
(১৩) 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি' কাকে বলা হয় ?
(১৪) হলুদ জার্সি কে পরেন ?
(১৫) কোন ফরাসি চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে প্রভাবিত করেছিলেন ?
(১৬) প্রাচীন রোমানরা ফ্রান্সকে কী বলতেন ?
(১৭) ফরাসি ফুটবল দল তাদের জার্সিতে কোন পাখির ছবি পরে ?
(১৮) ফরাসি ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলাগুলি হয় রোলাঁ গারোস স্টেডিয়ামে। রোলাঁ গারোস কে ছিলেন ?
(১৯) 'ফ্লিক্' বলতে ফরাসিরা কাদের বোঝায় ?
(২০) ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গিলোটিন। গিলোটিন কার আবিষ্কার ?

(ক)

(খ)

(গ)

উত্তর : (১) সেইন। (২) লা মার্সেইয়্যাজ। (৩) লম্বা রুটি। (৪) জোয়ান অব আর্ক। অর্লেয়াঁতে তিনি ইংরেজদের হারিয়েছিলেন। (৫) লুই-জাক-মন্দ দাগের। (৬) প্যারিসের হোটেল দ্য আঁভালিদ-এ। (৭) ক্লদ মার্টিন। কলকাতা ও লখনউয়ে তিনি লা মার্টিনিয়ের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। (৮) ইয়োসেফ-ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে। (৯) ওয়ান্ডিওয়াশ। ইংরেজদের কাছে ফরাসিরা এখানে হেরে যায়। (১০) ডানকার্ক। (১১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি-অধিকৃত ফ্রান্সে ফরাসি প্রতিরোধ বাহিনীকে এই নামে ডাকা হত। (১২) নবম লুই। (১৩) কমনওয়েলথ-এর মতো ফরাসি একটি সংগঠন। ফ্রান্স, বিদেশে তার বিভিন্ন রাজ্য ও বিভাগ এবং ফরাসি শাসনে আফ্রিকার যেসব রাজ্য ছিল সেগুলি এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৪) বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্যুর দ্য ফ্রঁস-এর প্রতি পর্বের নেতা এই জার্সি পরেন। (১৫) জাঁ রেনোয়া। (১৬) গালিয়া (গল)। (১৭) ককরেল। (১৮) রোলাঁ গারোস ছিলেন বিখ্যাত বৈমানিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি মারা যান। (১৯) পুলিশ। (২০) ডঃ গিলোটিন নন, এটি আবিষ্কার করেন আঁতোয়ান লুই নামে এক ভদ্রলোক। তাই প্রথমে এঁকে বলা হত লুইজোঁ বা ল্যুইজেট। ডঃ গিলোটিনও প্রথম এটিকে ব্যবহার করতে বলেন। পরে তাঁর নামেই হয় গিলোটিন নাম।

কার ছবি ?

উত্তর : (ক) পল গগাঁ (শিল্পী), (খ) চার্লস দ্য গল, (গ) মিশেল প্লাতিনি।

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির নতুন অবদান মেগাচিপ

'মেগা প্রোজেক্ট' শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে । পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি এই প্রকল্প শুরু করেছিলেন ইলেকট্রনিক চিপকে আরও ক্ষমতাশালী অথচ মাপে ছোট করে তুলতে । এইভাবেই তাঁরা শুরু করেছিলেন ডায়ানামিক র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি চিপ বা ডির‍্যাম চিপ তৈরির কাজ । সম্প্রতি যে-ডির‍্যাম চিপ তাঁরা তৈরি করেছেন তার মধ্যে ১০৪৮৫৭৬টি ডিজিটাল বিট বা ১৩১০৭২টি বাইট সঞ্চিত থাকতে পারে । আর এর জন্য কতটা জায়গা নিয়েছে এই চিপ ? মাত্র আধ বর্গ সেন্টিমিটার ! অর্থাৎ, আঙুলের একটা নখের মাপ । এতে মোট যে-তথ্য সঞ্চিত থাকতে পারে তার আনুমানিক মাপ হল টাইপ করা লেখার চৌষট্টি পৃষ্ঠা । এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট চিপটির নাম হল ১-মেগাবিট ডির‍্যাম । এখন সিমেন্স কম্পানি এর চেয়ে চারগুণ ক্ষমতাশালী ডির‍্যাম চিপ তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন । এই চিপগুলো তৈরির জন্য দরকার হয়েছে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি । যেমন, বিশুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রোবটের দল । মেগাচিপে ইলেকট্রনিক

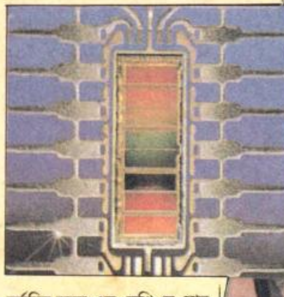

বর্তনির ঘনত্ব এত বেশি যে, মাত্র ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি অধপরিবাহী ওয়েফার থেকে ২৫২টি মেগাচিপ তৈরি করা যায় ।

সৌরশক্তিতে ছুটে চলা গাড়ির প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত হল 'ওয়ার্ল্ড সোলার চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতায় ডারউইন থেকে এডিলেড পর্যন্ত তিন হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে সৌরশক্তিচালিত মোটরগাড়ির দল । আটটি বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিলেন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে । তার মধ্যে ডেনমার্কও ছিল । ডেনমার্কের বিশেষত্ব হল, এই প্রতিযোগিতায় তাদের যে-গাড়িটি অংশ নিয়েছিল সেটি তাদের দেশের প্রথম সৌরশক্তিচালিত গাড়ি । প্রতিযোগিতায় ডেনমার্ক নবম স্থান পায় । তাদের এই নতুন প্রযুক্তির গাড়িটির ওজন দুশো কিলোগ্রাম, আর এটি তৈরি করেছেন পশ্চিম জার্মানির সিমেন্স কম্পানি ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি অপেক্ষাকৃত নতুন শাখা । কিন্তু এরই মধ্যে শাখাটি যথেষ্ট বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার যুক্তি ধার করে গড়ে উঠেছে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' । বিজ্ঞানীরা এই প্রযুক্তির অনেকটাই কাজে লাগিয়েছেন রোবট পরিচালনার কাজে । অনেকগুলো জিনিসের মধ্যে থেকে আমরা কোনও একটি জিনিসকে চিনে নিতে পারি অতি সহজেই । কিন্তু কোনও রোবটের পক্ষে কাজটি মোটেই সহজ নয় । এই চিনে নেওয়ার কাজটির জন্য তাকে বিশেষভাবে প্রোগ্রাম করতে হয় । ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি যন্ত্রাংশ চিনে নেওয়ার জন্য উপযুক্তভাবে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে একটি রোবটকে । এই ধরনের প্রোগ্রাম করার কাজে ব্যবহার

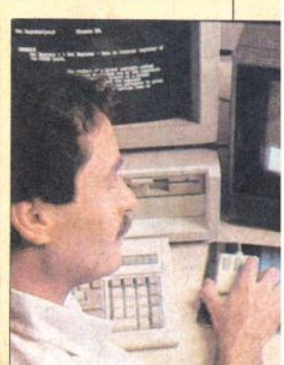

করা হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'র তত্ত্ব । আর প্রোগ্রামের জন্য অপরিহার্য হল প্রোগ্রামারের ডান হাতে ধরা ছোট্ট সাদা বাক্সের মতো বস্তুটি—পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'মাউস' ।

অনুসন্ধানী

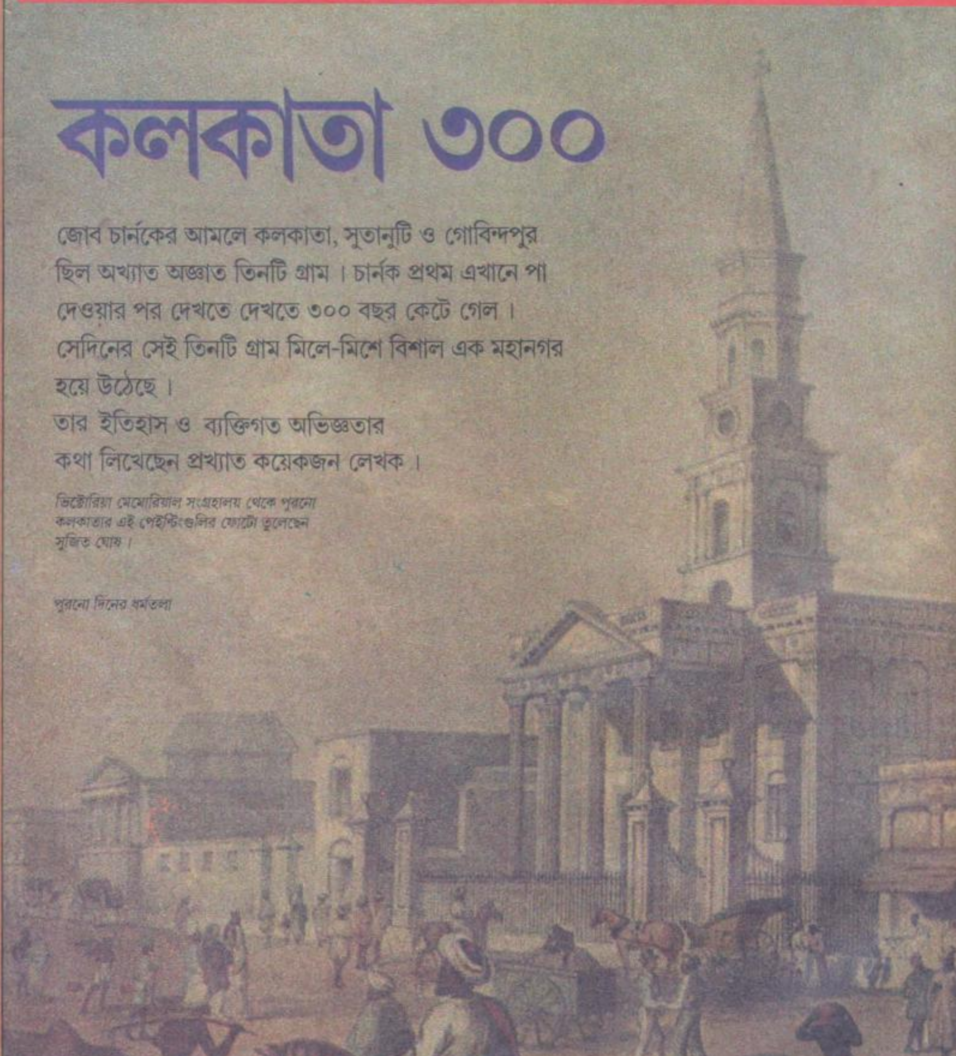

কলকাতা ৩০০

জোব চার্নকের আমলে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ছিল অখ্যাত অজ্ঞাত তিনটি গ্রাম। চার্নক প্রথম এখানে পা দেওয়ার পর দেখতে দেখতে ৩০০ বছর কেটে গেল। সেদিনের সেই তিনটি গ্রাম মিলে-মিশে বিশাল এক মহানগর হয়ে উঠেছে।
তার ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন প্রখ্যাত কয়েকজন লেখক।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহালয় থেকে পুরনো কলকাতার এই পেইন্টিংগুলির ফোটো তুলেছেন সুজিত ঘোষ।

পুরনো দিনের ধর্মতলা

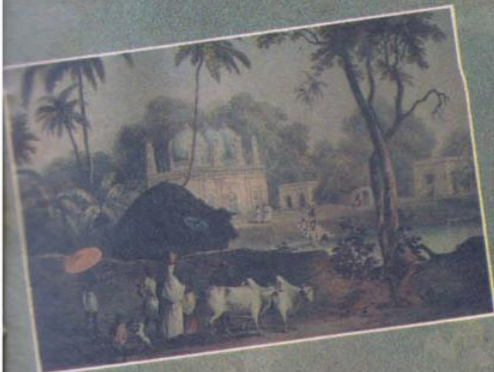

বরানগর

ইতিহাসের পাতায় কলকাতা

কলকাতা চিরদিনই মায়াবি

চিৎপুর রোড

ফোর্ট উইলিয়ম

স্ট্র্যান্ড রোডের কাছে মন্দির

ফিটনগাড়ি, কাঠখোদাই, ১৮৩০

আমার কলকাতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি কলকাতায় জন্মাইনি। তাই কলকাতাকে বেশি ভালবাসি। বাইরে থেকে এসেছি, সেজন্য শহরটাকে খুব আপন করে নিয়েছি। ক্রমশ কলকাতার ওপর এমন মায়া জন্মে গেছে যে, পৃথিবীর যেখানেই যাই বেশিদিন মন টেকে না, কলকাতায় ফেরার জন্য মনটা ছটফট করে।

এক ধরনের মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন তাঁদের ছেলেবেলায় সব কিছুই ভাল ছিল, আর এখন সব কিছুই খারাপ হয়ে গেছে। তাঁরা বলেন, আগে কমলালেবু বেশি মিষ্টি ছিল, ইলিশমাছ খেতে অনেক বেশি সুস্বাদু ছিল, কাঁচালঙ্কায় ঝাল বেশি ছিল, আর কলকাতা শহরটাও অনেক ভাল ছিল। কিন্তু এখন যারা ছোট তাদেরও কি কলকাতা ভাল লাগে না? তারাও কি একসময় বড় হয়ে, কিংবা বুড়ো হয়ে বলবে না যে, তাদের ছেলেবেলাতেও কলকাতা শহরটা বড় সুন্দর ছিল?

আমার ছেলেবেলার কলকাতার অনেক চমৎকার স্মৃতি আছে। আবার এখনকার কলকাতা থেকেও আমি অনেক আনন্দের জিনিস খুঁজে পাই। মানুষ যেমনভাবে বদলাচ্ছে, শহরও সেইভাবে বদলায়।

এখন লোডশেডিং হয় বলে আমরা গরমে খুব ছটফট করি, কিংবা সন্ধেবেলা বই পড়তে পারি না, অন্ধকারে বসে থাকি। আমাদের খুব ছেলেবেলায় কলকাতার বেশিরভাগ বাড়িতে ইলেকট্রিক পাখাই ছিল না, তখন গরমের কষ্টের কথা আমাদের মনেও পড়ত না। সিরাজউদ্দৌলা কিংবা লর্ড ক্লাইভ এঁরা কেউ ইলেকট্রিক আলো-পাখার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। এঁরা যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন নিশ্চয় মাঝে-মাঝেই অন্ধকারে থেকেছেন এবং গরমে ছটফট করেছেন।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় বেশির ভাগ বাড়িতেই ইলেকট্রিকের আলো ছিল বটে এবং রাস্তায় ছিল গ্যাসের আলো, তবু বেশ কয়েক বছর আমাদের সন্ধের পর অন্ধকারে থাকতে হয়েছিল। তখন লোডশেডিং ছিল না, কিন্তু ছিল মহাযুদ্ধ। জাপানিরা এসে যখন-তখন বোমা ফেলতে পারে এই ভয়ে সারা শহরটা অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা হত। তখন সেই লোডশেডিংয়ের নাম ছিল ব্ল্যাক-আউট। ঘরের মধ্যে খুব দরকারের সময় আলো জ্বালতে হলেও দরজা-জানলা সব বন্ধ করে নিতে হত, আর বাল্বের চারপাশে একটা কালো কাগজের ঠুলি পরিয়ে রাখতে হত। বাল্বগুলোকে তখনকার দিনে বলা হত 'ডুম'। কালো কাগজের ঠুলি পরানো ডুমগুলোকে মনে হত জলদস্যুদের চোখের মতন।

স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কলকাতার কয়েকটা পাড়ার নাম ছিল সাহেবপাড়া। ধর্মতলা-চৌরঙ্গির মোড় থেকে মোটামুটি ভবানীপুর পর্যন্ত এলাকাটা ছিল সাহেবদের দখলে। সেখানে বাঙালিরা বিশেষ পাত্তা পেত না। সাহেবরাও শ্যামবাজার, বাগবাজার কিংবা কালীঘাটের মতো একেবারে

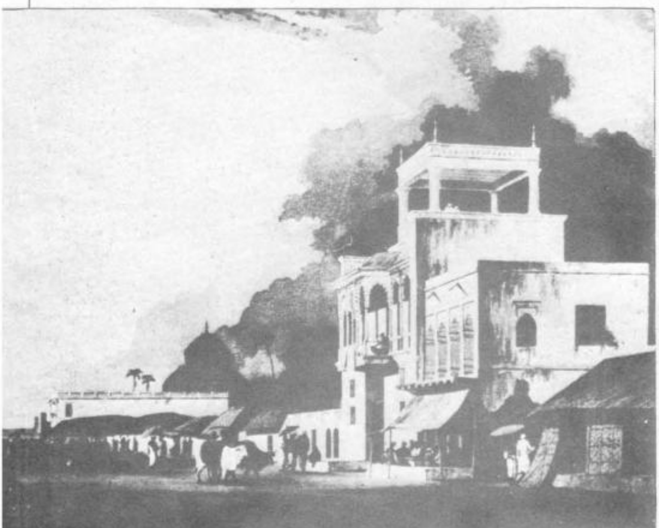

চিৎপুর রোড, কলকাতা, টমাস ড্যানিয়েল-এর স্টিল এনগ্রেভিং

বাঙালিপাড়ায় বিশেষ যেত না। এইসব পাড়ায় সাহেব বলতে দেখা যেত সাহেব-পুলিশদের। কী ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা। এখনকার পুলিশদের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না। বিরাট লম্বা-চওড়া, লাল রঙের মুখ, কারও-কারও চুলের রংও লাল। দেখলে ভয় ও ভক্তি হত। একবার হাতিবাগান বাজারের কাছে আমি একটা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মিছিলের পেছনে-পেছনে ছুটছিলাম। তখন আমার এতই কম বয়েস যে, মিছিলে যোগ দেবার কথা নয়। কিন্তু বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল যাচ্ছে দেখে আমিও 'বন্দে মাতরম' 'বন্দে মাতরম' করতে-করতে দৌড়তে লাগলুম প্রায় কিছু না বুঝেই। হঠাৎ দু' গাড়ি পুলিশ এসে ভেঙে দিতে লাগল সেই মিছিল। দুমদাম করে লাঠি দিয়ে মারতে লাগল মিছিলের লোকদের। ভিড়ের মধ্যে আমি পালাবার সুযোগ পেলুম না। একসময় দেখি কী, আমার ঠিক সামনেই দৈত্যের মতো চেহারার একটা লালমুখো পুলিশ-সার্জেন্ট। খুব ফরসা বলে এদের বলা হত 'গোরা'। সেই সার্জেন্টটির এক হাতের থাবা আমার মুখের চেয়েও বড়। সে এক থাবা আমার মুখে বসিয়ে খুব জোরে একটা ঠেলা মারল। আমি ছিটকে পড়ে গেলুম। ফুটপাথের এক কোণে লেগে আমার কপাল কেটে গেল খানিকটা। সে-দিন কিন্তু আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমিও যেন স্বাধীনতার একজন সৈনিক। সে-দিনই ঠিক করেছিলুম, আর একটু বড় হয়ে সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়ে সাহেবদের সঙ্গে খুব লড়াই করব। কিন্তু সে-সুযোগ আর পাওয়া গেল না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজরা ভয় পেয়ে এ-দেশ ছেড়ে চলে গেল।

এখন আর অবশ্য ইংরেজদের ওপরে আমাদের রাগ নেই। তারা কিছু-কিছু ভাল কাজও করেছিল। সেইসব কথা মনে পড়ে। কলকাতার বড়-বড় রাস্তাঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মনুমেন্ট, হাওড়া ব্রিজ, অর্থাৎ, যা কিছু দেখবার মতো জিনিস তা তো সাহেবরাই বানিয়ে গেছে। তারপর আর নতুন সেরকম কিছু তো আমরা বানাতে পারিনি বিশেষ। একমাত্র পাতালরেল ছাড়া।

ইংরেজদের রাজধানী লণ্ডনে গিয়ে আমি প্রত্যেকবারই চমকে উঠি। কলকাতার সঙ্গে অনেক মিল খুঁজে পাই। প্রথমবার গিয়ে তো আমি খুবই চমকে উঠেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন এলগিন রোডে, কিংবা থিয়েটার রোডে এসেছি। একইরকম রাস্তা, একইরকম দু' পাশের বাড়ি, দোতলা বাসগুলোও আমাদেরই মতন, শুধু লণ্ডনের সব বাসের রং লাল। লণ্ডন শহরের অনুকরণেই তো তারা কলকাতা শহরটা বানিয়েছিল। একবার আমাদের ময়দানের মতন লণ্ডনের হাইড পার্কে আমি এক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরছিলুম। সাহেবরা বাংলা বুঝবে না, এইজন্য আমি ও আমার বন্ধু কথা বলছিলুম বাংলায়। লণ্ডনের পাতালরেল, অর্থাৎ টিউব ট্রেনে যে পকেটমারদের উপদ্রব আছে তা দেখে খুবই মর্মাহত হয়েছিলুম। বন্ধুকে বলছিলুম, "দেখেছিস, হাইড পার্কের এক-একটা জায়গা প্রায় কলকাতারই মতন নোংরা হয়ে গেছে।" পাশ থেকে এক বুড়ো সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, "হুঁ, লণ্ডনের অবস্থাও কলকাতার মতন হতে আর দেরি নেই। কিংবা কলকাতা হয়ে যাচ্ছে লণ্ডনের মতন।"

আমেরিকায় এক সাহেব কলকাতা সম্পর্কে একটা কথা বলে আমাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। সাহেবটি একটি ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। খুব হোমরাচোমরা লোক। আমি কলকাতা থেকে আসছি শুনে তিনি বললেন, "কলকাতা তো খুব সুন্দর শহর। পরিষ্কার, ঝকঝকে রাস্তা, আর আবহাওয়াও বেশ ঠাণ্ডা।" আমি ভাবলুম, সাহেবটি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, না অন্য কোনও শহরের কথা ভুল করছেন? তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কি কখনও কলকাতা শহরে গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই। অনেকবার গেছি। সেই শহরের কথা আমার বেশ ভাল মনে আছে। শহরটি সুন্দর তো বটেই, সেখানকার মানুষদের ব্যবহারও খুব বন্ধুত্বপূর্ণ।"

পরে জানলুম, সেই সাহেবটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন একজন পাইলট। একটা পুরো শীতকাল তিনি কাটিয়ে গেছেন কলকাতায়। কলকাতার রেড রোডে তিনি প্লেন নামাতেন প্রায় প্রত্যেকদিন। চিন দেশে তখন খুব খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল বলে কলকাতা থেকে প্রত্যেকদিন প্লেনে করে প্রচুর চাল, গম চিনদেশে পাঠানো হত। এই সাহেবটি সেরকম একটি প্লেন চালাতেন। ইনি মনোরম শীতকালে রেড রোডের মতন একটা রাস্তা দেখে ফিরে গেছেন।

আমি আর সাহেবটির ধারণা ভাঙালুম না। তবে সাহেবটির শেষ কথাটা এখনও সত্য। কলকাতা শহরটা আর তেমন সুন্দর নয় বটে, কিন্তু এখানকার মানুষ সত্যিই বন্ধুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এ-কথা স্বীকার করেন।

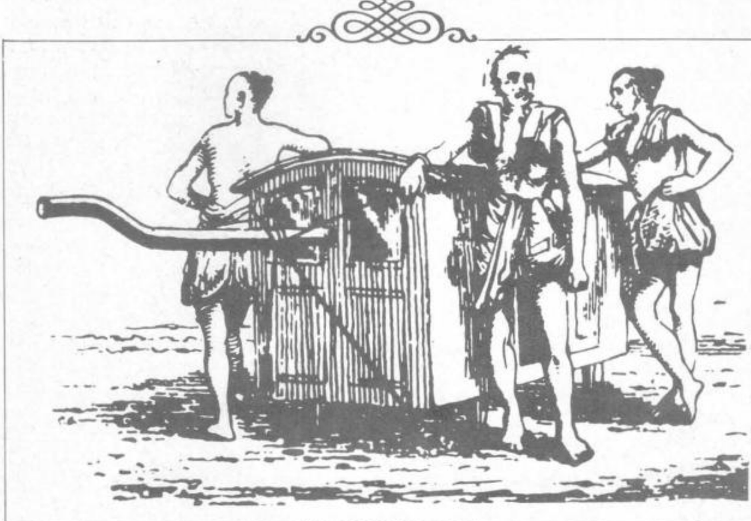

পালকি ও বেয়ারা, কাঠখোদাই

প্রথম পরিচয় পাঁচ বছর বয়সে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। সাল-তারিখের অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, সেটা ১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে চলছে।

কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের বছরটাকে নিয়ে আমি অনেক কাব্য করতে পারতাম, মজা করতে পারতাম। চার্লস ডিকেন্স-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারতাম, 'It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness'—আরও কত! কিন্তু না, পাঁচ বছরের বালকের কাছে পৃথিবী, যুদ্ধ, শান্তি, রাষ্ট্র এ-সমস্ত নিছক অর্থহীন শব্দ। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম, দোতলা বাস (এখনকার দোতলা বাসের মতন নয়, আর একটু ছোট)! পিচের রাস্তায় পাতা লাইন বরাবর দু' কামরার একটা রেলগাড়ি ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে চলেছে। এই সেই ছবিতে দেখা, স্বপ্নের ট্রামগাড়ি! চৌখুপি বাক্সের মতন, একটা দু' চাকার গাড়ি। একজন গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছে, আর একজন লোক সেই গাড়িটা টানতে-টানতে ছুটে চলেছে। আঙুল তুলে বাবা বললেন, "রিক্‌শ"। ইস, মৈমনসিংহের বাড়িতে আমি এসব কিস্যু দেখিনি। সেখানে শুধু ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি! প্রথম দর্শনেই কলকাতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, বিস্মিত করেছিল, তীব্রভাবে আপন করে নিয়েছিল। এটা কলকাতা শহরেরই মহত্ত্ব বলতে হবে। নিউইয়র্ক শহর নিশ্চয় প্রথম দর্শনেই সুদূর অ্যালবামা কিংবা ভার্জিনিয়ার গ্রামের ছেলেকে এতটা আপন করে নেয় না, সাসেক্স কিংবা স্কটল্যাণ্ডের গ্রামের ছেলেকে লণ্ডন শহর প্রথম দর্শনেই এত তীব্রভাবে আকর্ষণ করে না।

বাবা রেলে চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। '৪২ সালেই আবার বদলি হয়ে গিয়েছিলেন কাটিহারে।

'৪১ থেকে '৪২—একটা বছর আমরা কাটিয়েছি মনোহরপুকুর রোডের একটা বাড়িতে। তখনও কলকাতা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়নি। আমাদের বাড়ির একটু আগেই ছিল খোলা জলের একটা পুকুর, গা ডুবিয়ে মোষেরা বহাল তবিয়তে সেখানে স্নান করত। আজকের ঘিঞ্জি, জনাকীর্ণ মনোহরপুকুর দিয়ে হাঁটলে সেই পুকুরের কথা নিতান্ত প্রাগৈতিহাসিক বলে বোধ হবে।

মনোহরপুকুরে আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা, ঘরের পাশেই সুবিশাল এক ছাদ-বারান্দা। গরাদওয়ালা বিশাল জানলা, প্রায় ঘরের মেঝে অবধি বিস্তৃত। আজকের আর্কিটেক্ট বা এঞ্জিনিয়াররা নিশ্চয় সে-সব বিশাল জানলাকে নিতান্ত স্পেসের অপব্যবহার বলে আখ্যা দেবেন!

তবে, তখন অনেক জায়গা ছিল। আমার নিজের একটা তিন চাকার ট্রাই-সাইকেল ছিল। মা ঘরের জিনিসপত্র একটু সরিয়ে

রাখতেন, আমি মহানন্দে সেই ঘরে সাইকেল চালানো অভ্যাস করতাম। এখন তো স্কোয়ার ফুট হিসেবে কলকাতায় ঘরের জায়গা মাপা হয়, ঘরে সাইকেল চালিয়েছি শুনলে আজকের ছেলেমেয়েরা তাই আমাকে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী মনে করবে। তবে, সেই কলকাতার বালক-বালিকারা নিতান্ত গ্রাম্য ছিল। আমার নিজের খেলনা ছিল শুধু ওই তিন চাকার সাইকেল আর কিছু পুতুল। এখন তো সর্বত্র ফ্রিসবি, লিও টয়েজ-এর আধুনিক মেশিনগান আর ভিডিও গেমস্ পার্লার-এর ছড়াছড়ি। শুনলে ভারী অপদার্থ বলে বোধ হবে, মনোহরপুকুরের রাস্তায় আমরা চোর-চোর খেলতাম। টেনিস, স্কোয়াশ, বিলিয়ার্ডের তখনও নামই শুনিনি! মাত্র চল্লিশ বছরের ব্যবধানে, কলকাতা শহর দুই প্রজন্মের মাঝে এক বিস্তৃত ব্যবধান রচনা করে ফেলেছে। তাদের স্বপ্ন, অভ্যাস, শখ, জীবনযাত্রা সব কিছুতেই দেখছি আশমান-জমিন ফারাক!

লণ্ডন শহরের একটা অংশে এখনও পুরনো বাড়ি, ক্যাস্‌ল অবিকল সেইভাবে সাজিয়ে রাখা আছে। কলকাতা পুরনো স্মৃতিকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। মনোহরপুকুরে আমাদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি। ভাঙা দরজা, মেঝেতে স্তূপীকৃত রাবিশ। কোথাও ইটের দেওয়াল ভেঙে গেছে, পলস্তারা খসে পড়েছে। নিতান্ত অ্যাডভেঞ্চারের লোভে, নির্জন দুপুরে আমরা সেই পোড়ো বাড়ির ঘরে ঘুরে বেড়াতাম। এখন সেইসব পোড়ো বাড়ি ভেঙেচুরে বহুতল বাড়ি তাদের নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেতে, আজকের কলকাতার ছেলেমেয়েদের তাই এনিড ব্লাইটন আর সিডনি শেল্‌ডন পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না!

এখন যেমন লোডশেডিং, যুদ্ধের বাজারে তেমন ব্ল্যাক আউট। সাইরেন বাজলে আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, জানলায় কালো কার্বন পেপার লাগিয়ে দেওয়া হত। মোটর সাইকেলে করে লালমুখো ব্রিটিশ সার্জেন্ট পুলিশ ঘুরে বেড়াত। বম্বিং-এর ভয়ে মনোহরপুকুর রোডে একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিল। ওপরের এয়ার-রেইডের ঢাকনাটা কোনওদিন হয়নি, শুধু ট্রেঞ্চের গর্তটা খোঁড়া হয়েছিল। এখন, কর্পোরেশনের ঠিকাদারদের লোকেরা যখন রাস্তা ঠিক করার নামে যেখানে-সেখানে আচমকা গর্ত খুঁড়ে রাখে, তখন আমার সেই ট্রেঞ্চের কথা মনে পড়ে যায়।

'৪২ সালে কাটিহারে চলে গেলেও কলকাতায় ছুটি-ছাটায় মাঝে-মাঝেই এসেছি। উঠতাম পিসিমার বাড়ি, কিংবা মামার বাড়ি। পিসিমার বাড়ি ছিল কালীঘাটে, ট্রাম ডিপোর পিছনে। মামার বাড়ি ছিল চেতলা। এখন চেতলা ব্রিজ পার হলেই রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যান-এর কারখানা, বিশাল-বিশাল বাড়ি। শুনলে আশ্চর্য বোধ হবে, তখন চেতলাতেও ক্যাওড়াতলা শ্মশানের মড়া পোড়ার গন্ধ নাকে এসে লাগত। গয়লা বাড়ির সামনে গোরু এনে দুধ দুইয়ে যেত। বাজার বলতে শুধু বৈঠকখানা বাজার আর জগুবাবুর বাজারের নাম শুনতাম। একদিন মামা খুব ভাল, একছড়া কলা এনে বললেন, এগুলি খুব ভাল। লেক মার্কেটের কলা। এখনকার ছেলেমেয়েরা যখন-তখন লেক মার্কেট, গড়িয়াহাটে গিয়ে আর্চিজ-এর পোস্টার কেনে, ফ্যান্সি মার্কেটে গিয়ে নাইকের জুতো আর লিভাইস-এর জিন্‌স-ট্রাউজার্স কেনে। লেক মার্কেট থেকে কলা কেনা কি তাদের কাছে খুব হাস্যকর বোধ হয়?

'৫৫ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এলাম। হোস্টেলে থাকতাম। তখনও রাজনীতি তার কালজিহ্বাকে ছাত্রজীবনের আনাচে-কানাচে সেঁধিয়ে দেয়নি, এসপ্ল্যানেড ছিল আজকের তুলনায় ঢের ফাঁকা। কলেজ স্কোয়ারের রেলিং ছিল অক্ষত, বসার জন্য যখন-তখন ফাঁকা বেঞ্চ পাওয়া যেত। আমরা এসপ্ল্যানেডে সিনেমা দেখতে আসতাম। দূর থেকে চোখে পড়ত সবুজের উপর সাদা অক্ষরে লেখা Metro; এখন সেই সবুজ, সাদা সব কিছুই রীতিমত বিবর্ণ, আশপাশের উঁচু বাড়িগুলির কাছে নেহাত নিষ্প্রভ বলা যায়। আর তখন, মেট্রো সিনেমার ধরনে কলকাতায় অনেক বাড়ি তৈরি হত। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম মেট্রো প্যাটার্ন।

হোস্টেল থেকে প্রতি রবিবার যাদবপুরে পিসিমার বাড়ি যেতেই হত। গোলপার্ক পার হয়ে, রেললাইন পেরিয়ে হাঁটতে হত। ইস, ঢাকুরিয়া ব্রিজ এখন রেললাইন পেরিয়ে হাঁটার মজাটাই নষ্ট করে দিয়েছে। সেই ঢাকুরিয়া পার হয়েই বিরাট ধোপার মাঠ। আজ তার নাম যোধপুর পার্ক। যাদবপুর নেহাত এক পাড়াগাঁ, সেখানে জল-কাদা ভর্তি কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে ফলসা গাছ।

বস্তুত, রাসবিহারীর মোড় এবং গড়িয়াহাটের মোড় পেরিয়ে যে কলকাতা হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবা যেত না! এখন লোকে, কলকাতা বলতে অনায়াসে গড়িয়া ছাড়িয়ে সোনারপুর, ঠাকুরপুকুরও ভেবে নেয়!

বেলেঘাটা, উলটোডাঙা.....পূর্ব কলকাতা ছিল আমার কাছে নিতান্ত অচেনা! ধুৎ, ওসব জায়গায় তো স্রেফ ভেড়ি আর জলা, কোন দুঃখে যাব? ইস, তখনকার সেইসব ভেড়ি ও জলায় ঘুরে বেড়ালে আমি এখন অনায়াসে অভিজাত সল্ট লেকের গত জন্মের ইতিহাস লিখে ফেলতাম।

তখন, কলকাতায় ভিড় অনেক কম ছিল। হকার ছিল না, ফুটপাথ ধরে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যেত। সাহেবপাড়া, খাস এসপ্ল্যানেডেও প্রচুর গাছ। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে পাওয়া যায় ফারপোর রুটি, খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান মাখন আর সুইজারল্যাণ্ডের পনির। এখন, মুদির দোকানেও নুড্‌লস আর চাউমিনের প্যাকেট পাওয়া যায়। সর্বত্র চিজ, সসেজ, সালামি কিনতে পাওয়া যায়। ইস, কলকাতার সাহেবপাড়ার গৌরবও শেষ অবধি হারিয়ে গেল!

কলকাতার বনেদিয়ানা চিনেছি অনেক পরে। ল্যাজারাস কিংবা প্রবর্তকের ফার্নিচার আমি অনেক বাদে, পার্ক স্ট্রিটের নিলামের দোকানে দেখেছি। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাড়িতে তখন ইন্টিরিয়র ডেকরেশন বা ফ্যাশন ডিজাইনিং আদপে শোনাও যেত না। আমাদের বাড়িতে, অতিথি এলে মাদুর পেতে বসতে দেওয়া হত। ডিভান ও সোফার যুগ শেষ, এখনকার আধুনিক ইন্টিরিয়র ডেকরেশনেও না কি বাড়িতে কার্পেট আর মাদুর বিছিয়ে বসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই শহর প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে-পলে তার রূপ বদলায়। সেই পরিবর্তনের চনমনে উত্তেজনাই আমাকে আকর্ষণ করে।

তবে, এই শহরের মানুষগুলি কেমন যেন নির্বিকার, উদাসীন। টাটকা, সতেজ সবুজের ভীষণ অভাব। সব মেট্রোপলিটন শহরের ভিড়ই না কি এরকম! লুই মামফোর্ডের ভাষায় 'লোনলি ক্রাউড'!

ঠিকই। নিউইয়র্কের সাইডওয়াকে, অফিস টাইমের ভিড়ে লোকে যখন-তখন ধাক্কা মারে, লণ্ডনের এঁদো, সরু গলিতে যখন-তখন ঝুপুস-ঝুপুস বৃষ্টি নামে, পিকিং শহরে 'লাস্ট এম্পারার'-কেও ভিড়ের মধ্যে, ব্রেক চেপে, সাইকেলে প্যাডেল করতে হয়। কিন্তু সেসব ভিড়ে আমার কিছুই যায়-আসে না। কলকাতার ভিড় আর উদাসীনতা বড় গায়ে লাগে। যতই হোক, নিজের শহর তো!

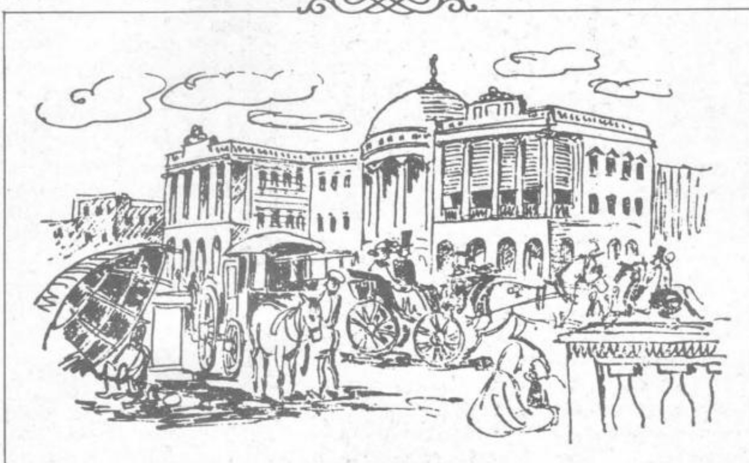

কর্মব্যস্ত এসপ্ল্যানেড

জাতীয় কলেজ ও আমি

হেমচন্দ্র গুহ

সালটা ১৯১৯। আমি তখন সবে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জেলার মধ্যে একটা স্থান দখল করে ওই কলেজেই আই· এ পড়ছি। বহরমপুরে, আমার স্থানীয় অভিভাবক বৈকুণ্ঠ রায়চৌধুরী, ছিলেন ওই কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। তাঁর কড়া নজরেই কি না জানি না—ক্লাস সেভেন-এইট থেকেই পড়াশোনার প্রতি আমার একটা টান জন্মায়। ক্লাসে কোনওদিন দ্বিতীয় হব একথা ভাবতেই পারতাম না। তাই ভাল ছেলে হিসেবে কোথায় কী ঘটছে তার জমা-খরচ না রেখে আমি ক্লাস আর লাইব্রেরির মধ্যেই দিন কাটাচ্ছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, তখন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের বেশ সুনাম ছিল। ইংরেজ প্রধানশিক্ষকের শাসন এত কড়া ছিল যে, ফাঁকি দেওয়া যেত না কোনওভাবেই। আজকের বিচারেও আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি খারাপ ছিল না মোটেই। পড়াশোনাকে ধ্যানজ্ঞান করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে আমি ভালই ছিলাম।

কিন্তু বাদ সাধল বয়েস। ওই কলেজেই আই· এ· পড়ার সময় পরাধীন ভারতবর্ষের অগ্নিগর্ভ ঘটনাপ্রবাহের খোঁজখবর রাখতে শুরু করলাম। আগেই বলেছি যে, ইংরেজ পরিচালিত হওয়ায় আমাদের কলেজের নিয়মকানুন বড় কড়া ছিল। তবুও এর মধ্য দিয়ে যেসব খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছত তাতে আমাদের তরুণ মন উত্তেজনায়, বিক্ষোভে, ব্যথায় উত্তাল হয়ে উঠত। জানতে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করছে, কী এমন খবর যা আমাদের একইসঙ্গে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করত? ভারতবর্ষের তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা আমাদের কোনও দাবি-দাওয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে। এর ফলে সারা দেশের মানুষ, বিশেষ করে বাংলার জনগণ ব্রিটিশ সরকারের এই খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। শুরু হয়ে যায় বয়কট আন্দোলন, মিছিল, মিটিং। আন্দোলনে কেবলমাত্র ইংরেজদের তৈরি জিনিসপত্রই বয়কট নয়, ইংরেজ পরিচালিত স্কুল-কলেজ বয়কট করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। ফলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি ওঠে বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে। যুবক-ছাত্রদের এই দাবি বাস্তবায়িত করার তাগিদে সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত বেঙ্গল-ল্যান্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন-এর বাড়িতে একটি জরুরি সভা ডাকেন। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বাংলার বরেণ্য ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ জাতীয় উদ্যোগে, জাতীয় ভিত্তিতে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর একাধিক সভা-সমিতির পর অবশেষে সুবোধচন্দ্র মল্লিক

ভারতের প্রথম ডাকটিকিট

কবিতা রায়

কলকাতা ক্রমে ৩০০ বছর অতিক্রম করতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সংগ্রাহকদের জানতে ইচ্ছে করবে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কলকাতা শহরকে নিয়ে কোনও ডাকটিকিট বেরিয়েছে কি না। কলকাতা শহরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য বিশেষ কোনও ডাকটিকিট প্রকাশিত না হলেও ভারতের অনেক ডাকটিকিটেই কলকাতা শহর তার নিজস্ব ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত। সবচেয়ে বড় কথা ১৮৫৪ সালে সর্বভারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন শুরু হয় এই কলকাতা শহরেই।

ভারতের প্রথম ডাকটিকিটের চল শুরু হয় ১৮৫২ সালে সিন্ধুপ্রদেশে। এখানকার কমিশনার মিস্টার বার্টল ফ্রেয়ার এই টিকিট চালু করেন। 'সিন্ড ডক্‌স' নামে পরিচিত এই ডাকটিকিট শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি বাতিল করে দেন। সরকার নতুন ডাকটিকিট ছাপার ও নকশা তৈরির ভার দেন কলকাতা টাঁকশালের সুপারিনটেনডেন্ট কর্নেল ফরবেশকে। তিনি যে নকশা এঁকেছিলেন তাতে ছিল একটি খেজুর গাছ আর একটি সিংহ। কিন্তু কলকাতার টাঁকশালে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তাতে এই নকশা ছাপা যাবে না দেখে এটা আর ছাপা হয়নি। অনেকে আবার মনে করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির ওই নকশা আদৌ পছন্দ হয়নি। কারণ খেজুর গাছ হল ভারতের প্রতীক আর সিংহ হল ইংরেজ রাজশক্তির পরিচায়ক। সুতরাং খেজুর গাছের নীচে সিংহ—এ যেন কীরকম বেমানান। তবে ফরবেশের আঁকা 'খেজুর গাছ ও সিংহ' নকশা ভারতীয় ডাকটিকিটে পরে স্থান পায়। ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক ডাকটিকিট প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ২০০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে এর পরিচয় পাওয়া যায়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রথম ডাকটিকিটের নকশা আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হল তখনকার কলকাতার ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হেনরি থুইলিয়ার সাহেবকে। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় ১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট ছাপা হল। এই ডাকটিকিট ছিল আধ আনা দামের, রং নীল। এতে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাপা ছিল। পরে এক আনা, দু' আনা ও চার আনার

ডাকটিকিটও ছাপা হয়।

সংগ্রাহকরা আরও উৎসাহিত হবেন ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ডাকটিকিট প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত দু' টাকা দামের ডাকটিকিটের ইতিহাস জানলে। এর নকশায় 'বিশপ মার্ক' নামে এক অতি প্রাচীন ডাকমোহর লক্ষ করার মতো। ১৬৬১ সালে কর্নেল হেনরি বিশপ কলকাতায় চিঠিপত্র চলাচলের জন্য এই ধরনের এক বিশেষ ডাকমোহর চালু করেছিলেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর প্রায় দুশো বছর পর বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় ইংল্যান্ডে।

এরকম কলকাতার নানা ঘটনা ভারতের বিভিন্ন ডাকটিকিটে স্থান করে নিয়েছে। ১৮৫১ সালে ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হওয়ার ব্যাপারেও কলকাতার নাম যুক্ত হয়ে আছে। কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তৃত সেই টেলিগ্রাফ লাইনই ছিল ভারতের প্রথম টেলিগ্রাফ যোগাযোগ। এই টেলিগ্রাফ লাইন প্রবর্তনের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত দুটি ডাকটিকিটই এ-কথা প্রমাণ করে।

কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও ডাকটিকিটে জায়গা করে নিয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও মানিকতলার জৈন মন্দির ডাকটিকিটে প্রথম স্থান করে নেয় ১৯৩৫ সালে। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সিরিজের ১০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে সেনেট হলের স্মৃতি রোমন্থন করা যেতে পারে। এইভাবে কলকাতা শহরের সঙ্গে যুক্ত বেশ-কিছু ডাকটিকিট রয়েছে। সেগুলো খোঁজার ভার রইল উৎসাহী সংগ্রাহকদের ওপর। আর তাতেই তো ডাকটিকিট জমানোর আসল মজা লুকিয়ে আছে।

ও ময়মনসিংহের জমিদারের বিপুল অর্থসাহায্যে ১৯০৬ সালের ১৫ অগস্ট ১৯১/১ বউবাজার রোডে শুরু হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজকর্ম। প্রথমে অরবিন্দ ঘোষ ও পরে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্যকলাপের খবর ও খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে ছাত্র-সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ছাত্রদের ক্রমাগত চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ১৯১০ সালের ২৫ মে, ৯২ আপার সার্কুলার রোডে গড়ে ওঠে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'। এ ছাড়াও অভিভাবকদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯০৬-৭ সালের মধ্যে জাতীয় শিল্প পরিষদের তত্ত্বাবধানে রংপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, খুলনা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে জাতীয় স্কুল গড়ে ওঠে।

এইভাবে জাতীয় শিক্ষা-কাঠামো সবে যখন তার শৈশব অবস্থা থেকে কৈশোর প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠিক তখনই জনগণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ কিংবা কূটনৈতিক ছলাকলার অংশ হিসেবে লর্ড কার্জন ১৯১১ সালে বাংলা দ্বিখণ্ডীকরণের আইন বাতিল করে দিলেন। জনগণের বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ যে বঙ্গভঙ্গ—তা রোধ হওয়ায় এবং অন্যদিকে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব রূপায়ণের ফলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন থমকে দাঁড়ায়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা নিয়ে শুরু হয় প্রচণ্ড বাক্‌-বিতণ্ডা। একদিকে তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অন্যদিকে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে মতপার্থক্য এবং সর্বোপরি অভিভাবকদের সন্দেহ—সব মিলিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দাবি ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু যে দাবি আমাদের মনের, স্বাধীন সত্তার— তা কি থেমে থাকতে পারে? তাই ১৯২০-২১ সালে গান্ধীজির নতুন আন্দোলন অহিংসা সত্যাগ্রহে বাংলা তথা ভারতবর্ষ যখন উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন আবার নতুন উৎসাহে শুরু হয় এই আন্দোলন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের খবরাখবর কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। কলকাতার মতো উত্তাল না হলেও বহরমপুর তখন এই আন্দোলনের উত্তেজনায় পুড়ছিল ধিকিধিকি করে। এই উত্তেজনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের অর্থাৎ কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে। কিন্তু

মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা কিংবা এই কলেজের ইংরেজ শিক্ষকদের ভাল ব্যবহারের ফলে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কী করা উচিত? ঠিক এই সময়েই গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে বহরমপুরের ছাত্রসমাজকে ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসার ডাক দিতে শহরে এলেন অসাধারণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। দু' দিন বহরমপুরে থাকাকালীন বিপিনচন্দ্র পাল ও আমেদ আলি, কালিকটের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করেন। ইংরেজ শিক্ষকদের সদা সতর্ক চোখ এড়িয়ে আমরা বিপিনচন্দ্র পাল ও আমেদ আলির যুক্তিনিষ্ঠ, আবেগময়ী বক্তৃতা শুনলাম। বিপিনচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান আমাদের মনের কোণে জমে থাকা সমস্ত দ্বন্দ্ব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিল অর্থাৎ,আমরা সমস্যা সমাধানের উপায় পেয়ে গেলাম। এর পর আর অহেতুক দেরি না করে, ব্যক্তিজীবনে সফল হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য একদিন গভীর রাতে আমি ও শ্যামাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (বৈকুণ্ঠবাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে) আমাদের সদরঘাটের বাসা ছেড়ে আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় চলে এলাম। উদ্দেশ্য, জাতীয় কলেজ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া ও কলকাতার সেই সময়ের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখা। কলকাতা পৌঁছনোর পরের দিন চেনাজানা কয়েকজনের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে চলে গেলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত জাতীয় কলেজে। কিন্তু জাতীয় কলেজের চেহারা দেখে তো আমরা ভীষণ দমে গেলাম। দরমার বেড়া দেওয়া কয়েকটা ঘর, আসবাবপত্র বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই। এতদিন সুস্থির পরিবেশে পড়াশোনা করেছি। মনের মধ্যে এখন প্রবল বিক্ষোভ ও উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় কলেজের এই হতশ্রী চেহারা দেখে এতই দমে গেলাম যে, জাতীয় কলেজে পড়ার বাসনা মনে পুষে রেখেই চলে গেলাম মা'র কাছে ঢাকায়। প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতা নিয়ে ঢাকায় থাকার সময় যখন ভাবছি এর পর কী করব, ঠিক তখনই একদিন আমার শিক্ষা-জীবনের একমাত্র অভিভাবক বৈকুণ্ঠবাবুর চিঠি এসে হাজির। তিনি আমার সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য মাকে লিখেছেন, "হেম এখানে পরীক্ষা না দিয়ে চলে গেছে। সে যদি গভর্নমেন্ট পরিচালিত কোনও কলেজে পড়তে না চায়, তা হলে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে

জোব চার্নক : টি· টুটার-এর এনগ্রেভিং

যে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি আছে সেখানে পড়তে পারে।" বৈকুণ্ঠবাবুর এই চিঠি পাওয়ার পর আর পিছু ফিরে না তাকিয়ে কলকাতায় এসে ভর্তি হলাম বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ।

এই কলেজে পড়ার সময় প্রথম দিকে আমি সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের কাছে একটি মেসে থাকলেও পরে মানিকতলা ব্রিজের কাছে আমাদের কলেজের ছাত্রদের তৈরি একটা মেসে চলে আসি। এই মেসে তখন আমাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল বিপ্লবী মনোরঞ্জন ঘোষের। একে মনোরঞ্জনদা সক্রিয় স্বাধীনতা-কর্মী হিসেবে জেল খেটেছেন, তার উপর আমরা জাতীয় কলেজে পড়ি—তাই সাদা পোশাকের পুলিশ সবসময় আমাদের উপর নজর রাখত। এইভাবে একদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে নরমপন্থী আন্দোলন, অন্যদিকে আমাদের জাতীয় কলেজের ঠিক পাশে পঞ্চবটী বনে চলছে সশস্ত্র আন্দোলনের মহড়া। সব মিলিয়ে কলকাতা যতই উত্তাল হয়ে উঠছিল আমিও ততই পড়াশোনার থেকে সরে আসছিলাম। ঠিক এই সময়ে আমাদের প্রিন্স অব ওয়েলস এলেন ভারতে। জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনগণকে এই দিনটি, কালা দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানাল। জাতীয় কংগ্রেসের এই আহ্বানকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২৪ ডিসেম্বর বিকেলে আমি ও আমার বেশ কিছু সহপাঠী কংগ্রেস অফিস থেকে পতাকা নিয়ে মিছিল করে প্রথমে ধর্মতলা ও সেখান থেকে হাওড়া স্টেশনের দিকে যাই। কিন্তু সেতু পেরিয়ে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছনোমাত্র অপেক্ষারত লাল পাগড়ি আমাদের সরকারবিরোধী কাজ করার অভিযোগে গ্রেফতার করে। অপরাধের শাস্তি হিসাবে আমাদের সাত ঘণ্টা জেলে আটকে রাখা হল। অবশেষে গভীর রাতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে চলে গেলাম 'সারভেন্ট' পত্রিকার অফিসে। এই পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানালাম। তারপর ফিরে এলাম মানিকতলা মেসে। পরেরদিন সারভেন্ট পত্রিকায় বিশদভাবে ছাপা হল ওই ঘটনা। সমবয়সী অন্য ছাত্রদের কাছে আমরা প্রায় রাতারাতি 'হিরো' বনে গেলাম।

জেলে যাওয়ার ঘটনা এই একবারই ঘটলেও এর পর জাতীয় নেতৃবৃন্দের ডাকে কতবার যে মিটিং-মিছিলে যোগ দিয়েছি, তার হিসেব নেই। সেই সময় জাতীয়তাবোধের তীব্রতা আমাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, নিজের পড়াশোনার দিকে তাকাবার সময়ই পাইনি। এইভাবে অসংখ্য সভা-সমিতির মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিক্ষার কাঠামো যখন সবে স্বতন্ত্র রূপ নিচ্ছে, ক্রমাগত দানা বেঁধে উঠছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, চৌরিচরার একটা বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র আক্রমণের প্রতিবাদে গান্ধীজি তখন অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। একে ব্রিটিশ সরকার যেন তেন প্রকারে, অর্থাৎ ব্যাপক দমননীতির মাধ্যমে এই আন্দোলনকে বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছিল, তারপর আবার গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহার—সব মিলিয়ে গণআন্দোলনে ভাটা পড়ল কয়েকদিনের মধ্যেই। আন্দোলন হঠাৎ থেমে যাওয়ায় আমি ভয়ানক একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম। দেখলাম সামনে আর এগোবার রাস্তা নেই। কারণ তখন ইংরেজ পরিচালিত ইস্কুল থেকে পড়লেও 'নেটিভ'দের ভাগ্যে ভাল চাকরি জুটত না, তা'ও আবার জাতীয় কলেজের ছাত্র। তাই এই অসহায় অবস্থা থেকে যে কোনওভাবে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমি আবার বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

অনুলিখন: অসীম মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কলকাতার আকাশে কখন সূর্য ও চাঁদ উঠবে, কখন তারা অস্ত যাবে, তার খবর সংবাদপত্রের কোথাও-না-কোথাও দেওয়া আছে। একটু খুঁটিয়ে পড়লেই এই সময়-সারণি চোখে পড়বে। যদি কোনওদিন সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ থাকে তা হলে গ্রহণ কখন শুরু ও শেষ হবে, তারও উল্লেখ নিশ্চয়ই ওই নির্ঘণ্টে থাকবে। কিন্তু তোমাদের কি কখনও মনে হয়েছে, এই সময় কারা গণনা করেন, কোথা থেকে এই সময়-সারণি পান দৈনিক সংবাদপত্র? জ্যোতির্বিজ্ঞানের এইসব তথ্য গণনা করা হয় কলকাতার পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার-এ। শুধু কলকাতাই নয়, সারা ভারতের বড় বড় শহরগুলির জন্যও এই তথ্য গণনা করা হয় এই কেন্দ্রে। দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি শহরের দৈনিক সংবাদপত্রগুলিও এই কেন্দ্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। সারা ভারতে এরকম জ্যোতির্বিজ্ঞান গণনার কেন্দ্র মাত্র একটি, আর তা আছে শুধুমাত্র এই কলকাতায়।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকল্পনার জন্য ১৯৪৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি যেসব সুপারিশ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল, জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার সহায়ক হিসেবে একখানা 'অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস' পুস্তক প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। এখন 'এফিমারিস' কথাটার অর্থ কী, সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। এফিমারিস এমন একটা গ্রন্থ, যাতে সূর্য, চন্দ্র, সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির দৈনন্দিন অবস্থান গণনা করে লিপিবদ্ধ করা থাকে, আর এ-বই প্রকাশ করতে হবে অনেক আগে, অর্থাৎ ১৯৯০ সালের প্রত্যেক দিনের জ্যোতিষ্কদের অবস্থান গণনা করে বই আকারে প্রকাশ করতে হবে ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি। কারণ এই বই দেখে মানমন্দিরে যাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী তাঁরা অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করে ফেলতে পারবেন কোন রাতে কোন জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করবেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য এরকম গ্রন্থ অপরিহার্য।

পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের ১১ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিন দিয়ে আকাশ-পর্যবেক্ষণ

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ একটি শাখা যেখানে আকাশের জ্যোতিষ্কদের দৈনন্দিন অবস্থান গণনা করা হয়, তাকেই বলা হয় 'পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি', বাংলায় বলা যেতে পারে 'অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান'। ভারত সরকার এর পরে ১৯৫২ সালে একটা 'ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি' গঠন করেন—এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের নানা প্রান্তে নানারকমের স্থানীয় ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে (যেমন পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ক্যালেন্ডার), স্বাধীনতার পরে ভারতে যাতে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার প্রচলিত হয় তার ব্যবস্থা করা। এ-ব্যাপারে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু খুব আগ্রহী ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, নেহরুর চেষ্টাতেই এমন একটা কমিটি গঠিত হয়। আর এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। এই কমিটি সারা ভারতে প্রচলনের জন্য একটা জাতীয় ক্যালেন্ডার সুপারিশ করেন। এই কমিটির আরও একটা সুপারিশ ছিল—ভারত সরকার আর দেরি না করে একখানা অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস গ্রন্থ প্রকাশনার যেন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। মেঘনাদ সাহা তখন সংসদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বুঝিয়ে বললেন, প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা কারণে এই বিদ্যা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন স্বাধীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গণনার একটি কেন্দ্র যদি আবার স্থাপন করা যায়, তা হলে সেখান থেকে অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্তরকম তথ্য-গণনা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা যাবে।

মেঘনাদ সাহার অদম্য চেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সহায়তায় ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর, কলকাতার আলিপুরে অবস্থিত আবহাওয়া অফিসে প্রতিষ্ঠিত হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি নতুন কেন্দ্র, নাম দেওয়া হল 'নটিকাল অলম্যানাক ইউনিট'। এই কেন্দ্রে শুরু হয়ে গেল অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানারকম তথ্য গণনা, আর শুধু তাই নয়, এই সংক্রান্ত নানারকম গ্রন্থ প্রতি বছর প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিলেন ভারত সরকার। এইসব গ্রন্থের মধ্যে

সর্বপ্রধান হল, 'ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস'। এর পরে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কেন্দ্রের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটে। আলিপুরে স্থানাভাবের দরুন ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি এই কেন্দ্রটিকে কলকাতার নিউ আলিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। এর পরে ভারত সরকার একটি কমিটিকে ভারতে অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার আরও উন্নতি কীভাবে হতে পারে, তার খুঁটিনাটি পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের তৎকালীন সভাপতি ডক্টর রাজা রমন্না। এই রমন্না কমিটি সব দিক পর্যালোচনা করে সুপারিশ করলেন এই কেন্দ্রকে একটি আন্তর্জাতিক অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গঠন করার জন্য। এই নতুন সুপারিশ অনুযায়ী অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং তার প্রয়োগক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে আগের নটিকাল অলম্যানাক ইউনিটকে যথেষ্ট সম্প্রসারণ করে ১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর একটি স্বতন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের কেন্দ্র গঠন করা হল—এই নতুন সংস্থার নামকরণ হয় পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার। ১৯৮০ সালের ২৬ এপ্রিল এই কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেঘনাদ সাহার সুযোগ্য পুত্র খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডক্টর অজিতকুমার সাহা।

অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য গণনা করে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করার কাজ সারা পৃথিবীতে মাত্র আটটি দেশ গ্রহণ করেছে, ভারতকে বাদ দিলে আর সাতটি দেশ হল: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, স্পেন, জাপান ও চিন। ভারতের আশপাশে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশকেই অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানারকম প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়। অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য গণনার জন্য সারা ভারতে এই সংস্থাই একমাত্র কেন্দ্র, আর গর্ব করে বলা যায় যে, এমন একটি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কেন্দ্র কলকাতায় অবস্থিত।

এই কেন্দ্রের প্রধান প্রধান কাজ হল:

(১) প্রতি বছর ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রনমিক্যাল এফিমারিস গ্রন্থটি প্রকাশ করা। এই গ্রন্থে, আগেই বলেছি সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দৈনন্দিন অবস্থান ও আরও নানা তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। এ ছাড়া গ্রহণ-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয় ও

এসপ্ল্যানেড : স্টিল এনগ্রেভিং

চন্দ্রাস্তের মূল তথ্যগুলি দেওয়া থাকে।

(২) ভারতের নানা শহর ও স্থানের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্তের দৈনন্দিন সময় গণনা করে প্রতি বছর একটি আলাদা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকা ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন মেটায়। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংস্থার কাজে লাগে।

(৩) মহাসাগরে যেসব জাহাজ পাড়ি দেয়, সেইসব জাহাজের চালকেরা জানতে চান তাঁদের জাহাজের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান। এঁদের এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষরকম তথ্য গণনা করা হয়।

(৪) আমরা সাধারণ যেসব পঞ্জিকা ব্যবহার করি, তার মধ্যে দেওয়া থাকে দৈনন্দিন তিথি, নক্ষত্র, যোগ ইত্যাদির সময়। পঞ্জিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গণনা করা হয়। আর যাঁরা পঞ্জিকা প্রকাশ করেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় সবরকম তথ্য এই কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করেন। সর্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণনার ওপর ভিত্তি করে ১৩টি ভারতীয় ভাষায় ভারত সরকারের পঞ্জিকা এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

(৫) ভারতের বিভিন্ন শহরের রাতের আকাশে চাঁদ, বিভিন্ন গ্রহ ও উল্লেখযোগ্য নক্ষত্রদের অবস্থান কেমন হবে, তার আকাশ-চিত্র প্রতি মাসে তৈরি করা হয় এবং সারা ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় এইসব চিত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

(৬) জোয়ার-ভাটার তথ্যের পূর্বাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানারকম গণনার কাজ করা হয়।

(৭) এই কেন্দ্রের দুটি শক্তিশালী দূরবিন আছে। এই দূরবিনের সাহায্যে রাতের আকাশে জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। অনেক আগে থেকে এইসব অবস্থান কম্পিউটারের সাহায্যে গণনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। পরে দূরবিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ অবস্থান ও আগের নির্ণীত অবস্থানের যদি কোনও পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তখন গবেষণা শুরু হয়ে যায় কেন এই পার্থক্য হল, আর গাণিতিক সূত্রের তখন পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ-ব্যাপারে সমন্বয় সাধনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে, তার সঙ্গে ভারতের এই কেন্দ্র ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত খড়্গপুরের কাছে মালুয়া গ্রাম থেকে দূরবিনের সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করার কাজ এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়, তখন এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা হায়দরাবাদের নালগোণ্ডা পাহাড়ের ওপর থেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক এরকম নানা ঘটনা দূরবিনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করার কাজও এই কেন্দ্রে হয়ে থাকে।

(৮) অবস্থানিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানারকম গবেষণামূলক কাজও এখানে করা হয়।

কত কথা কলকাতা

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

তিন শতকের কলকাতায় স্মৃতির চেয়ে বিস্মৃতিই বেশি। এ-শহরের গোটাপনেরো নামের মধ্যে যে একটা ডাক-নাম ছিল 'যক্ষপুরী', সে-কথা এখন আর আমরা ক'জন জানি! বিতর্কিত হলেও কলকাতার ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের জে. ডি. ব্যারোসের মানচিত্রে যক্ষ বা Xqs ছিল আগরপাড়ার কাছে একটা অঞ্চল। এমনকী, দীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে বাগবাজারের ওপারে কলকাতার সীমানা ছিল এই যক্ষপুর। আর তা থেকেই নাকি আদি কলকাতার অন্য এক নাম হয়েছিল যক্ষপুরী। বিশ্বাস না হলে প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' বইখানা খুলে দ্যাখো। যক্ষপুরী না হলেও কলকাতা তো একদিন ছিল 'সিটি অব প্যালেসেস' বা 'প্রাসাদপুরী'। লোকগানে তাই কি বলা হয়েছে 'কলকাতা দলানের নালি গো...'

সেই মানুষটি কোথায় গেল?

কলকাতায় কি তবে কোনওকালে সত্যিই বিশালকায় যক্ষ, কিংবা কিন্নরেরা বাস করত? তা কেন হবে! তবে অনেক সময়ই তোমাদের মতো আমার মনে হয়েছে কলকাতায় একটা বিরাট মানুষ এখনও বাস করে। ইচ্ছে করলেই সে হাত বাড়িয়ে ধর্মতলার মোড়ে ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথার সেই গোল পৃথিবীটা পরখ করে ভূগোলের পাঠ নেয়। চিড়িয়াখানার পাঁচিলের ভেতর দক্ষিণ-পুব কোণে একটা হাতের মুঠোয় ধরা বিশাল লাল বল নিয়ে লারউডের মতো খেলতে পারে। শহরের কোনও হোসিয়ারির দোকানে ঝোলানো সেই বিশাল গেঞ্জিটা নিশ্চয়ই সেই বিশাল মানুষটির। চৌরঙ্গি রোড আর সুরেন ব্যানার্জি রোডের মুখে একটা বাড়ির ছাদে লিপটন-মার্কা যে বিরাট কেটলি থেকে আলো জ্বললেই চায়ের কাপগুলো ভরে উঠত, সেসব তারই তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। মতি শীল স্ট্রিট ধরে এগিয়ে গেলে সেই যে দোকানের সামনে একটা বিশাল স্ট্যাম্প বা সিলমোহর, ক্যারেকটার সার্টিফিকেট অ্যাটেস্ট করার সময় নির্ঘাত সেটি ব্যবহার করে ওই বড় মানুষটি। কিংবা পেন হসপিটালের সামনের পেল্লায় সেই কলমটি দিয়ে নিশ্চয়ই সে লিখে রাখে এ-শহরের রোজনামচা। আর সে যখন পুজোয় বসে তখন বোধ হয় চৌরঙ্গির ধারে সেই বিশপ হাউসের ঢাউস ঘণ্টাটা বাজায় আরতির সময়।

এই ঘণ্টাটা কিন্তু চিনের নিংপো শহর থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল ১৮৪৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির এক ক্যাপ্টেন ওয়ার্ডেন সেদিন এই ঘণ্টা উপহার দিয়েছিলেন কলকাতার বিশপকে। গির্জার এই ঘণ্টাধ্বনি শুনলে নাকি মন থেকে সব পাপ নিঃশেষ হয়। মৃতেরা স্বর্গের দিকে উঠে যায় অবলীলায়। এসব কথা চিনে ভাষায় লেখা আছে ওই ঘণ্টার গায়ে। এইরকম কত কথাই না আছে এই কলকাতার।

মনুমেন্টের চূড়ায় মজলিশ

প্রায় দুশো সিঁড়ি ভেঙে মনুমেন্টের কাঁধে বসে সাহেবরা একবার ডিনার খেয়েছিলেন। বীর সৈনিক ডেভিড অক্টারলোনির যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত হয় এই মনুমেন্ট, আজকাল যার নাম শহিদ মিনার। ১৫ জুলাই, ১৮২৫ সালে মিরাট শহরে মারা যান অক্টারলোনি। এ-দেশের মানুষ এবং ইউরোপীয়দের চাঁদায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করে বাঁশির ছাঁদের এই স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি করেন জে. পি. প্যাসকার। এক পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস নোলেস রবিসন এর ডিজাইনার। এঁরই নকশায় তৈরি হয় আর-এক বিখ্যাত বাড়ি মেটকাফ হল।

মনুমেন্টের উচ্চতা কেউ বলেন ১৫২, কারও মতে ১৬৫ ফুট। তবে আকাশছোঁয়া এই স্তম্ভটি যে সেকালেই কলকাতার বিস্ময় হয়ে ওঠে দীনবন্ধু মিত্র তা জানিয়ে দিলেন পদ্য করে:

বীরকীর্তি মনুমেন্ট পরশে গগন।
কলিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সুশোভন ॥

তারপর স্বপ্নে-দেখা পালিয়ে-যাওয়া কলকাতার মনুমেন্টকে রবীন্দ্রনাথের বিনু ভেবেছিল:

মনুমেন্টের দোল যেন খ্যাপা হাতি।
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।

মনুমেন্ট হাতির শুঁড় হোক কিংবা কলকাতার হাতের রাজদণ্ড যাই হোক এই স্তম্ভের ওপরের অংশটি সিরিয়ার স্তম্ভস্থাপত্যের অনুকরণে আর ভিত্তি অংশটি মিশরীয় শৈলীতে তৈরি। আর একেবারে ওপরের টুপির মতো ধাতুর ঢাকনাটি নাকি তুর্কি ঢঙে গড়া। আকাশের দিকে ওঠবার পথে মনুমেন্টের স্তম্ভটি ঘিরে আছে দু' সার ব্যালকনি। মিনারের দেওয়াল কিন্তু ইঁটের তৈরি। আর ১৯৮ খানা সিঁড়ি, যা বেয়ে শীর্ষে পৌঁছতে হয়, সেগুলো চুনারের বেলেপাথর কেটে বানানো। শোনা যায়, বিরাশিটি ২০ ফুট শাল খুঁটি ৮ ফুট মাটিতে ঢুকিয়ে এর ভিতের কাজ শুরু হয়েছিল।

এহেন মনুমেন্টের কিন্তু কোনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ। মনুমেন্টের নির্মাণ-কাজ শেষ হয়েছে কিছুকাল হল। কিছু কাজ তখনও বাকি। সবচেয়ে ওপরের ব্যালকনির গা ঘেঁষে তিন ফুট উঁচু করে গাঁথা হয়েছে দেওয়াল। এমনই এক সময়ে বারোজন সাহেবের খেয়াল হল মনুমেন্টের অলিন্দে বসাবেন সান্ধ্যবাসর। খাওয়াদাওয়া গানবাজনা হবে সেখানে। ব্যালকনির চারধারে মজবুত করে রেলিং দেওয়া হল। চেয়ার বিছানো হল বারোটি। কলকাতা দেখল ১৪৫ ফুট উঁচুতে মজার মজলিশ। নীচে তখন পিঁপড়ের সারের মতো মানুষ, দেশলাই-বাক্সের মতো যানবাহন। সেই মজলিশের কোনও ছবি না পাওয়া গেলেও এ-ঘটনার সাতাশ বছর পর মনুমেন্টের চূড়া থেকে কলকাতার এক দৃশ্য এঁকে রেখেছেন চিত্রকর এইচ. এল. ফ্রেজার। সেদিনের ডিনার-পার্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহেবদের কাগজগুলো লিখল, 'অদ্বিতীয় আর উচ্ছ্বাসময় এক অনুষ্ঠান'।

সেদিন ছিল শনিবার। সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ। সালটা আগেই বলেছি, ১৮৩০। সম্ভবত চাঁদনি রাতে সেই মজলিশ শুরু হয়েছিল সন্ধে ছ'টায়, চলেছিলো দীর্ঘ সময় ধরে, প্রায় রাত ন'টা পর্যন্ত। আজ থেকে প্রায় একশো ষাট বছর আগে সেই স্তম্ভের গায়ে শূন্যে-ঝোলা বারোজন মানুষের হইহুল্লোড় কলকাতা কেন, ভূভারতে এক অকল্পনীয় ঘটনা। মিনারের চূড়ায় ডিনারের সেই আশ্চর্য কাহিনী এখন ইতিহাসের বিষয়।

কলকাতার আদি ক্রিকেট

ডেভিড অক্টারলোনি সেই ১৮০৪ সালে যখন হোলকারের সৈন্যদের হাত থেকে দিল্লি রক্ষা করছেন, সে-বছরই জানুয়ারি মাসে কলকাতার ময়দানে উইকেট আগলাচ্ছে দুই ইংরেজ ক্রিকেটার দল। সে-বছর ১৮ আর

১৯ জানুয়ারি কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা। একদিকে এটোনিয়ান দল, অন্যদিকে বাকি কলকাতা। এই খেলায় প্রথম দল এক ইনিংসে রান করে ২৩২। অন্যদল দু' ইনিংস মিলিয়ে নাকি করেছিল ৮০। এর প্রায় বত্রিশ বছর বাদে এসপ্ল্যানেডে আর-একটা বড় ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ওই এটোনিয়ান দলের সঙ্গে অবশিষ্ট কলকাতার। খেলোয়াড়দের মধ্যে সেদিন ছিলেন সিভিল সার্ভিসের বড় অফিসারেরা, এক ব্যারিস্টার, এমনকী, মাদ্রাজ ঘোড়সওয়ার বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ সৈনিক।

জোব চার্নকের নামে পাথর

কথায় বলে বারবার তিনবার। ২৪ অগস্ট, ১৬৯০। এক বর্ষামুখর দিনে মোহনটুনির ঘাটে তৃতীয়বার পা রাখলেন জোব চার্নক। সেই ক্ষণেই শহর কলকাতার অভিষেক হয়ে গেল। ১৬৯৩ সালে জানুয়ারি মাসে মারা গেলেন চার্নক। একখণ্ড পাথরে লেখা রইল তাঁর সমাধিলিপি। মৃত্যুর দু' বছর পরে সেটি বসানো হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যুর ঠিক দু'শো বছর পরে ১৮৯২-৯৩ সালে চমকপ্রদ এক ঘটনা ঘটল। চার্নকের সমাধি খুঁড়তে গিয়ে রেভারেন্ড হাইড-সাহেব কফিনটিকে মাটির ওপর তুলতেই চার্নকের হাড্ডিসার হাতখানা দেখা গেল। "থাক, থাক" বলে কফিনটি বন্ধ করালেন তিনি। কিছুটা ওপরের স্তরে পাওয়া নীলাভ কালো সমাধিফলকটার দিকে তাকালেন এক পলক। ওদিকে তখন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভূ-বিজ্ঞানী টি. এইচ. হল্যান্ড মাদ্রাজের দশ মাইল দক্ষিণে পল্লবরম অঞ্চলে সেন্ট টমাস পাহাড়ে আবিষ্কার করলেন এক নতুন শিলা—হাইপারস্থোন গ্রানাইট জাতীয় পাথর। পাথরটির নামকরণ করতে চান হল্যান্ড। কলকাতায় এসে শুনলেন জোব চার্নকের সমাধিফলক খুঁড়ে তোলা হয়েছে সম্প্রতি। নিতান্ত কৌতূহলবশে সেটি দেখতে গিয়ে তো তাজ্জব। এ যে একই ধরনের শিলা। এই গ্রানাইট পাথরের খণ্ডেও তো রয়েছে হাইপারস্থোন, মাইক্রোক্লিন, কোয়ার্টজ ও আকরিক লোহার ধাতব উপাদান। হল্যান্ড-সাহেব নতুন দেখা পাথরের নাম দিলেন জোব চার্নকের নামে চার্নকাইট।

পদবির নামে ক্যালকাটা

এ-শহরের একদল মানুষ যে ক্যালকাটাওয়ালা পদবিতে পরিচিত সে-কথা কজন জানে! এই শতকের গোড়ায় এরা এসেছিলেন আমেদাবাদ অঞ্চল থেকে।

এশিয়ায় গানের রেকর্ড প্রথম তৈরি হয় এই কলকাতাতেই

সন্তোষকুমার দে

'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা'—দাঠাকুরের লেখা এই মজাদার গানটি যে কেবল পরিহাস নয়, তা টের পেয়েছিলাম প্রথম যেদিন শিয়ালদা স্টেশনে নামি। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের কথা, শিয়ালদা স্টেশনের তখন এত বড় বাড়ি ছিল না, তবে যে বিরাট টিনের শেডের প্ল্যাটফর্মে নামলাম, তাও রীতিমত পেল্লায় মনে হয়েছিল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি অগুনতি লোক আসছে, যাচ্ছে আর যতদূর তাকাই দোকান-বাজারের ভিড়। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ কি এখানে রথের মেলা?"

বাবা হেসে বললেন, "তা কেন হবে? এটা বোশেখ মাস, রথের অনেক দেরি, এটা রোজকার ভিড়।"

আমাদের দেশ খুলনা। শহরের মাঝখান দিয়ে যে বড় রাস্তাটি রূপসা নদীতে গিয়ে পড়েছে, তার নাম যশোর রোড। হয়তো একসময় যশোর যেতে ওই রাস্তা তৈরি হয়েছিল। পরে শুনলাম উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে আর. জি. কর রোডের লেজ ধরে রয়েছে ওই যশোর রোড। তখন আমরা আঁচ করতাম। যশোর রোড ধরে গেলে একসময় কলকাতায় পৌঁছনো যায়। বললে বিশ্বাস করবে না, আমার এক ডানপিটে সহপাঠী বন্ধু সত্যিই তাই করেছিল, সোজা হেঁটে পৌঁছেছিল কলকাতায়। তার পথের অভিজ্ঞতা লিখলে আর-এক শ্রীকান্তের ডায়েরি হতে পারে।

কলকাতায় কিছু দিন থাকার পর বুঝলাম, নানা দিক থেকে যশোর রোডের মতো আরও অনেক রাস্তা এসেছে, যেমন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সংক্ষেপে বি টি রোড, যা ধরে হেঁটেই চলে যেতাম দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধনক্ষেত্র ভবতারিণীর মন্দিরে। তারপর হেঁটেই উইলিংডন ব্রিজ দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড়ে দেখতাম রামকৃষ্ণ দেবের বৃহৎ মন্দির তৈরি হচ্ছে। মার্টিন বার্ন কোম্পানির লোকেরা কত যত্ন নিয়ে মন্দিরের নানা অলঙ্করণ সিমেন্টে ঢালাই করে বড়-বড় চৌবাচ্চায় জলে ভিজিয়ে রাখতেন। একদিন ওই মন্দিরের দুই 'ডোনার' আমেরিকান ভক্ত মহিলাকেও মন্দিরে দেখেছিলাম সাদা থান পরে খালি গায়ে ঘুরতে।

কলকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনে যেতে

তখন একটি ভাসমান পনটুন ব্রিজ পেরোতে হত। রোজ কাগজে খবর থাকত, কখন জাহাজ পারাপারের জন্য হাওড়া ব্রিজ খোলা থাকবে। যে লোহার ছোট ডিঙিগুলি পাশাপাশি রেখে নদীর এপার-ওপার যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তার খানিকটা খুলে সরিয়ে নেওয়া হত, তখন আর নৌকা ছাড়া পারাপার করা যেত না।

কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট থামওয়ালা সিনেট হলটির কথা মনে পড়ে। যখন সেই ঐতিহাসিক বাড়িটি ভাঙা শুরু হয়, পথের পাশে পড়ে থাকা গোল থামগুলি দেখলেও বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত।

আগে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরি ছিল এসপ্লানেডে, সেখানে ঢুকলে মনে হত, যেন যখের ধনের সন্ধানে এসে পৌঁছে গেছি যথাস্থানে। তারপর যখন সেটি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হল এবং মূল কর্মকেন্দ্র চলে গেল আলিপুরে বেলভেডিয়ারে, তখন দূরের জন্যই আর ঘনঘন যাওয়া সম্ভব হত না।

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার ব্রিজ (ঝোলানো সেতু) তৈরি শুরু হল গঙ্গার উপরে। জার্মান এঞ্জিনিয়াররা ব্রিজ তৈরি করছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই ব্রিজ তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধ-শেষে আবার যখন শুরু হল তখন মাঝে-মাঝে দেখতে যেতাম, নদীর দু'পাশ থেকে কীভাবে ইস্পাতের কাঠামো শূন্যে ঝুলে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল জলের উপর দিয়ে। ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে তার উপর পাতা হল ট্রামের লাইন। তখন আর কী, মজা করে শিয়ালদা থেকে হাওড়ায় চলে যেতাম ট্রামে চেপে।

হাওড়ায় আগেও ট্রাম ছিল, কিন্তু তা কলকাতার ট্রামের কাছে একেবারে তুচ্ছ মনে হত। আমরা দুপুরে দু' পয়সার কনসেশন টিকিটে ট্রাম চেপে বেরিয়ে পড়তাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ট্রামে চেপে হ্যারিসন রোডে এসে ট্রাম পালটে হাওড়ায় যেতাম—তখন ট্রান্সফার টিকিট পাওয়া যেত তার জন্য। সার্কুলার রোডে ট্রাম ছিল না, লোকে বলত, ও রাস্তায় সায়ান্স কলেজ আর সার জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ক্ষতি হবে বলে ট্রাম চালানো হয় না। পরে কিন্তু সে পথেও ট্রাম এল, একেবারে গ্যালিফ স্ট্রিট থেকে এসপ্লানেড ঘুরে ডালহৌসি হয়ে হাওড়া পর্যন্ত যেত।

মনে পড়ে, আগে কলকাতার ট্রাম যখন ঘোড়ায় টানত তখন শহরের মাঝে-মাঝে ঘোড়া পালটাবার জন্য আস্তাবল থাকত। বিদ্যুৎ-চালিত ট্রাম এলে সেই আস্তাবল অকেজো হয়ে পড়ল। তেমন একটি বড় আস্তাবল ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানের বিপরীত দিকে। জায়গাটিকে বলা হত পান্তির মাঠ। সেই আস্তাবলের বিরাট টিনের শেড, লোহার কাঠামো সহ কিনে নিয়ে মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার শেড করেছিলেন কোম্পানির সেই সময়কার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু। তাঁর মুখে শুনেছি, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের প্রথম ডি এসসি সার পি· সি· রায় এভাবে কারখানা গড়ে তোলায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল রসায়ন শিল্পের পথপ্রদর্শক। বর্তমান সায়ান্স কলেজের দক্ষিণ পাশের বাড়িটিতে যেখানে এখন এস আনটুল কম্পানির বৃহৎ ছাপাখানা, সেই বাড়িতেই বাস করতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর নিজের ঘরের মধ্যেই নিজেই শুরু করেছিলেন জোয়ানের আরক, বাসকের সিরাপ প্রভৃতি নিয়ে প্রথম ভারতীয় ভেষজ কারখানা। সেটাই কালক্রমে বৃহৎ বেঙ্গল কেমিক্যালে পরিণত হয়ে সারা ভারতকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স কলেজ গড়ে উঠল পার্শিবাগানে। পাশে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দির, যেখানে রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা আসতেন। বউবাজারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'দা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স', যেখানে গবেষণা করে সার সি· ভি· রামন জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। এখন প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুরে বিরাট আকার ধারণ করেছে।

১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের রাজধানী ছিল, তাই তার গুরুত্ব ছিল সব শহরের চেয়ে বেশি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি-চর্চা—সব দিকেই কলকাতা ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র। ইংরেজ সরকার বাঙালির ক্ষমতা চূর্ণ করতে প্রথমে বাংলাকে দু' টুকরো করে কোনও সুফল না পাওয়ায় ভারতের রাজধানী নিয়ে গেল দিল্লিতে। তবু বাংলার শিল্পবাণিজ্য বেঁচে ছিল। বাংলার পাটশিল্প ছিল তার একচেটিয়া, এঞ্জিনিয়ারিং, ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্প, মুদ্রণ, প্রকাশন, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত শিল্পেও তার স্থান একদা ছিল সর্বোচ্চে। সঙ্গীত প্রচারে যখন রেডিও, টিভি, এমনকী, সবাক চলচ্চিত্র ছিল না, তখন আসর জমিয়ে রেখেছিল গ্রামোফোন রেকর্ড। রেকর্ড তৈরিও শুরু হয় কলকাতায়। ডিসক রেকর্ড যখন এ-দেশে আমদানি শুরু হয়নি সেই ১৮৯৮ সালে গন্ধবস্তু ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বসু এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র আমদানি করে এদেশে সিলিন্ডার রেকর্ড তৈরি করেন এবং বোসেস রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়। এমনকী, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' নিজে সুর করে বোসেস রেকর্ডে গেয়েছিলেন। পরে ডিস্‌ক রেকর্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেই রেকর্ড ফ্রান্স থেকে প্যাথে কম্পানির দ্বারা ১১" ডিস্‌ক রেকর্ডে অন্য পিঠে 'সোনার তরী' কবিতাটির আবৃত্তি সহ রূপান্তরিত করাও হয়েছিল। এই দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডটি এখন রবীন্দ্রভারতীর মিউজিয়ামে আছে।

১৯০১ সালের নভেম্বরে কলকাতায় গ্রামোফোন কম্পানির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিকানা ৬/১ চৌরঙ্গি। ব্যবসা এত দ্রুত বেড়ে যায় যে, ছ' মাস পরে দোকান সরিয়ে নিতে হয় ৮/২ ডালহৌসি স্কোয়ারে, বছর না ঘুরতেই আরও বড় বাড়িতে, ৭নং এসপ্লানেড ইস্টে। সেখানে বছর-পাঁচেক কাটিয়ে তারা একেবারে নিজেদের কারখানা তৈরি করে, ১৯০৮ সালে অফিস চলে যায় ১৩৯ বেলেঘাটা রোডে। এখনে শুরু হয় রেকর্ড তৈরি। তা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রথম রেকর্ড তৈরির কারখানা।'

অবশ্য তার আগে ২৭ অক্টোবর ১৯০২ তারিখে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রেডারিক গেইসবার্গ নামে ডিস্‌ক রেকর্ড আবিষ্কারক এমিল বার্লিনারের সবচেয়ে নিপুণ রেকর্ডিং এঞ্জিনিয়ার কলকাতায় আসেন এদেশের শিল্পীদের গান রেকর্ড করতে। সেই রেকর্ড জার্মানির হ্যানোভারে পাঠিয়ে ডিস্‌ক তৈরি করে ভারতে এনে বিক্রি করাই ছিল উদ্দেশ্য। তিনি সদলবলে কলকাতার থিয়েটারে যান, তারপর ৫ নভেম্বর ১৯০২ তারিখে ভারতের সর্বপ্রথম রেকর্ড করেন কলকাতার গহরজানের গান। গহর নানা ভাষার গান গাইতে জানতেন এবং রেকর্ডে গানের পর শোনা যেত তাঁর নিজ কণ্ঠে বলা—My name is Gauhar Jan কথা ক'টি। অন্যদিকে সে-যুগের বিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়াল পেশাদারি শিল্পী হতে অস্বীকার করেন এবং কম্পানিকে বাধ্য করেন করেন রেকর্ড লেবেলে তাঁর নামের সঙ্গে 'অ্যামেচার' অর্থাৎ 'অপেশাদার' কথাটি লিখতে। এমন দিন ছিল যে, গ্রামোফোন ঘরে থাকা আভিজাত্যের চিহ্ন বলে মনে করা হত। তাই আমার লেখা 'সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন' স্লোগানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতার আর-এক পরিচয়ই ছিল যেন—কলের গানের শহর।

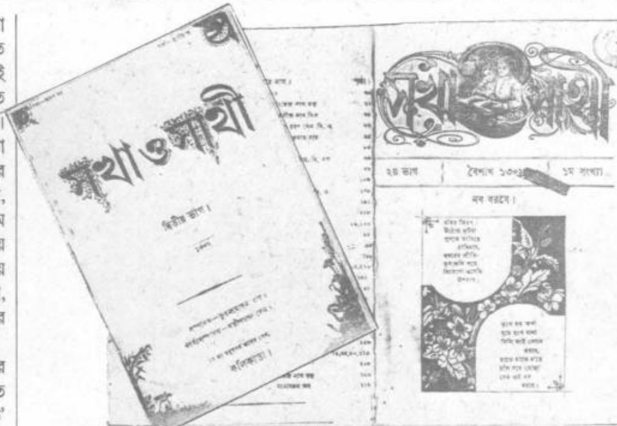

দিগ্‌দর্শন থেকে রামধনু

সিদ্ধার্থ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় কী কী পত্রিকা পড়তেন ? ছোটদের পত্রিকা বলতে এখন যা বোঝায় তখন তার নেহাতই অভাব । 'গ্রাহক' হিসেবে তাঁর হাতে নিয়মিত কোনও ছোটদের কাগজ নিশ্চয় আসত না । তবে সেজদার ও বড়দার আলমারির পাল্লা খুলে রবীন্দ্রনাথ দুটি পত্রিকা আবিষ্কার করেছিলেন । তিনি নিজেই লিখেছেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে ছবিওয়ালা মাসিকপত্রের একটি খণ্ড নিয়ে শোবার ঘরের তক্তপোশের ওপর চিৎ হয়ে মশগুল হয়ে নহাল তিমিমাছের বিবরণ, কাজির বিচারের মজার গল্প ও কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়তেন ।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয় । প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে 'জীবনস্মৃতি' লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এ রকম বাংলা পত্রিকা আর দ্বিতীয়টি তাঁর চোখে পড়েনি । তবে বিবিধার্থ সংগ্রহ -কে ছোটদের পত্রিকা বলা ঠিক হবে না । বড়দের বইও ছোটরা উপভোগ করতে পারে, এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল । ছোটদের নেহাত ছোট মনে করে, 'সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণ জল মিশাইয়া' ছেলেভুলানো বই লেখার ব্যাপারটা তাঁর মনঃপূত ছিল না ।

দ্বিতীয় যে পত্রিকাটি ছেলেবেলায় পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি সত্যিই কিশোরদের পত্রিকা । ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'অবোধ-বন্ধু' নামে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় । সম্পাদক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ । এক বছর পরে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন । বিহারীলালের কবিতা প্রথম এই কাগজেই পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত । এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত ফরাসী গ্রন্থ 'পল বর্জিনিয়া') পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই । আহা, সে কোন্‌ সাগরের তীর ! সে কোন্‌ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন ! ছাগলচরা সে কোন্‌ পাহাড়ের উপত্যকা ! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত । আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল !"

'অবোধ-বন্ধু' রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করলেও তার ভাষা ও বিষয় সাধারণভাবে ছোটদের কতটা টানতে পেরেছিল বলা মুশকিল । "পাখীর মধ্যে বাদুড় যেরূপ, চিন্তার মধ্যে সন্দেহ সেইরূপ । বাদুড় সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে উড়িয়া বেড়ায় সেইরূপ যে বিষয় আমরা ভাল জানি না সেই বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয় ।" —একটি নমুনাই যথেষ্ট । তবে সম্পাদক হিসেবে বিহারীলাল দুটি নতুন ব্যাপার শুরু করেছিলেন । পত্রিকাটিতে শুধু মেয়েদের লেখা নিয়ে একটি বিভাগ খোলা হয় এবং নিয়মিত গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হত ।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে প্রায় তেইশ বছরের বড় বঙ্কিমচন্দ্র । তিনি কী পত্রিকা পড়তেন ছেলেবেলায় ? এইভাবে ক্রমেই যদি আমরা আরও পিছোতে চেষ্টা করি, শেষ পর্যন্ত ১৮১৮ সালে পৌঁছে ঠেকে যেতে হবে । কারণ এই বছরেই প্রথম বাংলা মাসিক-পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে । দিগ্‌দর্শন-কে কিশোরদের পড়ার উপযোগী পত্রিকা বলা যেতে পারে । পত্রিকার প্রথম পাতাতেই লেখা থাকত 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' । গল্প কবিতার কোনও ঠাঁই ছিল না এখানে, ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি ও পদার্থবিদ্যা বা প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানই ছিল কাগজটির উদ্দেশ্য ।

ছবিওলা মাসিক পত্রিকা 'পশ্বাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮২২-এ । প্রত্যেক সংখ্যায় থাকত একটি জন্তুর ছবি আর তার বিবরণ । ছ'টি সংখ্যা প্রকাশের পর অন্যতম সম্পাদক ও চিত্রকর লসনের মৃত্যুতে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের প্রাইজ দেওয়ার জন্য ১৮২৮-এ এই ছ'টি সংখ্যা আবার একসঙ্গে বইয়ের আকারে ছাপা হয়েছিল । ১৮৩৩-এ হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র বিশ্বাস নতুন করে পশ্বাবলী প্রকাশ শুরু করেন ।

ইতিহাসের খাতিরে আরও কিছু প্রাচীন পত্রিকার নাম হয়তো করা যায়, কিন্তু সেটা হবে সুকুমার রায়ের ভাষায়, বলার জন্যই বলা, পাছে মামলা না ভেস্তে যায় । শিক্ষা আর শুকনো নীতি উপদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পত্রিকাকে আনন্দদায়ক করে তোলার প্রথম চেষ্টা করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন । শিক্ষক নয়, বন্ধু হিসেবেই পাক্ষিক পত্রিকা 'বালকবন্ধু' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮-এ । পরে এটি মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হত । ইস্কুলের ছাত্রদের কবিতা ছাপা, দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র থেকে চয়ন করা আকর্ষক সব খবর এবং ধারাবাহিক গল্প প্রকাশ ইত্যাদি বালকবন্ধু প্রথম শুরু করেছিল ।

বালকবন্ধু যে-কাজ শুরু করেছিল, তাকে পূর্ণ করল 'সখা' । সখা ও তার সম্পাদক

প্রমদাচরণ সেন শুধু ছোটদের পত্রিকার ব্যাপারেই নয়, বাংলা শিশুসাহিত্যের একেবারে পুরো চালটাই বদল করে গড়ে তুললেন এক নতুন রীতি। সত্যি বলতে এখনও ছোটদের বাংলা পত্রিকা বিষয়ের দিক থেকে সখা-র আদলেই গঠিত হয়।

সখার প্রথম বছরের (১৮৮৩) প্রথম সংখ্যা দিয়েই শুরু করি। দুটি কবিতা : 'আঃ ছেড়ে দাও না' ও 'ঊষা', গল্প : 'সতীশ এবং তাহার সঙ্গী', জীবনী : 'মহাত্মা হেয়ার সাহেব', প্রবন্ধ : 'মেয়েরা আমাদের কে ?' এবং 'বৃষ্টি' (কথোপকথনের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা), অনুবাদ : 'বিলাতের পত্র। ক্রীষ্টাল প্যালেস বা স্ফটিক প্রাসাদ-পরিদর্শন', ধাঁধা এবং ধারাবাহিক উপন্যাস 'ভীমের কপাল'-এর প্রথম কিস্তি। প্রত্যেকটি লিখেছিলেন স্বয়ং সম্পাদক— প্রমদাচরণ সেন।

প্রমদাচরণের 'ভীমের কপাল' প্রথম বাংলা কিশোর উপন্যাস। বলাই বাহুল্য, সখা-র আগে ছোটদের কাগজে কোনও উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি।

সব ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রথম সংখ্যার ধাঁধাগুলির ওপর চোখ বোলালেও প্রমদাচরণের সজীব মনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় :

সখা-র দ্বিতীয় সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ 'মাছি' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকেই তিনি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন সখা-য়—মাকড়সা, বানর, গিলকয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্রযাত্রা, নিয়ম এবং অনিয়ম ইত্যাদি। সম্পাদকের সঙ্গে জুটি বেঁধে তাঁর রচনা 'ধূমপান'-এর শুরুতে চুরুট কিনতে আসা যুবকদের মজাদার বর্ণনা ভোলার নয়, "একদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটী বাবু আসিয়া উপস্থিত। বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর হইবে, কিন্তু এত বড় ছেলের যত দূর ভদ্রতা জানা উচিত তাহার কিছু তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। পোষাক অতি পরিপাটী ; বাঁদর বাঁধিবার মত করিয়া বুকে পিঠে চাদর জড়ান ; কোঁকড়ান চুলে লম্বা সীথী ; চক্ষের চাউনীতে যেন অহঙ্কার পোরা ; জুতার শব্দ যাহাতে কিছু বেশী হয় মত করিয়া চলা..."।

ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে আরও দুটি ধারাবাহিক বিভাগ শুরু হয় সখা-য়—মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরদাদার গল্প' ও প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্তর 'শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষা'।

সখা-র প্রথম বছরের আর-একজন উল্লেখযোগ্য লেখক বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি জুন সংখ্যায় 'সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ছোটদের বাংলা কাগজে এটি প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং রিপোর্টিং।

সখা-য় প্রথম থেকেই লেখার সঙ্গে কিছু-কিছু ছবি ছাপা হত, কিন্তু তার মান খুব উন্নত ছিল না। ছবি ছাপার কৌশল তখনও খুব উন্নত হয়নি। প্রথম বছরের মধ্যে উল্লেখ করার মতো ছবি একটাই, তৃতীয় সংখ্যায় 'রেলের গাড়ী' প্রবন্ধের সঙ্গে জর্জ স্টিফেনসনের প্রতিকৃতি। কিন্তু এখানেও সম্পাদকের দূরদর্শিতার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, গল্প উপন্যাসের সঙ্গে ছবি ছাপার ততটা প্রয়োজন নেই, বরং প্রবন্ধ ইত্যাদিকে আকর্ষক করার জন্য ছবির দিকে মন দেওয়া উচিত।

সখা-র আগে যদি বা ছোটদের জন্য কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রমদাচরণের আগে কিন্তু বাঙালি শিশুসাহিত্যিক বলে কেউ ছিলেন না। মানে, শুধু ছোটদের জন্যই লিখেছেন এমন কেউ। শুধু ছোটদের জন্য লিখেছেন আর পত্রিকা বার করেছেন বললে প্রমদাচরণের প্রতি অন্যায় করা হবে। ছোটদের জন্য তাঁর জীবনটাকেই নিবেদন করেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন এন্টালি থানার দারোগা। বাবার কঠোর শাসন ও পাঠশালায় পণ্ডিতমশাইয়ের উৎকট 'চোদ্দ পোয়া' 'ঘুঘুপোড়া' ইত্যাদি অত্যাচার তাঁর বাল্যকালকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সখা-র সম্পাদক হিসেবে তিনি তাই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। সারাটা জীবন লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। চোদ্দ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর তাঁর বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গৃহশিক্ষকতা করে কলেজের পড়ার খরচ সংগ্রহ করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮০-র মার্চ মাসে সিটি স্কুলে তিনি লাভ করলেন শিক্ষকের চাকরি। এবং জীবনের শেষ দিন অবধি শিক্ষকতা করেছেন। মাত্র ছাব্বিশ টাকা মাইনে পেতেন এবং তার অধিকাংশই খরচ হত স্কুলের বাইরে ছাত্রদের দেহমন তৈরি করার কাজে। মাসে একবার করে নিজের খরচে ছাত্রদের নিয়ে তিনি শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেরোতেন। টাকাকড়ির টানাটানি সাঙ্ঘাতিক চেহারা নিল সখা প্রকাশের পরিকল্পনা মাথায় ঢোকার পর। শ দুয়েক টাকা জোগাড় করতে হবে কাজ শুরু করার আগে। কথার কথা নয়, সত্যিই খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের খরচ কমিয়ে প্রমদাচরণ টাকা জমিয়েছিলেন সখা প্রকাশ করার জন্য। নিজের দিকে না তাকিয়ে সখা-র জন্যই বলতে গেলে জীবন দিয়েছেন প্রমদাচরণ। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে, আড়াই বছর সখা সম্পাদনা করার পর সম্ভবত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

প্রমদাচরণের মৃত্যুর পরেও তাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তারপরে সখা-র হাল ধরেন প্রমদাচরণের ভাই অন্নদাচরণ ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। শেষে ১৮৯৪-এ ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' পত্রিকার সঙ্গে মিলে 'সখা ও সাথী'-র জন্ম হয়।

প্রমদাচরণের আর-এক কীর্তি শিশু-কিশোর লেখক গোষ্ঠীর সৃষ্টি। সখা-র দ্বিতীয় বছর থেকেই তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে পেয়েছিলেন সহযোগী হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোর সে সময়ে প্রমদাচরণের সঙ্গে 'ব্রাহ্মকেল্লা' নামে পরিচিত ও সখা-র কার্যালয় ৫০ নম্বর সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে বাস করতেন। উপেন্দ্রকিশোরকে শিশুসাহিত্য রচনায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করেন। বিপিনচন্দ্র পালের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধের কথা আগেই বলা হয়েছে, এ ছাড়াও তাঁর মৌলিক উপন্যাস 'অজিতকুমার' বাংলা সাহিত্যে কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম কিশোরপাঠ্য উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সখা-য়। চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ রামব্রহ্ম সান্যালও নিয়মিত লিখেছেন সখা-য়।

ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত সাথী (১৮৯৩) ও সখা ও সাথী শিশু সাহিত্যিকদের মহলে আরও কয়েকটি নতুন নাম যুক্ত করে। ভাষা ও পরিবেশন ভঙ্গি হয়ে উঠল আরও সরস। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জলধর সেন, জগদানন্দ রায় ও স্বয়ং সম্পাদক নিয়মিত লিখতেন। উপেন্দ্রকিশোরের অনবদ্য নাটিকা 'কেনারাম বেচারাম'ও সাথী তেই প্রকাশিত হয়। সখা ও সাথী-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড'-র কথা আলাদাভাবে বলা উচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে ছোটদের পত্রিকায় এই রোমাঞ্চকর 'থ্রিলার' ও অপরাধ-কাহিনী প্রকাশ অবশ্যই সম্পাদকের দুঃসাহসের কথাই জানিয়ে দেয়। ভুবনমোহন বাংলায় ছোটদের জন্য একটি অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীও লিখতে শুরু করেন। কিন্তু শেষ করতে পারেননি। বহুকাল পরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখাটি সমাপ্ত করার পর 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' প্রকাশিত হয়েছিল। সাথী'র অন্য লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কলকাতার মাটির নীচে

অসীমরতন ঘোষ

সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা গ্রাম থেকে কলকাতা শহর হওয়ার কাহিনী প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। কিন্তু তার আগে, যখন কলকাতা শহর ছিল না তখনও সেখানে ঘটেছে অনেক ঘটনা। সেইসব ঘটনা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব মনে হলেও তা প্রমাণিত সত্য। এই সমস্ত খবর পাওয়া গেছে কলকাতার মাটির নীচে স্তরে স্তরে সাজানো বিভিন্ন বয়সের পাথর পরীক্ষা করে। কলকাতার মাটির নীচের এইসব পাথরের খোঁজ পড়েছে নানা সময়ে, নানা কাজে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য জানিয়েছেন পেট্রোলিয়ম সন্ধানকারীরা।

পৃথিবী কঠিন হয়ে যাওয়ার পর যেটুকু পরিবর্তন দেখা গেছে, তা সীমাবদ্ধ থেকেছে শুধু ত্বক-অঞ্চলে। আমাদের এই কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে তখন পৃথিবীতে ফুল-ফোটা গাছেরা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে। টাইরানোসরাস, ট্রাকোডন ও ট্রাইসেরাটপ্সের মতো শেষ-দশার বড়সড় ডাইনোসরেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর মাটি। সময়টা আজ থেকে দশ কোটি বছরেরও পুরনো। বিজ্ঞানীরা এই সময়টাকে বলতেন ক্রিটেশাস কল্প বা ক্রিটেশাস পিরিয়ড।

বেশ কয়েক কোটি বছর শান্ত থাকা ভূমি বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতে থাকল টগবগ করে ফুটতে-থাকা, গলে-যাওয়া পাথর। একেই বলা হয় লাভা। শুধু কলকাতা নয়, গলে যাওয়া পাথরের বন্যায় ভেসে গেল সারা বাংলা। এই লাভা শুকিয়ে ব্যাসল্ট পাথর তৈরি হতে সময় লেগেছে বেশ কিছুটা। তারপর একসময় সমুদ্রে দেখা দিল জলোচ্ছ্বাস। বলা ভাল, সেই সময় কলকাতার কাছেই ছিল দুটো সমুদ্র—উত্তরে হিমালয়ের জায়গায় ছিল টেথিস আর দক্ষিণে সমুদ্র তখন সবেমাত্র তৈরি হয়েছে। গণ্ডোয়ানাল্যান্ড নামে অনেকদিন একসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা, আফ্রিকা এইসব মহাদেশ দূরে চলে যাওয়ায় আর ভারত নিজেই উত্তরে চলে আসায় সৃষ্টি হয় এই সাগরের। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল সেদিনের বাংলার অনেকখানি এলাকা। কলকাতা তখন গভীর সাগরের নীচে। সে সময়ের সমুদ্র-উপকূল আজকের জায়গায় ছিল না। সাগরের ঢেউ কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে এসে আছড়ে পড়ত হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনা জেলার মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত তটরেখার ওপরে। এই তটরেখা আবার মুর্শিদাবাদের কাছে এসে পূর্বে বাঁক নিত। হাজার হাজার বছর ধরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের আক্রমণে ডাঙার ব্যাসল্ট পাথর ক্ষয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। সেইসব ক্ষয়ে যাওয়া জিনিস জমা হচ্ছিল কলকাতা অঞ্চলে, সমুদ্রের নীচে।

এর পরে কেটে গেল বেশ কয়েক লক্ষ বছর। আগ্নেয়শিলার ওপরে একে একে জমা হতে লাগল মিষ্টি জলে আটকে যাওয়া পলি, উপহ্রদে জমা-হওয়া পলি ও বালি, মোহনায় সঞ্চিত পলি, বালি ও কাঁকর। মাটি খুঁড়ে এইসব পাথর পেয়ে যাওয়ায় আমরা জেনে ফেলেছি কলকাতার পরিবেশ কীভাবে বদলে গিয়েছিল। এর পরের কয়েক কোটি বছরের মধ্যে সমুদ্র বেশ কয়েকবার পিছিয়ে যায় এবং বেশ কয়েকবার এগিয়ে আসে। এই কারণে, কোনও একটা জায়গায় কখনও জমা হত চুনাপাথরের মতো গভীর জলের পাথর, আবার কোথাও-বা সঞ্চিত হত সেল বা বেলেপাথরের মতো অগভীর জলের পাথর। চার-পাঁচ কোটি বছর আগের সেই সমুদ্রের প্রধান বাসিন্দা ছিল ফোরামিনিফার নামে এক খুদে প্রাণী। একসঙ্গে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি ফোরামিনিফার ঘুরে বেড়াত সাগর জলে ডুবে থাকা সেদিনের কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে।

কলকাতা কি তেলে ভাসছে ?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, সারা পৃথিবীর অধিকাংশ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় ৭ কোটি থেকে ৭০ লক্ষ বছরের মধ্যে জমা হওয়া পাথরের মধ্যে। শুধু তাই নয়, পাথরটা বেশ ফুটো-ফাটা হওয়াও দরকার। আর সবচেয়ে বড় কথা, মাটির নীচের পাথরের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া তেলের স্রোতকে বিশেষ কিছু-কিছু গঠন-বন্দী করে ফেলতে পারে। এর ফলেই তৈরি হয় তৈলভাণ্ডার। এই ধরনের গঠনের নাম তেল-ধরা-ফাঁদ বা অয়েলট্র্যাপ। এইসব ক'টা জিনিস ঠিকমতো না থাকলে সেখানে তেল থাকারও কোনও সম্ভাবনাই নেই।

রিমোটসেন্সিং স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো তথ্য থেকে তৈরি ছবি, বিমান থেকে তোলা আকাশ-ছবি ও ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা এ-সবই হল তেল-খোঁজার প্রথম পর্যায়ের কাজকর্ম। মাটির নীচের পাথরের চৌম্বকত্ব ও অভিকর্ষজ-ত্বরণ মাপার যন্ত্র বিমানের মধ্যে নিয়ে চালানো হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধানে। এর পর কৃত্রিম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে মৃদু ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, তার চলন-পথ পরীক্ষা করে মাপা হয় মাটির নীচের পাথরের স্থিতিস্থাপকতা। এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে তেল-ধরা-ফাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য কোথাও-কোথাও তৈরি করা হচ্ছে নলকূপের গর্তের আকারের গভীর গর্ত। একেই বলা হয় ড্রিলিং। এই ধরনের গর্ত খোঁড়ার সময়ে বের করে আনা হয়—গর্তের মাপে কাটা পাথরগুলি বা ড্রিলকোরগুলি। ড্রিলকোর পরীক্ষা করে মাটির নীচে নানা গভীরতায় থাকা পাথরের চরিত্র পরীক্ষা করা যায়।

এইসব পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, কলকাতার মাটির গভীরে-থাকা পাথরের কথা। টার্শিয়ারি বয়সের পাথর রয়েছে কলকাতার মাটির বেশ কয়েক হাজার ফুট নীচে। ওই সময়ে কলকাতা ছিল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উপকূল অঞ্চলের অংশ। তখন কলকাতার পূর্বে ছিল সাগর আর পশ্চিমে ছিল ডাঙা। সমুদ্রের এগনো-পেছনো অবশ্য তখনও ছিল। এই ধরনের পরিবেশে জমা-হওয়া পাথর ও তার গঠন বেশ ভালরকম তেল-ধরা-ফাঁদ তৈরি করে। ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূ-পদার্থবিদরা দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে কলকাতা এলাকার পাথর সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, এখানের পাথরে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পেট্রোলিয়ম পাওয়ার জন্য দরকারি সব ক'টি শর্তই পালন করে এই অঞ্চলের পাথর।

কলকাতা-ক্যালেন্ডার

১৫৮৫ খ্রিঃ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ। ওই গ্রন্থে সাতগাঁও সরকারের অন্তর্গত 'কলিকাতা' নামে মহাল বা পরগনার কথা আছে।
১৬৩২ খ্রিঃ 'এই সমাধিফলক দানশীল বণিক সুকিয়াস-এর পত্নী রেজা বিবার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' কলকাতার আর্মানি গির্জায় এই সমাধিলিপিটি পাওয়া গেছে। স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এর অভ্রান্ততা স্বীকার করে নেন। এরপর সুতানুটিতে এবং কলকাতায় ইংরেজদের প্রথম বিদেশী বণিক ভাবা ঠিক হবে না।
২৩ ডিসেম্বর, ১৬৮৬ : মুঘলদের তাড়া খেয়ে, চার্নকের প্রথম সুতানুটিতে পদার্পণ।
২৪ অগস্ট, ১৬৯০ : চার্নক তৃতীয়বার সুতানুটি এলেন।
১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ : কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরের জমিদারি সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাত থেকে কম্পানির হাতে চলে এল।
৬ ফেব্রুয়ারি, ১৭০৪ : কলকাতায় পুলিশি-ব্যবস্থার সূত্রপাত।
১২ জুলাই, ১৭৬২ : কম্পানি-বাহাদুর নগর কলিকাতা পত্তন করবেন। চৌরঙ্গি থেকে মারহাট্টা ডিচ অবধি জঙ্গল কাটার নির্দেশ।
১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪ : মনস্বী উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১১ জুলাই, ১৭৮৭ : শিবপুরে একটি রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন গড়ে তুলতে কিডকে আহ্বান।
১১ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৪ : কলকাতার কাঁচা রাস্তাকে পাকা করার জন্য মাননীয় কম্পানি-বাহাদুর সরকারি নির্দেশ দিয়েছেন।
৩ জানুয়ারি, ১৭৯৯ : লর্ড ওয়েলেসলি নিজের হাতে ভবিষ্যতের রাজভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
২ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪ : এশিয়াটিক সোসাইটির অধীনে পুরাতত্ত্বের একটি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। তার নাম 'ক্যালকাটা মিউজিয়াম'।
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৮ : কলকাতা কর্পোরেশন থেকে রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়।
৩১ মার্চ, ১৮২৪ : কলকাতার ৪৭, স্ট্রান্ড রোডে গড়ে ওঠে ভারতের প্রথম টাঁকশাল।
২২ নভেম্বর, ১৮৩০ : আজ কলকাতার প্রথম বাস-সার্ভিস চালু হয়। বাসটিকে এসপ্লানেড থেকে বারাকপুর অবধি টেনে নিয়ে যায় তিনটি ঘোড়া।
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ : কলকাতার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়।
২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪ : কলকাতা স্ট্যাম্প অফিসে জনসাধারণের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু।
৬ জুলাই, ১৮৫৭ : শহরে এই প্রথম গ্যাসবাতি জ্বালানো হয়।
৮ জানুয়ারি, ১৮৬৬ : কলকাতার প্রথম লোকগণনা।
২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ : কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়।
১ জানুয়ারি, ১৮৭৬ : ভারতভ্রমণে এসে সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড আলিপুরে ৪৮ একর জমিতে একটি চিড়িয়াখানা উদ্বোধন করেন।
২৮ জানুয়ারি, ১৮৮২ : কলকাতায় টেলিফোন চালু হয়।
৩০ জানুয়ারি, ১৯০৩ : লর্ড কার্জন মেটকাফ হলে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন। (এটিই আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরি)।
৪ জানুয়ারি, ১৯০৬ : আজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতভ্রমণে এসে ভিক্টোরিয়া সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
১২ ডিসেম্বর, ১৯১২ : ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত।
২৮ ডিসেম্বর, ১৯১৮ : কলকাতায় ভারতের প্রথম বিমান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। টালিগঞ্জ ময়দানে লাটসাহেব, প্রধান বিচারপতি ও এক লক্ষ দর্শকের উপস্থিতিতে ২১ জন যাত্রী নিয়ে দুটি বিমান ৩০০০ ফুট ওঠে ও কিছুক্ষণ ওড়ার পর নীচে নেমে আসে।
২৬ অগস্ট, ১৯২৭ : গভর্নর সার স্ট্যানলি জ্যাকসন ১০, গারস্টিন প্লেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কম্পানি উদ্বোধন করেন।
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৮ : ম্যাডান্‌স এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে (বর্তমান মিনার্ভা সিনেমা) ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মেলোডি অব লাভ' প্রদর্শিত হয়।
৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪ : ইডেনে প্রথম টেস্ট খেলা শুরু। ভারত বনাম ইংল্যান্ড।
১৫ এপ্রিল, ১৯৪০ : ভারতীয় দৈনিক পত্রিকায় এই প্রথম ছোটদের বিভাগ শুরু হল। আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বিভাগের নাম রাখা হয়েছে 'আনন্দমেলা'।
২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ : জনসাধারণের সুবিধার জন্য নবনির্মিত হাওড়া ব্রিজটি খুলে দেওয়া হয়।
৫ জুন, ১৯৫৯ : কলকাতাস্থ জেসপ কম্পানি আজ স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলওয়ে কোচ নির্মাণ করেন।
২ জুলাই, ১৯৬৩ : প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় বিড়লা তারামণ্ডল উদ্বোধন করেছেন।
২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৯ : আজ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির ১৫ ফুট উঁচু, ৮ টন ওজনের একটি ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ : নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম-এর আজ উদ্বোধন করা হয়েছে।
২২ জানুয়ারি, ১৯৭৫ : খেলাধুলোর উন্নতিকল্পে, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হল।
৯ অগস্ট, ১৯৭৫ : কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের উদ্বোধন।
২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪ : কলকাতার সল্ট লেকে নির্মিত হয় এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম।
২৪ অক্টোবর, ১৯৮৪ : কলকাতায় ভারতের প্রথম পাতালরেল চালু হয়।
৩১ অগস্ট, ১৯৮৫ : কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে এশিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ 'নন্দন'-এর উদ্বোধন

সঙ্কলক : গৌতম চক্রবর্তী

ছবি অলক কুমারের সৌজন্যে

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
এই রত্ন আদৌ কোথাও পাওয়া গেলে এই অঞ্চলেই পাওয়া যাবে। আফ্রিকার এই উপকূল জাহাজের কবরখানা।
হ্যাঁ, সম্ভবত নাবিক সিন্দবাদও এখানে ঘোরাফেরা করত। সন্দেহ নেই এখানে আরবি আর পর্তুগিজ জাহাজও মিলবে।
আর ভাগ্যে থাকলে দুঃসাহসিক অভিযানের কিছু অভিজ্ঞতাও হবে।
বোম্বাসায় মিঃ আর্থার বিসলি জলে-ডোবা রত্নের সন্ধানে টরটুগা কখন যাত্রা করবে তা জানতে খুবই আগ্রহী।
টম কিনসায়েডের জাহাজে আছেন প্রোফেসর পোর্টার এবং তাঁর মেয়ে আর জামাই।
জামাইটি সম্পর্কে হুঁশিয়ার, আব্দুল্লা। ও কিন্তু সেই টারজান।
এমনকী, টারজানও আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারবে না, মিঃ বিসলি। ও আপনার বুদ্ধির নাগাল পাবে না।
টরটুগা জাহাজে...
তোমাকে বলিনি? ওই দ্যাখো, কোনও রত্নই ওই খুদে ডুবো জাহাজের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি যদি সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কিছু রত্ন লুকিয়ে রাখতে পারতাম, আর্কিমিডিস!
তোমার দুঃখ বুঝতে পারি, টমাস। কিন্তু কর্তৃপক্ষের হাতে ২৫% তুলে দেওয়া সঙ্গত বলেই মনে হয়।
শুধু খরচ তুলতেই এটা করতাম। আসল পুরস্কার তো রত্ন খুঁজে পাওয়ায়।
টম, এর নাম এসা। তুমি নতুন লশকর চেয়েছিলে, তাই ওকে নিলাম।
কিনসায়েডের ভাসমান পাগলা গারদে কাজটা শক্ত, আমার মেজাজ প্রায়ই খারাপ থাকে, তবে খাবার নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না—সাহস পাবে না।
ক্যাপ্টেন কিনসায়েড
টরটুগার সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় শেষ নাবিকটি চাকরি নিয়ে জাহাজে উঠল। ক্যাপ্টেন জানেন না, তিনি একটি গুপ্তচরকে নিয়েছেন।
1-17

দেশলাই

অরবিন্দ গুহ

বহুকাল বিদেশে থেকে জয়ন্ত সদ্য কলকাতায় ফিরে এসেছে। জয়ন্ত অনেককালের বন্ধু। খবর পেয়েই প্রতুল ছুটে গেল জয়ন্তর ফ্ল্যাটে।

প্রতুলকে দেখে জয়ন্ত তো মহাখুশি। জয়ন্ত বলল, "আমার এই নতুন ঠিকানা তুই এত তাড়াতাড়ি কেমন করে জোগাড় করলি?"

প্রতুল বলল, "প্রাণের টান থাকলে কারও ঠিকানা জোগাড় করা খুব সোজা কাজ।"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলল, "খাঁটি কথা। যাক। কী খাবি বল। চা না কফি?"

"চা।"

জয়ন্ত ভৃত্যকে চা দিতে বলল।

প্রতুল বলল, "বহুকাল তো বিদেশে কাটালি। কেমন কাটালি বল।"

"ভালই কাটালাম। কিন্তু যাই বলিস ভাই, দু-চার দিন কিংবা দু-চার বছরের জন্য বিদেশ ভাল, তারপর আর চলে না। আমার ধারণা, নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ পাকাপাকিভাবে বিদেশে থাকে না। সকলেই স্বদেশে ফিরে আসতে চায়।"

প্রতুল অবাক হয়ে বলল, "বলিস কী রে ? আমি তো শুনি..."

জয়ন্ত থামিয়ে দিয়ে বলল, "বাজে কথা শুনিস। লোকের মুখের গালগপ্প বিশ্বাস করিস না।"

চা এসে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রতুল বলল, "যা হোক, এতকাল বিদেশে কাটালি, তোর মুখে একটু বিদেশের কথা শুনি।"

জয়ন্ত সাদামাটা গলায় বলল, "ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সেসব আমার আসে না। সংক্ষেপে খাঁটি কথা শুনে রাখ, বিদেশের অনেক মজা এখানে নেই ; এখানের অনেক মজা বিদেশে নেই ; বিদেশের অনেক অসুবিধে এখানে নেই ; এখানের অনেক অসুবিধে বিদেশে নেই। একটা বিদেশী সিগারেট খাবি ?"

খুশি হয়ে প্রতুল বলল, "অবশ্যই।"

প্যাকেট থেকে জয়ন্ত একটা বিদেশী সিগারেট বের করে প্রতুলের হাতে দিল। সিগারেট মুখে দিয়ে প্রতুল হাত বাড়াল, "দেশলাই।"

পকেট থেকে জয়ন্ত দেশলাই বের করে প্রতুলের হাতে দিল। দেখেই বোঝা যায় বিদেশী দেশলাই, প্রায় ভর্তি বাক্স। প্রতুলের মন আনন্দে ভরে গেল।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে প্রতুল উঠল।

জয়ন্ত বলল, "খানিকক্ষণ খুব আনন্দে কাটল। আবার আসবি তো ?"

দরজার দিকে যেতে-যেতে প্রতুল বলল, "আমি তো সব জায়গায় যেতেই চাই। কিন্তু আমার দিকে পাঁচজনে এমনভাবে তাকায়, আমাকে দেখলেই পাঁচজনে এমনভাবে সাবধান..."

কথাটা শেষ না করেই প্রতুল চলে গেল।

প্রতুলের কথার মানে বুঝতে পারল না জয়ন্ত। হতভম্ব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

খানিকক্ষণ বাদে শিবনাথ এসে হাজির। শিবনাথ জয়ন্তর যেমন বন্ধু প্রতুলেরও তেমনই বন্ধু। জয়ন্ত তখনও হতভম্ব হয়ে আছে। শান্ত গলায় বলল, "খানিকক্ষণ আগে প্রতুল এসেছিল।"

শুনে চমকে উঠল শিবনাথ, "প্রতুল ? আমাদের প্রতুল ?"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ, প্রতুল, আমাদের প্রতুল।"

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলল, "নির্ঘাত তোর দেশলাই হাতিয়ে নিয়ে গেছে। দ্যাখ, দ্যাখ, ভাল করে দ্যাখ।"

ভাল করে দেখতে হল না। দেশলাইটি উধাও হয়েছে। প্রতুল ছাড়া দেশলাই আর কেউ নিতে পারে না। তবু জয়ন্ত বলল, "সামান্য একটা দেশলাই হাতিয়ে নেওয়ার কথা বলছিস কেন ? হয়তো ভুল করে নিয়েছে। এরকম ভুল তো অনেকেই করে।"

টেবিলে চাপড় মেরে শিবনাথ বলল, "প্রতুলের বিষয়ে কিছুই জানিস না বলে তুই ওর হয়ে সাফাই গাইছিস। তুই তো অনেককাল বিদেশে ছিলি, জানবি কী করে ? কয়েক বছর হল প্রতুলকে দেখলেই সকলে সাবধান হয়ে যায়। আর কিছু না, অন্যের দেশলাই ও হাতাবেই হাতাবে। টাকাকড়ি না, সোনাদানা না, বইপত্তর না, দেশলাই, শুধু দেশলাই—দেশলাই ছাড়া জগতের আর কোনও জিনিসে প্রতুলের টান নেই। দেশলাই প্রতুল নিজের পয়সায় কেনে

না, শুধু অন্যের পকেট থেকে হাতায়।

প্রতুলের বিদায়বেলার কথার মানে জয়ন্ত এখন বুঝতে পারল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক, এমন কিছু নয়।

কিন্তু শিবনাথ কথাটা মেনে নিতে পারল না। বলল, "এমন কিছু নয়? দু'একদিন হলে এমন কিছু নয় কিন্তু প্রতুল এসে যদি দিনের পর দিন তোর দেশলাই হাতিয়ে নিয়ে যায়, কী বিতিকিচ্ছি ব্যাপার, তালে দেখবি পরে তুইই প্রতুল এলে ওর দিকে আড়চোখে তাকাবি, নিজের দেশলাই বিষয়ে দারুণ সাবধান হয়ে যাবি। ফল কী হবে জানিস? প্রতুল মুষড়ে পড়বে।"

জয়ন্ত মিটমিট করে হাসল। বলল, "কিন্তু প্রতুলের এই সামান্য ব্যাপারে তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?"

শিবনাথ আরও রাগ করে বলল, "সামান্য ব্যাপার? আমার কত দেশলাই প্রতুল হাতিয়ে নিয়েছে জানলে তুই আর অমন কথা বলতে পারতিস না। সাধে কি আর রেগে যাচ্ছি?"

জয়ন্ত গলা নামিয়ে বলল, "আসল ব্যাপার কী জানিস? এটা একটা অসুখ, মনের অসুখ। চিকিৎসায় এসব অসুখ সেরে যায়। আমাদের উচিত প্রতুলকে একজন ভাল ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া।"

শিবনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রতুলকে একবার ডাক্তার নন্দীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। এসব অসুখের চিকিৎসায় ডাক্তার নন্দীর খুব নামডাক। অত্যন্ত ভদ্রলোক। অনেকক্ষণ ধরে প্রতুলকে পরীক্ষাটরিক্ষা করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবনাথ বলল, "কিন্তু রাস্তায় এসে প্রতুল বের করল একটা দেশলাই, কোন ফাঁকে ডাক্তার নন্দীর পকেট থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। তারপর থেকে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি। তুই বল, আর কিছু করার আছে?"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলল, "আর কিছু করার নেই।"

চোখের কোলে খাঁজ ফেলে অল্প একটু হাসল শিবনাথ। বলল, "আমাদের শুধু একটাই কাজ করার আছে।"

"কী কাজ?"

"উৎপলকে মনে আছে তোর?"

"আমাদের বন্ধু উৎপল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু উৎপল।"

"মনে থাকবে না কেন, নিশ্চয় মনে আছে।"

টেবিলে চাপড় মেরে শিবনাথ বলল, "উৎপল ছাড়া আমাদের প্রত্যেক বন্ধুর গণ্ডায়-গণ্ডায় দেশলাই প্রতুল হাতিয়ে নিয়েছে। উৎপল দারুণ সাবধানী, আজ পর্যন্ত উৎপলের একটি দেশলাইও প্রতুল হাতিয়ে নিতে পারেনি। এই দুঃখে প্রতুল একেবারে মরমে মরে আছে।"

জয়ন্ত গলা চড়িয়ে বলল, "শাবাশ উৎপল। কিন্তু আমাদের শুধু একটাই কাজ করার আছে বলছিলি, কী কাজ?"

শিবনাথ গম্ভীর গলায় বলল, "আমাদের কাজ হচ্ছে রোজ গিয়ে উৎপলের পায়ের ধুলো নেওয়া।"

সেদিন শুধু জয়ন্তর একটি দেশলাই নয়, আরও আধ ডজন দেশলাই হাতিয়ে বাড়ি ফিরল প্রতুল। গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে সব দেশলাই সযত্নে স্টিলের আলমারিতে সাজিয়ে রাখল। স্টিলের এই আলমারিটি প্রতুলের প্রিয় সম্পত্তি। এখানে প্রতুলের হাতিয়ে-আনা দেশলাই ছাড়া আর কিছু থাকে না। থরে-থরে দেশলাই। রাশি-রাশি দেশলাই। এই আলমারির চাবি প্রতুল কখনও হাতছাড়া করে না।

প্রতুলের বউ মল্লিকার কান বড় সজাগ। খুটখুট শব্দ শুনেই সে এসে ঘরে ঢুকল। রাগ করে বলল, "আজ কতগুলো দেশলাই হাতিয়ে এনেছ?"

প্রতুল ততক্ষণে আলমারি বন্ধ করে ফেলেছে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "দেশলাই বিষয়ে তুমি কিছু জানো?"

মল্লিকা ঝঙ্কার করে বলল, "দেশলাই বিষয়ে আবার জানাজানির কী আছে? ভারী তো দেশলাই। দেশলাইয়ের কথা সকলেই জানে।"

প্রতুল গম্ভীরভাবে বলল, "দেশলাইয়ের কথা সকলেই জানে, না? দেশলাইয়ের কথা এত সোজা, না? তুমি কি জানো, আদিম যুগে মানুষ দু'খণ্ড শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাত, পরে এল চকমকি পাথর, লোহার ঘা মেরে চকমকি পাথর থেকে আগুন জ্বালানো হত? তুমি কি জানো, লোহার বদলে গন্ধক লাগানো কাঠি চকমকিতে ঠুকে আগুন লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন গডফ্রে হাউবাউইৎজ—১৬৮০ সালে?"

মল্লিকা দু' হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, "আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।"

প্রতুল বিচলিত না হয়ে বলল, "কিছুই না জেনে যারা দেশলাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, দেশলাইয়ের কথা শুনে তাদের মাথা মাঝে-মাঝে ঝিমঝিম করা ভাল। শোনো। ১৮০৫ সালে একজন ফরাসি ভদ্রলোক—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—একটা নতুন রকম কাঠি আবিষ্কার করেছেন; কাঠির ডগায় পটাশিয়াম ক্লোরেট, চিনি আর আঠা পুঁটুলির মতো লাগানো হত, দরকারমতো সেই কাঠি সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে আগুন জ্বালানো যেত।

মল্লিকা ততক্ষণে ঝিমিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতুল তা আমলের মধ্যে আনল না। বলে যেতে লাগল যে, তারপর জন ওসাকার নামে একজন বিজ্ঞানী ১৮২৭ সালে আর-একরকম কাঠি বের করলেন, কাঠির ডগায় কী লাগাতেন কে জানে; সে-কাঠি খরখরে জায়গায় ঘষে আগুন জ্বালানো যেত। ১৮৩৩ সালে স্যামুয়েল জোন্স আর একরকম দেশলাই বের করলেন, লুসিফার দেশলাই; বালিকাগজে ঘষলে জ্বলে উঠত বটে, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস বেরোত। এই লুসিফার দেশলাইয়ের গায়ে লেখা থাকত: যাঁদের ফুসফুস দুর্বল তাঁরা যেন কিছুতেই এই দেশলাই ব্যবহার না করেন। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

মল্লিকা করুণ গলায় বলল, "না, ঘুমিয়ে পড়িনি। বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি।"

প্রতুল পরোয়া না করে বলল, "অজ্ঞান আবার হবে কী, অজ্ঞান হয়ে তো আছই। তুমি অজ্ঞান বলেই তো আমি একটানে এত কথা বলে যাচ্ছি। তাও তো বিস্তর বাদসাদ দিয়ে বলছি। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ক্রুয়েগার নামে সুইডেনের একজন সাহেব দেশলাইয়ের ব্যবসায়ে বলতে গেলে পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন; তাঁকে বলা হত—'দেশলাইয়ের রাজা'।"

হাই তুলে তুড়ি দিতে-দিতে মল্লিকা বলল, "তুমি যেভাবে হাতিয়ে দেশলাই জমা করছ তাতে তোমাকেও হয়তো লোকে একদিন 'দেশলাইয়ের রাজা' বলবে। আচ্ছা, দেশলাইতে যেদিন তোমার এই স্টিলের আলমারি ভর্তি হয়ে যাবে সেদিন তুমি কী করবে?"

প্রতুল হাত তুলে মল্লিকাকে আশীর্বাদ করল। বলল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। সেদিন আমি আর-একটা স্টিলের আলমারি কিনব। যাক, সেদিনের কথা সেদিন হবে। আজকাল কী হয় জানো? আজকাল কাঠি আগে অ্যামোনিয়ম ফসফেটে ডুবিয়ে রাখে;

তারপর কাঠি শুকিয়ে নিয়ে ডগায় লাগানো হয় সামান্য গলানো মোম ; তারপর কাঠির ডগায় লাগানো হয় লাল ফসফরাস, ক্লোরেট অব পটাশ, গাম আরাবিয়া ; রেড লেড, সোডিয়াম নাইট্রেট, গঁদ আর খুব মিহি বালি মিশিয়ে খোলের গায়ে লেপে দেওয়া হয়। অনেক দেশে আজকাল কাঠের কাঠির বদলে শক্ত কাগজের কাঠি দিয়ে কাজ চালায়—খরচ অনেক কম পড়ে। আমার এই আলমারিতে কয়েকটা শক্ত কাগজের কাঠির দেশলাই আছে। দেখবে ?"

মল্লিকা হাতজোড় করে বলল, "ওসব মহামূল্যবান জিনিস আমি দেখতে চাই না, আমাকে রেহাই দাও। অনেক রাত হয়েছে, খাবে চলো, ওদিকে ভাত যে জুড়িয়ে জল।"

প্রতুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার শুধু জলের দিকে নজর, আগুনের দিকে মন নেই। সামান্য একটা দেশলাই দিয়ে কত আগুন জ্বালানো যায় হিসেব রাখো ? দেশলাই খুব তুচ্ছ ব্যাপার নয়, একটা দেশলাই মানে অনেক আগুন।"

প্রতুল কিছুতেই থামবে বলে মনে হচ্ছে না কথায় কথা বেড়ে যাবে, অতএব কোনও কথা না বলে মল্লিকা হাত ধরে প্রতুলকে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসিয়ে দিল। খাওয়াটা অন্তত হয়ে যাক।

কিন্তু খাওয়ার দিকে আজ প্রতুলের মন নেই। প্রতুলের মুখে ও মগজে আজ শুধু আগুন। অন্যমনস্কভাবে খেতে-খেতে প্রতুল বলতে লাগল, গ্রিস দেশের পুরাণে আগুন নিয়ে একটা গল্প আছে। প্রমেথিউস শুধু মাটি দিয়ে মানুষ বানালেন। দেবতাদের মতো দেখতে। দেবতাদের যেসব দোষগুণ আছে মানুষদেরও প্রমেথিউস সেসব দোষগুণের মালিক করে দিলেন। মানুষ যেন দেবতার প্রতিনিধি। গ্রিস দেশের পুরাণে দেবতাদের প্রাসাদ ওলিম্পাস, নামে মস্ত পাহাড়ের চূড়ায় এবং দেবতাদের রাজার নাম জিউস। শুনছ ?"

নিরুপায় মল্লিকা বলল, "না শুনে উপায় কী। কান তো আর চোখের মতো বন্ধ করা যায় না।"

মল্লিকার কথা প্রতুলের কানে গেল কি না কে জানে। প্রতুল খেই হারায়নি। খেই তুলে নিয়ে আবার বলতে লাগল, "জিউস দেখলেন প্রমেথিউসের বানানো মানুষ ; কিন্তু মানুষকে জিউস আগুন দিলেন না। প্রমেথিউস জানতেন যে, আগুন ছাড়া মানুষ বাঁচবে না, মানুষ বড় হতে পারবে না। গোপনে তিনি গেলেন ওলিম্পাস পাহাড়ের চূড়ায়, একটি মশাল উঁচু করে ধরলেন সূর্যের দিকে, দাউদাউ করে জ্বলে উঠল মশালটি। গোপনে ও সযত্নে মশাল থেকে আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ নিয়ে এসে তিনি মানুষের হাতে দিলেন। আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গের দৌলতে মানুষের জয়যাত্রা আরম্ভ হল। 'প্রমেথিউস' শব্দটির অর্থ জেনে রাখা ভাল—'সুবিবেচক'।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু হাত-মুখ ধুতে প্রতুল উঠল না, আগে গল্প শেষ হোক, হাত-মুখ পরে ধোওয়া যাবে। "প্রমেথিউস আগুন চুরি করে নিয়ে গেছেন—কথাটা জানতে পারলেন জিউস। তিনি প্রমেথিউসকে শাস্তি দিলেন। ককেশাস পর্বতমালার একটি নিঃসঙ্গ চূড়ায় শক্ত শিকলে বেঁধে রাখা হল প্রমেথিউসকে। প্রত্যহ দিনের বেলা একটা ভয়ঙ্কর শকুন এসে প্রমেথিউসের পেটের মধ্যে নখ ঢুকিয়ে যকৃৎ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে যায় ; রাত্তিরে ক্ষত সারে, যকৃৎ জ্যান্ত ও সবল হয়ে ওঠে, পরদিন আবার ভয়ঙ্কর শকুন আসে, পেটের মধ্যে নখ ঢুকিয়ে যকৃৎ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে যায়। মানুষের জন্য আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ চুরি করে আনার অপরাধে প্রমেথিউস দিনের পর দিন এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।"

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, "একটি স্ফুলিঙ্গের জন্য এত শাস্তি ? এখনও সাবধান হও। আর কারও দেশলাই হাতিয়ে এনো না। না

হলে তোমাকেও হয়তো নরক যন্ত্রণা..."

হাত তুলে মল্লিকাকে থামিয়ে দিয়ে প্রতুল বলল, "আমি এখনই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। কেন জানো ?"

"কেন ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতুল বলল, "অনেক সাধই মিটেছে জীবনে, শুধু একটা সাধই এখনও মিটল না। এখনও উৎপলের একটি দেশলাইও হাতিয়ে আনতে পারলাম না। কথাটা যখনই মনে পড়ে তখনই বড় কষ্ট পাই, মর্মে-মর্মে বুঝতে পারি কাকে বলে নরক যন্ত্রণা।"

"উৎপলের একটি দেশলাইও হাতিয়ে আনতে পারো না কেন ?"

প্রতুল করুণ মুখে বলল, "কী করে পারব ? আমাকে দেখলেই উৎপল দারুণ সতর্ক হয়ে যায়, কিছুতেই ভোলে না যে আমি দেশলাই হাতাই, আমার সামনে কিছুতেই পকেট থেকে নিজের দেশলাই বের করে না, নিজের পকেটে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে।"

"তা হলে উৎপলই জিতে যাবে ?"

মুখ আরও করুণ করে প্রতুল বলল, "দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। সামনের রবিবার দুপুরে উৎপল আর তার বউকে আমাদের

বাড়িতে খেতে বলেছি। মাথায় একটা মতলব এসেছে। দেখি।"

রবিবার দুপুর। উৎপল আর তার বউ এসেছে প্রতুলের বাড়িতে। খাওয়াদাওয়া হল। উৎপল দারুণ সতর্ক।

মিঠে পান মুখে দিল সকলে।

উৎপলকে একটা সিগারেট দিল আর নিজেও একটা সিগারেট মুখে দিল প্রতুল। বলল, "তোর দেশলাইটা দে।"

উৎপল ঘাড় নেড়ে বলল, "উঁহু। তোর সামনে দেশলাই বের করলে তুই নির্ঘাত আমার দেশলাই হাতিয়ে নিবি। তোর দেশলাইটা বের কর।"

প্রতুল আপত্তি করে বলল, "বাঃ, আমি দেশলাই বের করব কোত্থেকে ? আমার সঙ্গে কখনও দেশলাই থাকে নাকি ?"

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে উৎপল বলল, "তা হলে রইল তোর সিগারেট। আমার সিগারেট খাওয়ার দরকার নেই।"

প্রতুল অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "সামান্য একটা দেশলাইয়ের জন্য কেন এমন করছিস ভাই ? একবার তোর দেশলাইটা বের কর, আমি কি খেয়ে ফেলব তোর দেশলাই ?"

উৎপল একেবারে অটল, "কিছুতেই না। তোর সামনে দেশলাই বের করব আমি ? প্রাণ থাকতে নয়। তোর সামনে যদি বের করি তা হলে নির্ঘাত তুই আমার দেশলাই হাতিয়ে নিবি।"

প্রতুল আর সহ্য করতে পারল না। বলল, "সামান্য একটা দেশলাইয়ের ব্যাপারে তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিস না ?"

উৎপল স্পষ্ট গলায় বলল, "না। পারছি না, পারব না।"

প্রতুল গলা চড়িয়ে বলল, "এমন কুটিল লোকের সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। তুই এখনই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।"

উৎপল স্তম্ভিত হয়ে গেল।

প্রতুল তম্বি করে বলল, "তুই এখনও বসে আছিস আমার বাড়িতে ? তোর লজ্জা করে না ? এখনই উঠে পড়। তা না হলে আমার কাজের লোককে ডাকব, সে তোকে গলা ধরে বের করে দেবে।"

মল্লিকা পাথর হয়ে আছে। সামান্য একটা ব্যাপারে কী কাণ্ড। উৎপলের বউ এসে উৎপলের হাত ধরে তুলল। বলল, "চলো। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।"

দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুজনে।

প্রতুল লাফ দিয়ে এসে ডান হাতে উৎপলের গলা ধরল। বলল, "তোর মতো ইতর লোকের সঙ্গে আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। তোর মতো শয়তানের ছায়াও যেন আর কখনও না দেখি।"

উৎপল কোনও কথা না বলে দু' হাত দিয়ে বহুকষ্টে নিজের গলা থেকে প্রতুলের ডান হাত সরিয়ে দিল।

রাস্তায় নেমেই ট্যাকসি। বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল উৎপল।

বউ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ছিঃ, কাঁদে না। অমন লোকের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক না রাখলেই হল।"

উৎপল চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আসল ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে পারছ না।"

"আসল ব্যাপার আবার কী ? নিজের চোখে দেখলাম প্রতুলবাবু তোমাকে অপমান.... "

ঘাড় নেড়ে উৎপল বলল, "অপমান-টপমান কিছু না। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমাকে রাগিয়ে দিয়ে উৎপল আমার পকেট থেকে দেশলাইটি হাতিয়ে নিয়েছে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

আকাশে ওড়ার কথা □ দশ

১৯০০ : জেপেলিন

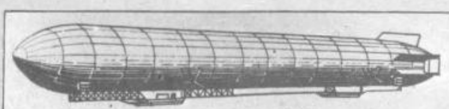

প্রথম জেপেলিন আকাশ-জাহাজ

জার্মানির সামরিক অফিসার কাউন্ট ফার্দিনান্দ ফন জেপেলিন ছিলেন বেলুন-এ উৎসাহী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি পূর্বসূরি গিফার্ডের মতো এয়ারশিপ বা আকাশ-জাহাজ তৈরির চেষ্টা আরম্ভ করলেন। তাঁর সৌভাগ্য, সেই সময়ে মোটরগাড়ির চলন শুরু হয়েছে ও তার এঞ্জিনও পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০০ সালের ২ জুলাই জার্মানির লেক কনস্ট্যান্স থেকে জেপেলিন এক বিরাট আকাশ-জাহাজ নিয়ে আকাশে উঠলেন। জাহাজটি লম্বায় ছিল ৪১৮ ফুট, সেই সময় পর্যন্ত এত বড় আকাশযান আর হয়নি। আকাশ-জাহাজের তলায় ছিল দুটি কেবিন আর দুটি ১৬ অশ্বশক্তির ডেমলার এঞ্জিন, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ মাইল। জেপেলিন নিজেই ছিলেন বৈমানিক, আর সঙ্গে পাঁচজন যাত্রী। তাঁর নাম অনুসারে এই আকাশযানের নামকরণ হল 'জেপেলিন'। কাউন্ট জেপেলিন অনেকগুলি আকাশ-জাহাজ তৈরি করেছিলেন, প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে 'জেপেলিন' থেকে ইংল্যান্ডের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়।

পরের বছর প্যারিতে নিজের আকাশ-জাহাজ নিয়ে আসরে নামলেন ব্রেজিলিয় অ্যালবার্তো স্যান্তোস ডুমন্ত। ফরাসি এরো-ক্লাবের এক সদস্য এক বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করেন, যে বৈমানিক এরো-ক্লাব থেকে উড়ে আইফেল টাওয়ার পরিক্রমা করে আবার এরো-ক্লাবে ফিরে আসবেন, তিনি পাবেন ১৬০০ ডলার। স্যান্তোস ডুমন্ত তাঁর নিজের তৈরি আকাশ-জাহাজে রওনা হলেন, আইফেল টাওয়ার পরিক্রমা করে যখন ফিরছেন, হঠাৎ দড়িদড়া ছিঁড়ে তাঁর আকাশযান গিয়ে পড়ল এক গাছের ওপরে।

তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ফলবতী হল না, এঞ্জিন কাজ না করায় তিনি ধাক্কা খেলেন এক হোটেলের ছাদে। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে।

অবশেষে তৃতীয় চেষ্টায় তিনি সাফল্যলাভ করেন। স্যান্তোস ডুমন্ত অনেক আকাশ-জাহাজ ও বিমান তৈরি করেন। তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত প্যারি শহরের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

যশোর রোডের পাশে

তারাপদ রায়

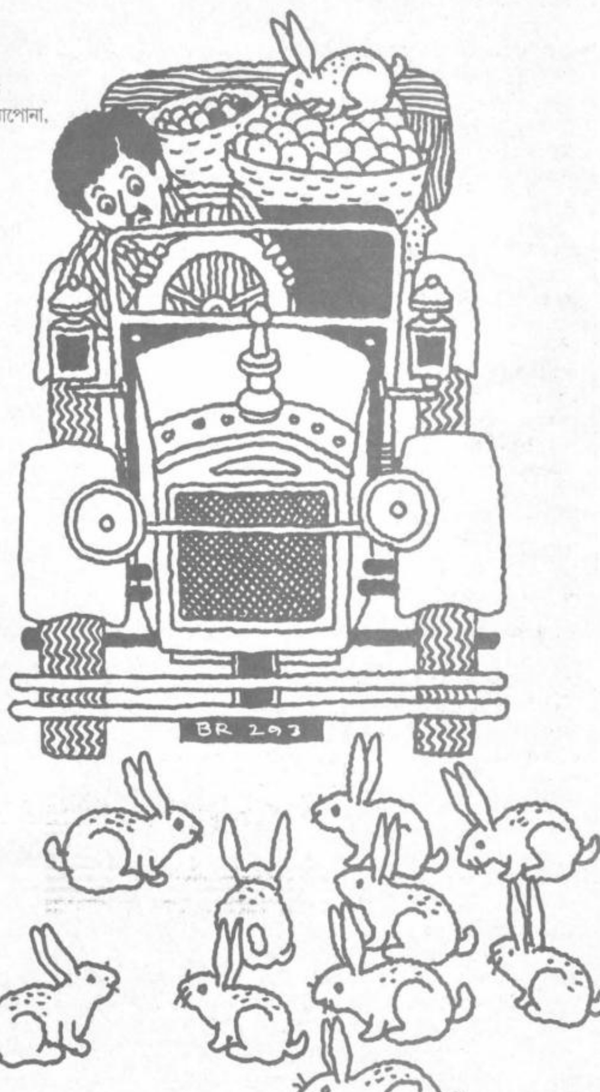

একদিন যশোর রোড ধরে বনগাঁ যেতে যেতে
হারানদা দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা ভুট্টার খেতে
কয়েকটা পাটকিলে রঙের খরগোশ আর তাদের ছানাপোনা,
হারানদাকে মোটরগাড়ি থামাতে দেখে
ভুট্টা খেতের মধ্যে দৌড়ে এঁকে বেঁকে
সব ক'টি পালাল, শুধু একটি পালাল না ।
নীল চোখ, লাল ঠোঁট একটি শিশু-খরগোশ
হারানদা ভাবলেন, 'হয়তো মানবে পোষ
যাই, এটাকে বাড়ি নিয়ে যাই ।'
হারানদা গাড়ি থেকে নামলেন তাই
আলগোছে বোকা বাচ্চাটাকে
তুলে দিলেন ফলের ঝুড়ির ফাঁকে ।
ধুকপুক ধুকপুক ধুকপুক
তখন কাঁপছে খরগোশছানার বুক ।
এদিকে প্রায় হয়ে এসেছে সন্ধ্যা
গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন হারানদা ।
হঠাৎ দেখতে পেলেন গাড়িটার ঠিক সম্মুখে
সেই যে খরগোশগুলো ভুট্টা খেতে গিয়েছিল ঢুকে
তারা সব দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে পথ আটকিয়ে
যেন তারা প্রাণ দিয়ে
বাঁধবে নিঃশব্দ হাঙ্গামা,
সামনের বড় দুটো নিশ্চয়ই বাপ-মা
চোখে ক্রোধ, নাক দিয়ে উষ্ণ ফোঁস-ফোঁস
বাঘের মতন করছে কয়েকটা সামান্য খরগোশ ।
গাড়িটা চালিয়ে দিলে থাকে না ঝামেলা
মরে তো মরুক ওরা খরগোশের এই ছেলেখেলা
মুহূর্তেই শেষ করা যায় ।
কিন্তু সেই যশোর রোডের ধারে সবুজ সন্ধ্যায়
হারানদার কী যে হল, গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায়
ফলের ঝুড়ির সেই খুদে বাচ্চাটাকে
ভুট্টার খেতের বাঁকে
আলগোছে দিলেন ছেড়ে
সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দৌড় মেরে
ব্যস্তসমস্ত খরগোশের দল
নিমেষে উধাও হল, শব্দ উঠল খলবল খলবল ।
হারানদাও স্বস্তি পেয়ে চললেন বনগাঁয়
যশোর রোডের পাশে ঝিঁঝি ডাকে সবুজ সন্ধ্যায় ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঈশ্বর খই লাল বাতাসা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা গোর্বরার জঙ্গলে বসে আছে। এ-জায়গাটায় একটা কবরখানা আছে। এদ্দিকটায় কেউ আসেই না। ভাঙা মিনার, শ্যাওলা-ধরা পাথর, আর বড়-বড় সব কড়ুই গাছের জঙ্গল। লতাপাতায় ঢাকা বনটায় দিনের বেলাতেই কেউ ঢোকে না। গা ছমছম করে।

"কী খুঁজছিস ? আমাকে বল না।"

"আরে মোমবাতিগুলি কোথায়। দেশলাই-এর বাক্স কোথায় রাখলি ?"

"আমি কী জানি ! তুই নিলি না ? ব্যাগটা তো তোর হাতেই ছিল।"

"দাঁড়া !" বলে ইন্দু জঙ্গল ফাঁক করে ছুটতে থাকল। কী দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু সে একা বসে থাকে কী করে। ইন্দু কাছে থাকলে তার কোনও ভয় থাকে না। ইন্দু নেই, তার পক্ষে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকা সম্ভব না। সেও ইন্দুর পিছু-পিছু দৌড় লাগাল।

পেছনে ইন্দু পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাবড়ে গেল। কেউ যদি অনুসরণ করে গোপনে। সে মরিয়া হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল।

"এই ইন্দু ! তুই কোথায় ?"

ইন্দুর ধড়ে প্রাণ এল। বলল, "চলে এলি কেন ? ব্যাগটা পাঁচিলের পাশে। আনতে ভুলে গেছি। আমি এলাম বলে !"

বাচ্চু যাচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

"ঠিক আছে, আয়।"

তখনই বাচ্চু বলল, "জানিস ইন্দু, আমার মাথায় দারুণ একটা ফন্দি খেলছে।"

"ফন্দি ! তোর আবার ফন্দি ! একা বসে থাকতে ভয় পাস—তোকে নিয়ে শেষে না সত্যি কেলেঙ্কারিতে পড়ে যাই।"

"শোনই না।"

"কিছু শোনার সময় নেই। দৌড়া," বলে দু'জনেই ছুটতে থাকল। বাচ্চুও ছাড়বে না। তার এত বড় ফন্দি মাঠে মারা যাবে, হয় না। সে দৌড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। আবার বলছেও, "হাতিটা নদীর চরে ছেড়ে দিয়ে এলে হয় না। তুই চলে যেতে বলবি। ও তো তোর কথা বোঝে। জঙ্গলে চলে গেলে কেউ নাগাল পাবে না।"

"তোর শেষে এই ফন্দি !"

"কেন, খারাপটা কী বল।"

"খারাপটা কিছুই না। খাটাখাটনির তবে এত দরকার কী। তোর মতো গোবরপোরা মাথা আর দুটি দেখিনি।" বলেই দৌড়াতে থাকল।

বাচ্চুর রাগ হয়ে গেল। কিন্তু একা যে দাঁড়িয়ে থাকবে তাও পারছে না ; সুপারির বাগানে ঢুকে গেছে। আর কিছুটা গেলেই পাঁচিল। কিন্তু এত কাছেও নয় যে, ইন্দুকে দেখা যাবে। ইন্দু দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলেও সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। আর এসব কারণেই কী যে রাগ হয়, কেন এভাবে ইন্দুর পাল্লায় পড়ে সে গোল্লায় যাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না। সে দৌড়ে গিয়ে এবারে ইন্দুর ফ্রক টেনে ধরল, "বল ফন্দিটা খারাপ কিসে ?"

"খারাপ হবে কেন। তবে কাজে লাগবে না।"

"কাজে লাগবে না !"

"না, না। বলছি তো না। লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে এলে আবার চলে আসবে পিলখানায়। পিলখানা ছেড়ে সে যাবেই না। তা হলে এত কী বোঝালাম তোকে। সে ইন্দুমতীকে জঙ্গলে পাবে কোথায় বল। সে যাবে কেন, বল ! অভ্যাস দিনের পর দিন পিলখানায় দাঁড়িয়ে থাকা, রাতে তার ইন্দুদিদি আসে, এটা যে কত বড় আকর্ষণ লক্ষ্মীর বুঝবি না।"

বাচ্চু আর কী করে। এখন ইন্দুর সঙ্গে থাকা ছাড়া তার আর যেন কোনও উপায়ও নেই।

ব্যাগটা নিয়ে ফেরার সময় বলল, "আমরা হাতিটাকে নিয়ে তবে জঙ্গলে চলে যাব ! সেটা কতদূর ? ফিরব কবে ?"

ইন্দু গুম হয়ে গেছে, কিছু বলছে না। হাঁটুমুড়ে সে ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করছে। তারপর ড্রামের ভিতর একপাশে ঠেলে ভরে দিল। ড্রামের ভিতর নুয়ে কী দেখল টর্চ জ্বেলে। সে যা-যা নেবে ঠিক করেছে, তার কিছু বাকি থাকল কি না এমন কোনও চিন্তায় মুখ গম্ভীর।

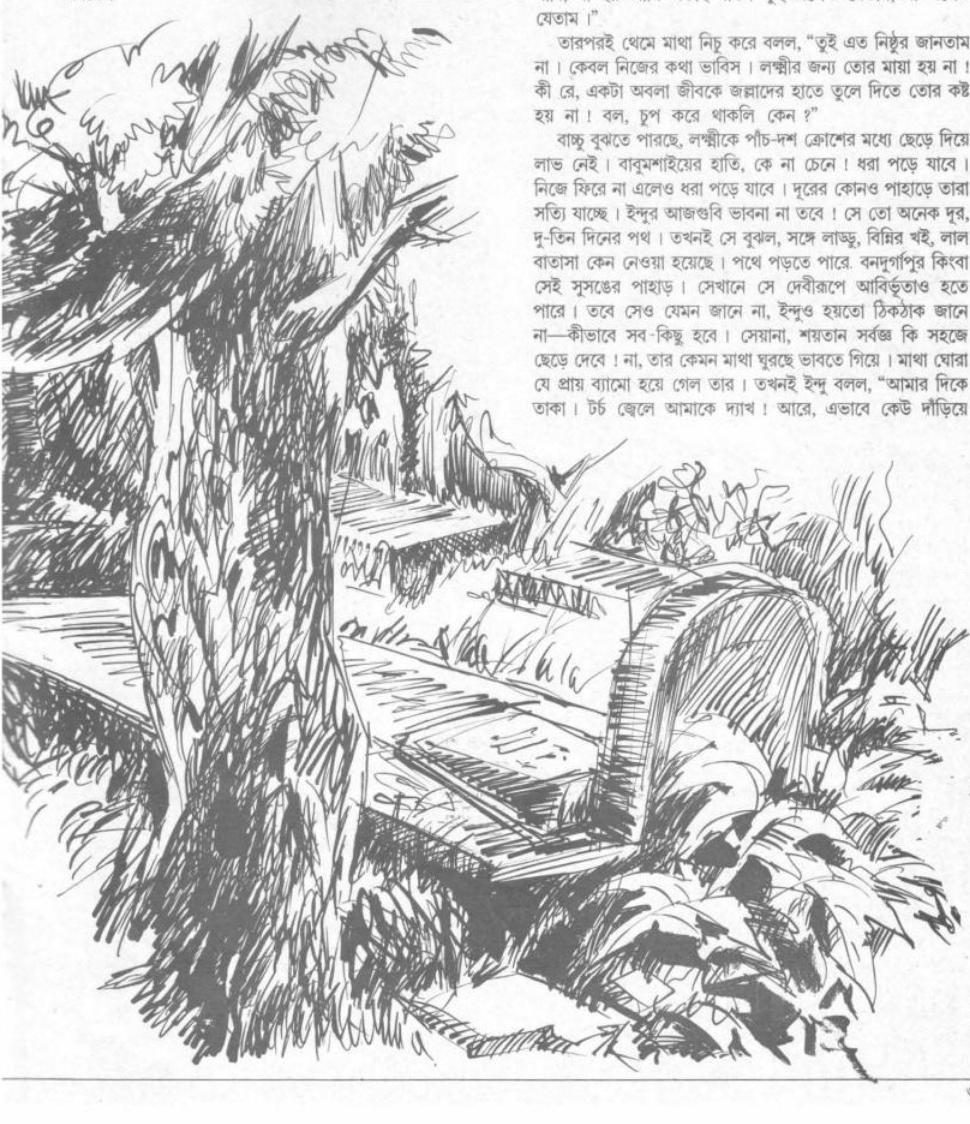

কিন্তু বাচ্চু অধৈর্য হয়ে পড়ছে। সে ফের বলল, "আমরা কবে ফিরব। আমরা কতদূর যাচ্ছি। দেবীদর্শন করাবি সেটা কীভাবে ?"

ইন্দুর কথায় কী ক্ষোভ, "শোন বাচ্চু, তোর বকবকানি আমার ভাল লাগে না। কতবার এক কথা বলব। সব তো বলেছি। ভুলে যাস কেন। কবে ফিরব, না ফিরব কী করে বলব ! আমাকে বিশ্বাস না করলে যেতে হবে না। কবে ফিরব কিচ্ছু বলতে পারব না। যেতে হয় যাবি, না হয় আমি একাই যাব। তুই এলেও যেতাম, না এলেও যেতাম।"

তারপরই থেমে মাথা নিচু করে বলল, "তুই এত নিষ্ঠুর জানতাম না। কেবল নিজের কথা ভাবিস। লক্ষ্মীর জন্য তোর মায়া হয় না ! কী রে, একটা অবলা জীবকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে তোর কষ্ট হয় না ! বল, চুপ করে থাকলি কেন ?"

বাচ্চু বুঝতে পারছে, লক্ষ্মীকে পাঁচ-দশ ক্রোশের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে লাভ নেই। বাবুমশাইয়ের হাতি, কে না চেনে ! ধরা পড়ে যাবে। নিজে ফিরে না এলেও ধরা পড়ে যাবে। দূরের কোনও পাহাড়ে তারা সত্যি যাচ্ছে। ইন্দুর আজগুবি ভাবনা না তবে ! সে তো অনেক দূর, দু-তিন দিনের পথ। তখনই সে বুঝল, সঙ্গে লাড্ডু, বিন্নির খই, লাল বাতাসা কেন নেওয়া হয়েছে। পথে পড়তে পারে বনদুর্গাপুর কিংবা সেই সুসঙের পাহাড়। সেখানে সে দেবীরূপে আবির্ভূতাও হতে পারে। তবে সেও যেমন জানে না, ইন্দুও হয়তো ঠিকঠাক জানে না—কীভাবে সব-কিছু হবে। সেয়ানা, শয়তান সর্বজ্ঞ কি সহজে ছেড়ে দেবে ! না, তার কেমন মাথা ঘুরছে ভাবতে গিয়ে। মাথা ঘোরা যে প্রায় ব্যামো হয়ে গেল তার। তখনই ইন্দু বলল, "আমার দিকে তাকা। টর্চ জ্বেলে আমাকে দ্যাখ ! আরে, এভাবে কেউ দাঁড়িয়ে

থাকে ! উপরে কী দেখছিস ! ডালপালা কারা ঝাপটাচ্ছে ! ভূত না রে ! হনুর উৎপাত । তুই আমার জন্য এটুকু করতে পারবি না, লক্ষ্মীর জন্য !"

বাচ্চু বলল, "যত ভাবছি কূল পাচ্ছি না । তোর মাথা খারাপ, না আমার মাথা খারাপ বুঝছি না । স্বপ্ন দেখছি না তো !"

"আমার মাথা খারাপ । আমার ! আমার ! তুই এ-কথা বলতে পারলি । লক্ষ্মীর জন্য শুধু বলছি, আমার কপালে যা আছে হবে । শুধু লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর কথা ভেবে... ।"

বাচ্চু টর্চ জ্বালতেই অবাক ।

ইন্দুর দু' চোখে জল। ইন্দু হয়তো ভাবছে শেষ মুহূর্তে সে বিগড়ে যাবে ।

তার যেমন কষ্ট সব-কিছু ছেড়ে যেতে, অজানা এই দুঃসাহসিক অভিযানে বের হতে, ইন্দুরও কম ভয় না । সর্বজ্ঞ যদি ইন্দুকে সেই জঙ্গলে সত্যি তুলে নিয়ে যায় । এসব ভাবলেই সে কেমন অন্যরকম ঘোরে পড়ে যায় ।

বাচ্চুর মনে হল, ইন্দু তার পরিচিত গাছপালা, নদী, মাঠ, কাশের বন, সুপারির বাগান ফেলে চলে যাবে বলে বোধ হয় চোখের জল ফেলছে । কিংবা তার আত্মীয়-পরিজন, মা-বাবা, ঝাড়লণ্ঠন, ঠাকুরদালান, যাত্রাগান ফেলে চলে যাবে বলে বোধ হয় নীরবে কাঁদছে ।

বাচ্চু জানেই না বিন্নির খই, লাল বাতাসার আছে অমোঘ এক নিয়তি অথবা নদী কোথায় যায় এমন এক জীবনের রহস্যময়তায় সে ইন্দুর জন্য কষ্ট পাচ্ছে । ইন্দু এতটা পারলে সে ইন্দুর জন্য বাকি কাজটুকু করতে পারবে না ! এবারে সে সত্যি মরিয়া হয়ে উঠল ।

ইন্দু তাকিয়ে আছে তার দিকে ।

বাচ্চু তাকিয়ে আছে ইন্দুর দিকে ।

ইন্দু এবারে ফিক করে হেসে দিল । "শোন বাচ্চু, তুই লক্ষ্মীর পিঠে বসে থাকবি । ঠিক আমার পায়ের কাছে । লক্ষ্মী ছুটবে । অন্ধকার থাকতে পারে, জ্যোৎস্নাও থাকতে পারে । যাই থাক, পায়ের কাছে বসে যখনই বলব, পাঁচ ব্যাটারির টর্চটার ফোকাস আমার শরীরে ফেলতে, ফেলবি ।"

বাচ্চু মাথা চুলকাচ্ছিল ।

"পড়ে যাব না তো হাতির পিঠ থেকে ?"

"না । সামনে বসবি । পাটাতন, জাজিম সঙ্গে দেব ।"

"টর্চের ফোকাস ফেললে কী হবে ?"

"দেখবি দেবী হয়ে গেছি ।"

"যাঃ, হয় নাকি । তোর যে মাথায় কী থাকে !"

"হয় । দেখবি হয় ।"

বাচ্চুর ভিতর বোধনের বাজনা বাজছে । নতুন এক নীল ভূখণ্ড সে দেখতে পায় । সেখানে হাত তুলে তার অপেক্ষায় আছে ইন্দু । সে জলে সাঁতার কাটছে । দিগ্‌ভ্রান্ত । কোলে বাতিঘরের মতো ইন্দু তাকে তীরে ওঠার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে । সে বলল, "কখন আসব ?"

ইন্দু বলল, "যখন এসেছিলি ।"

শেষে 'যখন আসিছ' বলে কি এই ! কার্নিসে কেউ হেঁটে আসছে না । জ্যোৎস্নায় ছায়া ভেসে যাচ্ছে না হলুদের জমিতে । তবে কি তার দেরি হয়ে গেছে ! ইন্দু তাকে ফেলে চলে গেল ! সে ঠিক এ-সময়েই বের হয় । সে এখন ঘরে একা থাকে । বাবা বলেছেন, ভয় পাবে না তো । সে বলেছে, না । ইন্দুর সঙ্গে গভীর রাতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে ভয় থাকার কথাও না । সে রাতে ইন্দুর সঙ্গে থেকে বুঝেছে ভূতটুত বলে কিছু নেই । থাকলে একবার চোখে পড়ত না ! সব চোখের ধন্দ । দাদারা চলে গেছে বিজয়ার দিনই । দাদারা থাকলে সে অসুবিধায় পড়ত । সে ঠিক সময়েই হলুদের জমিতে পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । এখান থেকেই পাঁচিলের উপর দিয়ে তারা হেঁটে যায় । দু-একবার ধরা পড়তে - পড়তে বেঁচে গেছে । রক্ষা—এ-বাড়িতে দুষ্ট আত্মা ভর করেছে। তেনারাই ছাড়া এসব ।

বাচ্চু কী করবে বুঝতে পারছে না । যদি ইন্দু তার দেরি দেখে সুপারির বাগানে গিয়ে বসে থাকে !

সে সুপারির বাগানে ঢুকে গেল ।

না । নেই ।

তবে বড় সুপারির বাগানে কোথাও লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা কঠিন । সে যে কী করে ! ইন্দুকে সে বুঝতে পারে না । সব ঠিকঠাক করে নিজেই এল না ! ছাদের সেই পরি দেখাবার মতো ব্যাপার ! ইন্দু ভাবে কী । তাকে নিয়ে এটা কি ইন্দুর শেষ মজা !

বাচ্চুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে । সে জ্যোৎস্নায় সুপারির জঙ্গলে ছুটছে, আর ডাকছে, বিন্নির খই তুই কোথায় ! বাচ্চুর এখন হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে । ইন্দুর ফাঁদে পা না দিলেই হয় !

ইন্দু আবার তাকে নিয়ে মজা করল । এত ফাজিল মেয়ে । কিন্তু ইন্দুর চোখে তো সে জল দেখেছে । ইন্দু রহস্যময়ী হতে পারে, কিন্তু এত বড় ধোঁকা দেবে কেন ! কাঠের বাক্স, মোমবাতি, ড্রাম, পবনদা'র ঘর থেকে পাটাতন বের করে এনে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা, এক দণ্ড তার কিংবা ইন্দুর নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না, সেই ইন্দু শেষপর্যন্ত আসবে না কী করে হয় ।

কিংবা ইন্দু কি বের হতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে ! মাতির মা টের পেয়ে গেছে, ইন্দু-দিদিমণি পালাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেমন করতে থাকল । ইন্দু ধরা পড়ে গেলে সেও ধরা পড়ে যাবে । ভয়ে বিহ্বলতায় শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছিল । আর এ-সময়ই মনে হল, দিঘির পাড়ে পাতাবাহার গাছগুলোর পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে ! ঠিক বোঝা যায় না । কুয়াশার মতো অস্পষ্ট এক ছায়া । এদিকেই হেঁটে আসছে ।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মতো জ্যোৎস্নার বাহার । কাল লক্ষ্মীপূজা । তিনি কি তবে সেই ! দূর থেকেই ডাকল, "লাল বাতাসা, আয় । দেরি করিস না ।"

ওই তো ইন্দু । ইন্দুই হবে । ইন্দু না হলে লাল বাতাসা বলে ডাকবে কেন !

সে ছুটতে থাকল ।

জমিদার-প্রাসাদের এই পেছনের দিকটায় কোনও লোকালয় নেই । মানুষজনের সাড়া পাওয়ারও কথা না । বিশাল বনের মধ্যে পিলখানা । বাচ্চু দেখল, সেই ছায়ামূর্তি পিলখানার দিকে ছুটে যাচ্ছে । চোখের নিমিষে মিলিয়ে যেতেই সে দৌড়াতে থাকল । ইন্দু পিলখানায় তবে ঢুকে গেছে ।

জ্যোৎস্নার আছে নিজেরই এক মোহ । আর ইন্দুর মতো চঞ্চল বালিকার হাতিদর্শন তাকে কোথায় যে শেষে নিয়ে যাচ্ছে । সে ভিতরে ঢুকলে গাছপালার অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না । এমনকী, হাতিটাকেও না । হাতির গলায় শুধু ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে ।

আর তখনই যেন কে বলছে, "টর্চটা কাঠের বাক্স থেকে বের করে নে ।"

কাছে গেলে সে হাতিটাকে দেখতে পেল । কিন্তু ইন্দু নেই । যেন বনের গভীর অন্তরালে সে লুকিয়ে আছে । তাকে কেউ দেখতে পায় না, সে সবাইকে দেখতে পায় ।

হাতির ওপাশে যদি ইন্দু দাঁড়িয়ে থাকে ।

সে ওপাশে গিয়ে দেখল, নেই । (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ইউ এস ওপেনে কার কেমন সম্ভাবনা

সুব্রত সরকার

স্টেফি গ্রাফ

ম্যাটস ভিলন্ডার

মেলবোর্নে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন স্টেফি গ্রাফ আর ইভান লেন্ডল, প্যারিসে আরানশা স্যাঞ্চেজ আর মাইকেল চ্যাঙ, উইম্বলডনে স্টেফি আর বোরিস বেকার। আগামী সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ১৯৮৯-র চতুর্থ গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হবে। তাতে সিঙ্গল্‌সে কারা জয়ী হতে পারেন ?

মেয়েদের মধ্যে অবশ্যই স্টেফির সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে পুরুষদের প্রথম বাছাই লেন্ডল হলেও, অন্তত আরও চার-পাঁচজন খেলোয়াড়ের জেতার সুযোগ থাকবে। উইম্বলডনে খেলা হয় ঘাসের কোর্টে ; ফ্লাশিং মেডোস-এর হার্ড-কোর্ট সারফেস অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির, তাই সেখানে স্টেফি বা বেকার তাঁদের স্পিড আর পাওয়ারের সুবিধা তেমন বেশি পাবেন না।

গতবছর স্টেফি ছাড়া ইউ এস ওপেনের অপর সিঙ্গল্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপ জেতেন ম্যাটস ভিলন্ডার। তবে এ-বছর তো এই সুইডিশ খেলোয়াড়ের সময় মোটেও ভাল যাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন-এ রমেশ কৃষ্ণন ভিলণ্ডারকে হারান, ফরাসি চ্যাম্পিয়ানশিপে তাঁকে সোভিয়েত খেলোয়াড় আন্দ্রেই চেসনোকভ পরাজিত করেন। উইম্বলডনে ভিলন্ডার কখনওই তেমন ভাল ফল পাননি, তবে এবার কিন্তু ম্যাকেনরোর কাছে হার স্বীকার করা পর্যন্ত ভিলন্ডার বেশ ভালই খেলছিলেন।

মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ানশিপের সময়ে ভিলন্ডার তাঁর শ্রেষ্ঠ ফর্মে ফিরে আসতে পারবেন। গতবছর তিনি ফাইনালে লেণ্ডলকে হারিয়েছিলেন, আর সেটি ছিল লেন্ডলের একটানা সাত নম্বর ইউ এস ওপেন ফাইনাল। লেন্ডল ও ভিলন্ডার দু'জনেরই নিউ ইয়র্কের অদূরে গ্রেনিচ শহরে বাড়ি আছে, তবে তাঁরা কেউই মার্কিন নাগরিক নন। স্বদেশের চ্যাম্পিয়ানশিপ জেতবার যাঁদের সম্ভাবনা আছে তাঁদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সী জন ম্যাকেনরো, আর ১৯ বছরের আন্দ্রে আগাসি অন্যতম। তা ছাড়া আছেন ১৭ বছরের মাইকেল চ্যাঙ। বিশেষজ্ঞরা বলবেন, তাঁর খেলা এখনও 'চ্যাম্পিয়ান' হওয়ার মতো নয়। তবে প্যারিসে তো চ্যাঙই জিতেছিলেন।

আজকাল পুরুষদের খেলার সাধারণ মান এত ভাল যে, কোনও নামী খেলোয়াড়ের সামান্য 'অফ-ডে' হলে মুশকিল। একজন অচেনা খেলোয়াড়ও তাঁকে হারিয়ে দিতে পারেন। আমাদের রমেশ এ-বছর তেমন সাফল পাননি, তবে অতীতে তিনি দু'বার ইউ এস ওপেনে শেষ আটজনের মধ্যে পৌঁছেছিলেন। এবারও হয়তো তিনি একবার ঝলক দেখাতে পারেন।

আগাসির মতো আর্জেন্টিনার অ্যালবার্টো মাঞ্চিনি উইম্বলডন যাননি। তবে ফ্লাশিং মেডোসের কোর্টে দু-একটা 'আপসেট' করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। আর বেকারের উইম্বলডনে যতই বাহাদুরি থাক না কেন, ইউ এস ওপেনে তিনি মাত্র একবার সেমিফাইনাল অবধি যেতে পেরেছেন। এডবার্গের রেকর্ডও একই রকম।

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার মনে হয়েছিল স্টেফিকে তিনি একমাত্র উইম্বলডনের ঘাসেই আটকাতে পারবেন। কিন্তু তা তো হল না। এবারকার ইউ এস ওপেন হয়তো ক্রিস এভার্ট-এর শেষ গ্র্যান্ড প্রতিযোগিতা। তবে ক্রিস বা মার্টিনা যে স্টেফিকে বেকায়দায় ফেলতে পারবেন, মনে হয় না। বরং ফ্লাশিংয়ের হার্ডকোর্টে আরানশা স্যাঞ্চেজের মতো খেলোয়াড় ধৈর্য রেখে স্টেফির কোথায় দুর্বলতা পরীক্ষা করতে পারেন।

আর গ্যাব্রিয়ালা সাবাতিনির কথাও ভুললে চলবে না। গতবছর ফাইনালে তিনি স্টেফির বিরুদ্ধে তিন সেট লড়েছিলেন। এবার তাঁর খেলায় আরও জোর হয়েছে, তা ছাড়া প্যারিস আর উইম্বলডনের ব্যর্থতার পর গ্যাবি নিশ্চয় চাইবেন নিউ ইয়র্কে তার প্রতিকার করতে।

ইউ এস ওপেন শেষ হবার কথা ১০ সেপ্টেম্বর।

আটহাজারি বর্ডার

খুব ভাল সময় যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের। চলতি অ্যাশেজ সিরিজে ইংল্যান্ডকে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছে তাঁর দল। ব্যক্তিগতভাবেও দারুণ সফল তিনি। প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে টানা ৪০টি টেস্টে অধিনায়কত্বের বিশ্ব-রেকর্ড করলেন। এজবাস্টনে তৃতীয় টেস্টে ৭ রান করে 'আট হাজার ক্লাবেও' প্রবেশাধিকার পেলেন। তবে এক বিষয়ে অন্যদের চেয়ে তিনি এগিয়ে। গ্যারি সোবার্স যেখানে আট হাজার রান করতে সময় নিয়েছেন প্রায় কুড়ি বছর (১৯৫৩-৫৪ থেকে ১৯৭৩-৭৪), বয়কট সতেরো বছর (১৯৬৪ থেকে ১৯৮১-৮২), গাওস্কর প্রায় তেরো বছর (১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৩-৮৪) সেখানে বর্ডারি সময় নিলেন মাত্র সাড়ে দশ বছর (১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৮৯)! অভিনন্দন বর্ডারি!

একটি তথ্য

পরিসংখ্যান বেশির ভাগ সময়ই নীরস হয়। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। সেরকম একটি: ১৯৫৫ সালে আমেরিকার টনি ট্রাবার্ট ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস-চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তারপর আবার এ-বছর আমেরিকান হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতলেন মাইকেল চ্যাং। এই দীর্ঘ ৩৪ বছরে যে ক'জন আমেরিকান ফ্রেঞ্চ ওপেনে অংশ নেন এবং হারেন, তাঁদের সংখ্যা ৪৯৪!

এখন ইমরান

পাক-অধিনায়ক ইমরান খান আঠারো বছর ধরে ক্রিকেট খেলে খেলে ক্লান্ত। সামনেই আবার ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ। এখন কী করছেন ইমরান? 'ক্রিকেট লাইফ' নামে একটি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হয়েছেন, বই লেখারও ইচ্ছে আছে। তবে এই মুহূর্তে তাঁর চোখ বিপক্ষের উইকেটের প্রতি

নয়, ক্যামেরার লেন্সে নিবদ্ধ। পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া সিন্ধু নদের ওপর একটি তথ্যচিত্র তুলছেন তিনি। ইমরানকে তা হলে 'অলরাউন্ডার' হিসেবে মানতেই হবে।

বথাম-ভক্ত

প্যাট্রিসিয়া ক্যাসালি থাকেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অ্যাশেজ জিতলেও প্যাট্রিসিয়া কিন্তু ঘোরতর ইংল্যান্ড-সমর্থক। ১৯৭৮ সাল থেকে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের যাবতীয় তথ্য তাঁর নখদর্পণে। তবে ইয়ান বথামের প্রতি তাঁর প্রবল

দুর্বলতা। বথামের তিনি এমনই ভক্ত যে, নিজের গাড়ির নম্বরের জায়গায় 'বথাম' নামটি লাগিয়ে নিয়েছেন। বথামের দুর্দান্ত খেলা এবং উদার চরিত্রই নাকি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আশ্চর্য মেয়ে প্যাট্রিসিয়া!

একেবারেই ছোঁয়া

জুরিখে ফিফার সদর দফতরে গিয়েছিলেন এই সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার রুড গুলিট। বিশ্বকাপের একটি হুবহু নকল কাপ সেখানে রাখা আছে। গুলিট সেটিকে অনেকক্ষণ দেখেন, কিন্তু

কর্মকর্তাদের শত অনুরোধেও একবারও কাপটি হাতে তোলেননি। কাপটি নিয়ে ছবি তুলতেও রাজি হননি। কারণ কী? গুলিটের উত্তর, "এখন কাপ ছুঁলে হয়তো খারাপ ফল হতে পারে। ছোঁয়ার ইচ্ছে আছে একবারই—১৯৯০ সালের ৮ জুলাই, ইতালিতে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর।" বিশ্বকাপ হাতে হল্যান্ড-অধিনায়ক গুলিট—এই ছবিও নিশ্চয় তখন প্রাণভরে তুলতে পারবেন ফোটোগ্রাফাররা!

থমসনের ঘোষণা

সোল ওলিম্পিকে পরাজয়ের পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন ডেকাথলনে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ব্রিটেনের ডালে থমসন। সম্প্রতি মুখ খুলছেন তিনি এবং ত্রিশ বছরের ডালে ঘোষণা করেছেন, "আগামী বার্সিলোনা ওলিম্পিকে আমিই আবার সোনা পেতে চলেছি। আমি আবার ভাগ্যকে জানি, সেজন্যই এ কথা বলছি। এবং সেটা হবে ইতিহাসের সেরা প্রত্যাবর্তন।" ডালের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চই মন দিয়ে কথাগুলি শুনছেন!

দর্শক

নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন অল্ডারম্যান

সমীর চৌধুরী

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিঃশব্দে কাজ করতে ভালবাসেন। কোনওরকম হাঁকডাক পছন্দ করেন না। অত্যন্ত কঠিন কাজটিও তাঁরা নীরবে সম্পন্ন করেন। আর তার জন্য আলাদা কোনও কৃতিত্ব দাবি করেন না, প্রত্যাশা করেন না প্রচারের। এরকমই একজন মানুষ হলেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার টেরি অল্ডারম্যান। তাঁর বলে কাবু হয়েছেন বিশ্বের ডাকসাইটে সব ব্যাটসম্যান। এবারের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে তিনিই তো নায়ক। একাই ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন। আশ্চর্য তাঁর টেস্ট কেরিয়ার। যেসব রেকর্ড তাঁর দখলে, তা তাঁকে বিশ্বের সেরা বোলারদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তবু তাঁকে ঘিরে তেমন প্রচার নেই। নেই কৌতূহলী দর্শকদের ভিড়। অন্যরা যখন নজর কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, তখন নিঃশব্দে নিজের কাজটি করে যান টেরি অল্ডারম্যান।

সম্প্রতি লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডের গ্রাহাম গুচ-এর উইকেটটি নিয়ে অল্ডারম্যান টেস্টে তাঁর ১০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ২২-তম এবং বিশ্বের ৯০-তম বোলার, যিনি এই রেকর্ড করলেন। অস্ট্রেলিয়ার যে ২২ জন বোলার এই '১০০ ক্লাব'-এর সদস্য তাঁদের একজন হলেন সি· টি· বি· টার্নার। একশো বছর আগে এই টার্নার ছিলেন ব্যাটসম্যানদের আতঙ্ক। অসাধারণ এক রেকর্ড আছে তাঁর দখলে। মাত্র ছ'টি টেস্টে তিনি ৫০টি উইকেট পেয়েছিলেন। এর পরের রেকর্ডটি যে দু'জন ফাস্ট বোলার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাঁরাও অস্ট্রেলিয়ান। অল্ডারম্যান এবং রডনি হগ মাত্র আটটি টেস্টে ৫০টি উইকেট নিয়েছেন। ন'টি টেস্টে ৫০টি উইকেট পেয়েছেন এস· এফ· বার্নস, অ্যান্ডি রবার্টস ও কলিন ক্রফ্‌ট। ১০টি টেস্টে ৫০টি উইকেট দখলকারীরা হলেন জর্জ লোমান, ফ্রেড ট্রুম্যান, ইয়ান বথাম, ডেনিস লিলি ও জোয়েল গার্নার।

১৯৮১-তে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই ট্রেন্ট ব্রিজ-এ ন'টি উইকেট পেয়েছিলেন অল্ডারম্যান। দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ৬২ রানে পাঁচটি উইকেট, সেই সিরিজে দখল করেছিলেন মোট ৪২টি উইকেট। টেস্ট-ইতিহাসে এ-পর্যন্ত মাত্র ছ'জন বোলার একটি সিরিজে ৪০টি বা তার বেশি উইকেট দখল করেছেন। এঁদের একজন হলেন অল্ডারম্যান। বাকি পাঁচজন হলেন এস· এফ· বার্নস (ইংল্যান্ড), জিম লেকার (ইংল্যান্ড), ক্ল্যারি গ্রিমো (অস্ট্রেলিয়া), রডনি হগ (অস্ট্রেলিয়া), ও ইমরান খান (পাকিস্তান)। ১৯১৩-'১৪ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওই দেশের মাটিতেই চারটি টেস্টে ৪৯টি উইকেট নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে আছেন বার্নস। ১৯৫৬-য় ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পাঁচটি টেস্টে ইংল্যান্ডের মাটিতে লেকার নিয়েছিলেন ৪৬টি উইকেট। ১৯৩৫-'৩৬ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ওই দেশের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে গ্রিমেট নিয়েছিলেন ৪৪টি উইকেট। অল্ডারম্যানের ৪২টি উইকেটের কথা তো আগেই বলেছি। ১৯৭৮-'৭৯তে অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছ'টি টেস্টে ৪১টি উইকেট নিয়েছেন হগ। আর ১৯৮২-'৮৩-তে পাকিস্তানের মাটিতে ছ'টি টেস্টে ভারতের ৪০টি উইকেট দখল করেন ইমরান খান। অল্ডারম্যান কত বড় বোলার এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

তবে পরিসংখ্যান দিয়ে কোনও খেলোয়াড়ের খেলার গুণগত মান সবসময় বিচার করা যায় না। অল্ডারম্যানের চেয়েও বড় বড় বোলার টেস্ট খেলেছেন। তাঁদের পরিসংখ্যানও কম উজ্জ্বল নয়। তবে দেখা যাচ্ছে, অল্ডারম্যান নিঃশব্দে তাঁদের মাঝখানেই নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। জীবনে পতন ও উত্থানের অভিজ্ঞতাও তাঁর কম হয়নি। প্রথম আবির্ভাবেই যিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর পরবর্তী ১৩টি টেস্টে পেয়েছিলেন মাত্র ২৮টি উইকেট। ১৯৮২-তে পার্থ-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট চলার সময় মাঠেই এক দর্শকের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়। কাঁধের হাড় ভেঙে যায়, সেবার স্ট্রেচারে করে অল্ডারম্যানকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এ ছিল রীতিমত ট্রাজিক ঘটনা।

টেরি অল্ডারম্যান

আবার দু'টি মরসুম পরে, ওই পার্থেই তিনি ফিরে আসেন দারুণ নাটকীয়ভাবে। ১২৮ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেরা ছ'টি উইকেট তিনি দখল করে নেন। সেবার তাঁর বলে আউট হয়েছিলেন গ্রিনিজ, রিচার্ডসন, ভিভ রিচার্ডস, ক্লাইভ লয়েড, জেফ দুজোঁ ও মাইকেল হোল্ডিং।

৪৯ জন ব্যাটসম্যানকে টেস্টে আউট করেছেন অল্ডারম্যান। এঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের ২৬ জন (উইকেট ৬২), ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১১ জন (উইকেট ২৫), নিউজিল্যান্ডের ৫ জন (উইকেট ৮), পাকিস্তানের ৭ জন (উইকেট ১০)। মোট উইকেট সংখ্যা ১০৫। অল্ডারম্যানের বলে সবচেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন জিওফ বয়কট (মোট ছ'বার)। চারবার আউট হয়েছেন গ্রাহাম গুচ, মাইক বিয়ার্লি, মাইক গ্যাটিং, ভিভ রিচার্ডস ও রিচি রিচার্ডসন।

খুব কার্যকর বোলার এই অল্ডারম্যান। খুব জোরে বল করেন না। মাপা লাইন ও লেংথে বল করেন। নিখুঁত সুইং। এটাই স্বাভাবিক! মানুষটির মতো তাঁর বলও শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু তার মধ্যেই আছে চাপা আগুন। প্রতিজ্ঞার আগুনই মনে মনে জ্বালিয়ে রেখেছেন অল্ডারম্যান। না হলে কেউ বড় হয় না। হয় না সফল। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য কয়েক বছর সাসপেন্ড থাকার পর যেভাবে তিনি ফিরে এলেন তাও ইতিহাস হয়ে থাকবে টেস্ট ক্রিকেটার খাতায়।

দুই ক্রিকেটার: সঞ্জয় ও সৌরভ

মানস চক্রবর্তী

রিলায়েন্স কাপ নিয়ে তখন কলকাতা মাতোয়ারা। সি এ বি ক্লাব হাউসে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। ক্লাব হাউস, ইডেন গার্ডেন্স, টিকিট বিক্রি, বাইরের দলগুলির আসা-যাওয়া সব মিলিয়ে সি এ বি কর্তাদের চোখে ঘুম নেই। এরকমই একদিন রাত ন'টার সময় সি এ বি সচিব চণ্ডী গাঙ্গুলিকে ফোন করলাম কোনও নতুন খবর আছে কিনা তা জানার জন্য। বিশ্বকাপ সংক্রান্ত খবরাখবর দেবার পর চণ্ডীবাবু নিজে থেকেই বললেন, "বিশ্বকাপ নিয়েই আপনারা মেতে আছেন। অথচ কালীঘাট মাঠে একটা বাচ্চা ছেলে ২৫২ করল, তার খবরই আপনারা রাখেন না। বিজয় হাজারে ট্রোফিতে সঞ্জয় দাস অসমের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেছে। কাল এই খবরটা একটু দিয়ে দেবেন কিন্তু।" একটা ষোলো বছরের ছেলে ২৫২ করল, খবরটা তো যাবেই। কিন্তু শুধু খবর গেলেই তো হল না, একটা ছবিও দরকার। কিন্তু সঞ্জয় কোথায় থাকে তা তো কেউ জানে না। আবার সচিবকে ফোন। কিন্তু তিনি জানেন না। সি এ বি-তে ফোন করা হল। অনেক খুঁজেপেতে জানা গেল, সঞ্জয় থাকে হাওড়ার কদমতলায়। জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের মিছিল এড়িয়ে সঞ্জয়ের বাড়ি পৌঁছতে রাত দশটা। দেড়দিন ব্যাট করে সঞ্জয় করেছিল ওই রান। তারপর কিপিং করেছে। পরদিন আবার খেলা। সে তখন ঘুমোচ্ছে। ডেকে তুলতে মায়া হল। ওর বাবা-মা বললেন, "তাতে কী হয়েছে? বসুন, ডেকে দিচ্ছি।" সেই দৃশ্যটা ভোলা যাবে না। ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে একটি শ্যামলা, ছিপছিপে, লম্বা চেহারার ছেলে উঠে এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল। আজ প্রায় দু' বছর পরেও কিন্তু সঞ্জয় পাদপ্রদীপের আলোয় রয়েছে। এখন সে অনেক পরিণত। আমাদের সেদিনের নৈশ অভিযান বিফলে যায়নি।

সত্যি কথা বলতে কি, গত দু' বছর ধরে সঞ্জয় যা ব্যাট করছে, ওর ব্যাট থেকে যে হারে রান বেরোচ্ছে, তার সঙ্গে একমাত্র শচীন তেণ্ডুলকরের তুলনা করা চলে। টেস্ট না খেললেও শচীনের খ্যাতি এখন ভারতজোড়া। বিস্ময়-বালকের ছাপও মারা হয়ে গেছে ওর নামের আগে। এবং সঙ্গত কারণেই। এ-ব্যাপারে কিন্তু সঞ্জয়ও পিছিয়ে নেই। প্রায় একই বয়সী ওরা। সঞ্জয় ওপেনার, শচীন মিডল অর্ডার। এবং বয়সভিত্তিক জাতীয় টুর্নামেন্টগুলিতে শচীনের সঙ্গে যখন সঞ্জয়ের মোকাবিলা হয়েছে, তখনই শচীনকে প্রায় টেক্কা দিয়ে গেছে সঞ্জয়। ১৯৮৭-'৮৮র বিজয় হাজারে ট্রোফির কথাই ধরা যাক। কানপুরে খেলা হয়েছিল। তার আগে বিহার, ওড়িশা, অসমের বিরুদ্ধে সঞ্জয় শ-পাঁচেক রান করেছে। সেমিফাইনালে খেলা পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে। শচীনের ১৭৫-এর সাহায্যে পশ্চিমাঞ্চল করল ৪৪৬। পূর্বাঞ্চলের পরাজয় অবধারিত ধরে নেওয়া হল। কিন্তু ম্যাচ জিতল তারা। করল ৩ উইকেটে ৪৪৮। সঞ্জয় নট আউট ১৫০। ফাইনালে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরাঞ্চল। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে পূর্বাঞ্চল করল ৪০০। সঞ্জয় ১০৩। উত্তরাঞ্চল আউট হয়ে গেল ২৬৮ রানে। তাদের ম্যাচে ফিরে আসার চেষ্টায় জল ঢালল সঞ্জয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরি, ১০৫ রান। চ্যাম্পিয়ান হল পূর্বাঞ্চল। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে সঞ্জয় পেল দলীপ সিংজি ট্রোফি ও দু' হাজার টাকা।

এবার কৈলাস ঘাটানির দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরের কথাই ধরা যাক। প্রতি বছরই দেশের প্রতিশ্রুতিমান কিশোরদের নিয়ে রাজস্থানের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঘাটানি গোটা পঁচিশেক ম্যাচ খেলার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৫টি ম্যাচে শচীন যেখানে করেছে ৪২৩, ১৩টি ম্যাচে সেখানে সঞ্জয়ের সংগ্রহ ৫১০ রান। সঞ্জয়ের কিপিং-ও খারাপ হয়নি। শচীন যে অনেক প্রতিভাবান সে নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। বলার কথা এই যে, সঞ্জয়ও দ্রুত উঠে আসছে। অথচ এই সঞ্জয়কেই পাকিস্তানগামী ভারতীয় যুব দলে নেওয়া হয়নি। জাতীয় জুনিয়ার সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান কিন্তু বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রকাশ পোদ্দার। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, ট্রায়াল ম্যাচগুলিতে সঞ্জয় তেমন রান পায়নি। ক্রিকেটে পরিসংখ্যানই যে সবসময় শেষ কথা নয়, তা নিশ্চয়ই জানেন পোদ্দার অ্যান্ড কোং। তবু তাঁরা

শচীন তেণ্ডুলকর, সঞ্জয় দাস ও সৌরভ গাঙ্গুলি

উপেক্ষা করেছেন সঞ্জয়কে।

সঞ্জয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ওর প্রবল রান ক্ষুধা, যা সুনীল গাওস্করের ছিল, যা আছে শচীনের। কাট, ড্রাইভও মন্দ নয়। উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ আছে। টেনিস-বলে ভাল ক্রিকেট খেলার প্রবণতা দেখে ওকে ভর্তি করে দেওয়া হয় এরিয়ান টেন্টে অশোক মুস্তাফির কোচিং ক্যাম্পে। সেখান থেকেই উঠে এসেছে সঞ্জয়। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে কমার্স নিয়ে সে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। ব্যাটসম্যান সঞ্জয় আবার উইকেটকিপারও। দীর্ঘ ইনিংস খেলার পর কিপিং করতে অসুবিধে হয় না? কিংবা অনেকক্ষণ কিপিং করার পর ব্যাটিং করতে? এর উত্তরে সঞ্জয় বলল, "হয় তো। চেষ্টা করছি মানিয়ে নিতে। ফারুক ইঞ্জিনিয়র তো এরকমই ছিলেন। সম্বরণ ব্যানার্জিকেও তো দেখছি।"

সঞ্জয় সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাবাদী অরুণলাল ও সম্বরণ। বহুদিন ধরেই সম্বরণ সঞ্জয়কে রঞ্জি ট্রোফির জন্য বাংলা দলে রাখার কথা বলে আসছেন, যাতে বড়দের খেলার আঁচ পোহাতে পারে। এভাবেই শচীন '৮৭-'৮৮ মরসুমে বোম্বাই দলে থাকার পর '৮৮-'৮৯তে বোম্বাইয়ের হয়ে খেলেছে। কিন্তু এখানে সিনিয়ারদের মধ্যে বেশ ভাল ব্যাটসম্যান থাকায় সঞ্জয় হয়তো সেভাবে সুযোগ পাচ্ছে না। তবে প্রতিভা যার সত্যিই থাকে, তাকে কি চেপে রাখা যায়?

কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার আর-এক প্রমাণ সৌরভ গাঙ্গুলি। সঞ্জয়ের সমবয়সী সৌরভও (দু'জনেই সতেরো) দেশের জুনিয়ার ক্রিকেটে রীতিমত সাড়া-জাগানো নাম। সঞ্জয় গত বছর সি এ বি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছিল। এবার হল সৌরভ। ক্রিকেট সৌরভের রক্তে। বাবা চণ্ডী গাঙ্গুলি ক্লাব-স্তরে দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। দাদা স্নেহাশিস তো বাংলার নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। দাদার মতো সৌরভও ব্যাট করে বাঁ হাতে। বল ডান হাতে। সৌরভ বেশ ভাল অলরাউন্ডার। তবে স্টিভ ও কিংবা মুদাস্সার নজরদের মতো ব্যাটেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। এই তো কৈলাস ঘাটানির টিমের হয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে সৌরভও ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। ১৪টি ম্যাচে সৌরভ করেছে ৫১০ রান, সঙ্গে ১০টা উইকেট। রয়েছে দু'টি সেঞ্চুরি ও তিনটি অর্ধ-শতরান। ওখানেই মাইক ব্রিয়ারলির ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলের বিপক্ষে খেলে সৌরভ। ব্রিয়ারলি ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, এখন শিক্ষক। তিনিও খেলেছিলেন সৌরভদের বিরুদ্ধে। ১০১ রান করে নট আউট ছিল সৌরভ। খেলার পর পুরস্কার বিতরণী সভায় ব্রিয়ারলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সৌরভের, বিশেষ করে তার কভার ড্রাইভের। বলেন, "গত দশ বছরেএত ভাল কভার ড্রাইভ আমি দেখিনি।" প্রসঙ্গত, ১৯৭৯-র ওভালে গাওস্কর যখন ২২১ করেন তখন ব্রিয়ারলি ছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। এবং খুব কাছ থেকে ব্রিয়ারলি দেখেছিলেন গাওস্করকে, যিনি বিখ্যাত তাঁর কভার ড্রাইভের জন্য। দর্শনের ছাত্র ও ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ব্রিয়ারলির কথার গুরুত্ব আছে। সুতরাং তাঁর এই সার্টিফিকেটে মাথা ঘুরে যাবার মতো। মাথা যে ঘোরেনি তা অবশ্য সৌরভের কথাবার্তায় বোঝা গেল। বলল, "ব্রিয়ারলির প্রশংসা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যেমন জুগিয়েছিল ডেনিস লিলির প্রশংসা। ওঁরা দু'জনেই আমাকে মূল্যবান টিপ্সও দিয়েছেন।"

হ্যাঁ। মাদ্রাজে ডেনিস লিলির এম আর এফ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে সৌরভ লিলির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। তার প্রমাণ তো সে মাঠেই দিচ্ছে। পাকিস্তানগামী ভারতীয় দলে সঞ্জয়ের মতো সৌরভেরও জায়গা হয়নি। পরে অবশ্য সৌরভকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বোর্ডের যুগ্ম সচিব নাগরাজ। কিন্তু ভিসা পেতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আর যেতে পারেনি। সৌরভ সাধারণত মিডল অর্ডারে খেলে। মারকুটে মিডল অর্ডার বলতে যা বোঝায়, ও মূলত তাই। সবরকমের মার আছে। আছে খুচরো রান নেওয়ার প্রবণতা। এবং এর জন্যই বারবার রান-আউটের কবলে পড়ে যায় ও। এটা সংশোধন করতে হবে। সৌরভের দাদা স্নেহাশিসের ডাকনাম রাজ। সৌরভের ডাকনাম মহারাজ। এই রাজ ও মহারাজের দিকে তাকিয়ে আছে বাংলার ক্রিকেট। এবং হয়তো নব্বই দশকের ভারতীয় ক্রিকেট।

মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে সঞ্জয়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আই· এফ· এ· অফিসে যখন সই করতে ঢুকছি, সারা শরীর ঘেমে-নেয়ে একাকার। তা হলে আমার একটা বড় স্বপ্ন পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তৃতীয় ডিভিশনের জোড়াবাগান থেকে একেবারে এক লাফে প্রথম ডিভিশনের ইস্টার্ন রেল ! এখন হয়তো প্রথম ডিভিশনে খেলাটা বিরাট কোনও ব্যাপার নয়, কিন্তু তখন, আজ থেকে বাইশ বছর আগে, ১৯৬৭ সালে, বিরাটই ছিল।

কাগজপত্র ভিজিয়ে ফেলে সই করলাম এবং বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, ইস্টার্ন রেলে সই করার সুযোগ পেয়েছি ঠিকই, তার মানে কিন্তু এই নয়, আমি খেলার সুযোগ পেয়ে গেছি। তখন রেল দারুণ টিম—চারদিকে যাঁদের নাম, তাঁরা অনেকেই ইস্টার্ন রেলে। অসীম মৌলিক, প্রবীর মজুমদার, ভবানী রায়, মিরকাশেম আলি, ইউ· এস· লাহিড়ী, কাজল মুখার্জি এবং সর্বোপরি প্রদীপদা তো আছেনই।

সত্যি কথা, এঁদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু এও মনে রাখলাম, সুযোগ যখন পেয়েছি তাকে কাজে লাগাবই। একটা ম্যাচেও যদি নামায় তা হলে সেটাতেই দেখাতে হবে আমার দক্ষতা, যোগ্যতা। সুতরাং যা আমার পক্ষে করা সম্ভব তাই করলাম, বাড়ি ফিরেই ছাদের ঘরে চলে গিয়ে একা-একা বল নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়লাম।

আমি দেখেছি, প্র্যাকটিসের কোনও বিকল্প নেই। আর প্র্যাকটিস করলেই নিজের মনে একটা আলাদা জোর পাওয়া যায়, মনে-মনে বলা যায়, আমি তো তৈরি, দেখা যাক না মাঠে কী হয় ! কয়েকদিন নিজের সাধ্যমতো প্র্যাকটিস করে আমিও নিজেকে তৈরি করলাম। রেল-মাঠে অনুশীলন শুরুর আগেই তাই আমি শারীরিকভাবে তৈরিই ছিলাম, তবে অবশ্যই খেলার স্কিল কিছুই জানতাম না। সেটা অকপটে স্বীকার করতেই হবে।

স্বীকার করতে আমি বাধ্যও, কেননা, যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় এসে পড়লাম তিনিই বোঝালেন, স্কিল কাকে বলে, প্রকৃত ফুটবল খেলা জিনিসটা কী। আমি বাঘাদার কথা বলছি। এই সেদিন চলে গেলেন বাঘাদা। কাজলদা আর পিন্টু (সমরেশ চৌধুরী) বাঘাদার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, আমি সেরকম না। কিন্তু যেটুকু স্নেহ পেয়েছি তাও-বা কম কিসে।

প্রথমদিন প্রথম ডিভিশন ক্লাবে আমার প্র্যাকটিসের কথা এখনও মনে পড়ে।

গৌতম সরকার

মাঝমাঠের লড়াই

ভয়ে-ভয়ে তো এলাম, কোচ তখন বিখ্যাত নিখিল নন্দী, বাঘা খেলোয়াড়দের কথা তো বলেইছি, ছাতা হাতে দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছিলেন স্বয়ং বাঘাদা। নাম শুনেছি আগেই, ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সাধারণ দৌড়, পি·টি· ইত্যাদির পর যখন দল করে খেলা হচ্ছে তখন উনি মাঝে-মাঝে খেলা থামিয়ে দিয়ে খেলোয়াড়দের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিচ্ছিলেন। হঠাৎই আমার উপর দৃষ্টি পড়ল। আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "এই ছ্যামড়া, ঠিক কইরা বল বাড়ানো শ্যাখ।" বলে আমায় বল 'পাসিং' দেখিয়ে দিলেন। পরে শুনেছি, সেদিনই প্র্যাকটিস শেষে প্রদীপদার কাছে আমার প্রশংসা করে বলেছিলেন, "ছেলেটার খেলা আছে। হইবও কিছু, যদি লাইগ্যা থাকে।"

মাঠে আমি কমদিন কাটাইনি, কম লোকও দেখিনি। কিন্তু বাঘাদার মতো খেলা-অন্তপ্রাণ, ফুটবলকে গুলে খাওয়া মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বাঘাদা নিজের জীবনে কতটুকু পেয়েছেন ? অথচ কলকাতার অসংখ্য ফুটবলার যে বাঘাদার কাছে কত কৃতজ্ঞ তার কোনও লেখাজোখা নেই।

যিনি শুধু ফুটবল শেখান তিনি কোচ, কিন্তু বাঘাদা শুধু কোচ ছিলেন না। বাড়িতে যেমন বাবা, মাঠেও তেমনই বাঘাদা। বাবারই মতো। কোনও ফুটবলারের হয়তো খাওয়া হয়নি, বাঘাদা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াতেন। কেউ অসুস্থ, বাঘাদা নিজে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন। আবার প্রয়োজনে শাসনও করতেন। এসব নিজের চোখে দেখেছি। অভিজ্ঞতাও তো আছে আমার। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলেই বলতেন, "এই ছ্যামড়া, খাড়া হইয়া আছস ক্যান, দৌড়া।" যা চাইছেন করতে পারছি না, রেগেমেগে ছাতা নিয়ে তাড়া করলেন আমাকে। সারা মাঠ আমিও ছুটছি, উনিও ছুটছেন। এখন ভাবি, কতখানি ভালবাসা, স্নেহ থাকলে এসব করা যায়।

পরবর্তীকালে যখন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানে খেলছি, তখনও উয়াড়ি ক্লাবে বাঘাদার কাছে গেছি, কী করে আরও ভাল খেলব জানতে চেয়েছি, উনি সস্নেহে বুঝিয়ে দিয়েছেন দোষগুলো। অভয় দিয়েছেন, "চেষ্টা কর, নিশ্চই ভাল খেলবি। ইচ্ছা, চেষ্টা থাকলে কী না হয় রে ?" মনে আলাদা শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছি।

বাঘাদা আজ নেই, একটা কথা বলব, আমাদের আগের খেলোয়াড়রা বাঘাদাকে আরও বেশি দেখেছিলেন, কাছে পেয়েছিলেন, আমরাও কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু এখনকার ফুটবলাররা আর বাঘাদাকে পাবে না—এটা যে কত বড় না-পাওয়া, তা আমরাই বুঝতে পারছি।

লিগের আগেই রেল দল ত্রিচিনাপল্লীতে একটা সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট খেলতে গেল। আমার সৌভাগ্য, আমি সেই দলে সুযোগ পেলাম। সেখানে আমি দুটো ম্যাচ হাফ-টাইমের পর খেলেছিলাম, কেমন খেলেছিলাম বলতে পারব না, তবে মাঠে ঘাবড়ে যাইনি এ-কথাও ঠিক।

ফিরে এসে লিগে সুযোগ পাচ্ছিলাম না, আমি অবশ্য জানতামই এত তাড়াতাড়ি সুযোগ মিলবে না। কিন্তু হঠাৎই একটা সুযোগ চলে এল। বেশ কয়েকজন ফুটবলার ইন্টার রেল খেলতে চলে গেল মরসুমের মাঝামাঝি। আমি সাতটা ম্যাচ খেলেছিলাম। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সেই সাতটা অবশ্য সত্তরটার সমান। সবচেয়ে বড় কথা, আমি প্রদীপদার সঙ্গেও খেলার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

খেলার সুযোগ পেলাম প্রদীপদার সঙ্গে, সুযোগ পেলাম আমার আদর্শ, আমার স্বপ্নের নায়ক কাজল মুখার্জির কাছে আসার। যেদিন থেকে ফুটবল খেলছি, সেদিন থেকেই কেন জানি না কাজলদার খেলা আমার দারুণ লাগত। শুধু খেলা নয়, মানুষটাকেও দূর

থেকে খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হত। কাজলদার হাঁটা চলা, অল্প কথা বলা এসবই আমাকে চুম্বকের মতো টানত।

ইস্টার্ন রেলে আমার অনেক আগেই আমি কাজলদার ভক্ত হয়ে পড়ি। কাজলদার বড় খেলা তো বটেই, অফিস লিগের খেলা থাকলেও আমি দেখতে আসতাম। বললে অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবে না, খেলা শেষে কাজলদা যেখানে যেখানে যেতেন, আমিও পিছনে পিছনে যেতাম। খেলার পর কাজলদা কী করেন, কী বলেন—এইসব জানার জন্য। কাছাকাছি থাকতাম যদি কাজলদা আমার সঙ্গেও দু-একটা কথা বলেন।

রেলে এসে সামনাসামনি পেলাম কাজলদাকে। পেলামই যখন, তখন আর ছাড়ছি না এই ভেবে প্রথম দিনই প্র্যাকটিস শেষে সাহস সঞ্চয় করে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, "আমাকে আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন, কাজলদা।" বড় দাদার মতো স্নেহে কাজলদা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ দেখাব। তুই আর আমি রোজ প্র্যাকটিসের পর আবার আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করব।" আমার আর আনন্দ ধরে না। আমাকে পায় কে। এরপর রোজ এই অনভিজ্ঞ, আনকোরা ছেলেটিকে কাজলদা পুশ, পাঞ্চ শেখাতে লাগলেন, হার্ফ লাইনের খেলোয়াড়দের কীভাবে খেলতে হয় বোঝাতে লাগলেন।

সেই যে কাজলদার স্নেহ, ভালবাসা পেতে শুরু করলাম, আজও তা রয়েছে। দাদা আমরা অনেককেই বলি, কিন্তু সত্যিকারের দাদার মতো আচরণ কতজন করতে জানেন? কাজলদা জানেন। প্রথমদিন থেকে

বাঘা সোম

শুরু করে পরবর্তীকালের নানা ঘটনাতেই তা টের পেয়েছি।

কাজলদার বল-কন্ট্রোল, রিসিভিং ইত্যাদি ছিল দেখার মতো। বল নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারতেন। স্ট্যাটিক স্কিল ছিল অসাধারণ। মাঝমাঠ থেকে সুইং মেশানো পাস যখন বাড়াতেন, তা যেন একদম মাপা থাকত, যাকে লক্ষ্য করে বল পাঠাতেন তার পায়ে গিয়ে সেই বল পড়বেই! আমি ভাল ভাল অনেক হাফ-ব্যাকের খেলা দেখেছি—নরসিয়া, কেম্পিয়া, রামবাহাদুর, প্রশান্ত সিংহ। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আমার মতে এঁদের মধ্যে কাজলদাই সেরা। আমি ভক্ত, মুগ্ধ বলেই এই কথা বলছি না। আমার ফুটবলবোধ থেকেই বলছি।

কাজল মুখার্জি

কাজলদা মানুষ হিসেবে যে কত উঁচু মনের, তা একটা ঘটনা দিয়ে বলছি। ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল আমাকে নিতে চাইল। আমি তখন খিদিরপুরে। বড় দলের 'অফার'-এ বেশ আনন্দিতও। কিন্তু মনে-মনে চুপসে গেলাম। কারণ ইস্টবেঙ্গলে তখন কাজলদা আছেন। অন্য যার সঙ্গেই পারি, কাজলদার সঙ্গে তো আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারব না। সেইসময় কাজলদার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের খুব গোলমাল চলছিল। স্পষ্টবক্তা, স্বাধীনচেতা কাজলদাকে কর্মকর্তাদের অপছন্দ হওয়ারই কথা। আমি বাধ্য হয়ে কাজলদার কাছে গিয়ে বললাম, "আমি কী করব দাদা?" কাজলদা বললেন, "পাগল, তুই কেন আসবি না? তুই যদি খেলিস তোর যোগ্যতাতেই খেলবি। এই সুযোগ হারাস না।"

এখন ক'টা প্লেয়ারের এই বুকের জোর আছে যে এ-কথা বলবে? তার নিজের জায়গায় নতুন ছেলে আসতে চাইলে সরাসরি বলবে, "আসিস না, সুযোগ পাবি না,"...ইত্যাদি।

কতদিন হয়েছে ভাল খেলতে পারছি না, তখনই কাজলদার কাছে ছুটে গিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় ভুল হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে লিগে জঘন্য খেলছি। গেলাম কাজলদার কাছে। কাজলদা বললেন, "শোন, মাঠে ওরকম ভয়ে-ভয়ে নামবি না। যখন নামবি মনে করবি তুই-ই মাঠের সেরা খেলোয়াড়, সেরকম দায়িত্ব নিয়েই খেলতে হবে আজ। আর প্রথম থ্রু-পাসটা বা কাটানোটা ঠিকমতো করবি। তা হলে দেখবি মনে শক্তি পাবি, আর পেলেই তুই ম্যাচ ধরে ফেলবি।" তারপর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "যা, খেল গিয়ে, দেখবি ভাল খেলবিই।" কাজলদার উপদেশ শিরোধার্য করে বাড়ি ফিরেছি এবং এর পর কেন জানি না, সত্যিই নাকি ম্যাচ খারাপ খেলিনি।

খেলা ছাড়ার পর কতদিন হয়েছে, শুধু আমার খেলা দেখার জন্য কাজলদা মাঠে এসেছেন। খেলা শেষে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার দোষ-ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এ বেশ এক মজার ব্যাপার। একসময় আমি কাজলদার খেলা দেখার জন্য মাঠে মাঠে ছুটতাম, আর এখন আমার খেলা দেখার জন্য কাজলদা মাঠে ছুটে আসেন। ভালবাসা, স্নেহের জোর কি একেই বলে? (ক্রমশ)

অনুলিখন: তানাজি সেনগুপ্ত

এশিয়াজয়ী ইয়াসিন

এ যেন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ না করেই গ্র্যাজুয়েট হওয়া। পড়াশোনায় অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু খেলাতে সম্ভব করলেন বোম্বাইয়ের বাইশ বছরের তরুণ ইয়াসিন মার্চেন্ট। ইয়াসিন এখনও ভারত চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি, কিন্তু অবলীলাক্রমে স্নুকারে এশিয়া-চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেলেন। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, তিনিই আবার প্রথম ভারতীয় যিনি এশিয়া-বিজয়ী হলেন। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পথে অবাছাই মার্চেন্ট একে একে হারালেন এক, দুই, তিন নম্বর বাছাইকে। মজার কথা, টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম ম্যাচেই কিন্তু বিশ্রীভাবে হেরে হোঁচট খেয়েছিলেন ইয়াসিন। হারই তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কোয়ার্টার ফাইনালে হারান দ্বিতীয় বাছাই হংকং-এর ফ্র্যাঙ্কি চান ওয়াই মিংকে,

সেমিফাইনালে তৃতীয় বাছাই ভারতের গীত শেঠিকে এবং ফাইনালে তাঁর চেয়ে বয়সে ১৪ বছরের বড়, এক নম্বর খেলোয়াড় তাইল্যান্ডের উদোন খাইমুককে।

ইয়াসিনের কাছে এ জয় এক 'মধুর বিস্ময়'। কেননা যদিও চারবার জাতীয় জুনিয়ার স্নুকার এবং দু'বার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, বড়দের প্রতিযোগিতায় কিন্তু রানার্স আপ হয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে এতদিন। গত বছর সিনিয়ার ন্যাশনাল ফাইনালে হেরেছেন গীত শেঠীর কাছে, এবারে বাংলার রাজু জগতিয়ানির কাছে। সুতরাং জয়ী ইয়াসিন যে একটু বেশি খুশি হবেন তাতে আর সন্দেহ কী!

ছেলেবেলায় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল ইয়াসিনের। স্কুলে পেস বোলিং করতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্নুকার এবং বিলিয়ার্ড তাঁর মন কেড়ে নিল। বাবার উৎসাহও ছিল প্রচণ্ড। গীত শেঠিকে হারালেও ইয়াসিনের প্রিয় খেলোয়াড় গীত-ই। ইয়াসিনের মতে, "গীত ভারতের সেরা খেলোয়াড়, ওঁর ধারে-কাছে পৌঁছতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।" ইয়াসিন শ্রদ্ধা করেন বিশ্ব-জয়ী মাইকেল ফেরিরাকে। এবারের টুর্নামেন্টে প্রথমে হারের পর তাঁকে অভয় দেন ফেরিরাই। ইয়াসিন স্নুকারের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় শিখেছেন ফেরিরার কাছ থেকে।

ইয়াসিনের সাফল্য তিনটি কারণে—প্রবল অনুশীলন, মনোনিবেশ এবং ধৈর্য। ছেলেবেলায় খুব ছটফটে ছিলেন, পরে বড় খেলোয়াড়দের দেখে শেখেন ওই তিনটিতে তুঙ্গে না থাকলে বিজয়ী হওয়া যাবে না। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম কমের ছাত্র ইয়াসিনের এখন লক্ষ্য বিশ্বসেরা হওয়া। আগামী নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে বিশ্ব স্নুকার প্রতিযোগিতায় তা হলে কি আর একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে?

সুজন সেন

দেহসৌষ্ঠব

রক্ত সঞ্চালনের জন্য কোমর ও পিঠের পেশীর ব্যায়াম

'অর্জুন' মলয় রায়

কোমর, পিঠের পেশী ও শরীরের নীচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যথাযথ রক্ত সঞ্চালনের জন্য একটি ব্যায়ামের কথা বলছি। প্রথমে পা দেড়-দু' ফুট ফাঁক করে দাঁড়াও। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে সোজা করে রাখো। এবার শ্বাস নিয়ে এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ডান হাত দিয়ে বাঁ পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করো। এইসঙ্গে বাঁ হাত মাথার ওপর সোজা করে রেখে বাঁ হাতের পাতা দেখার চেষ্টা করো। হাত বা হাঁটু যাতে ভাঁজ না হয়ে যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এবার শ্বাস নিতে নিতে সোজা হয়ে দাঁড়াও, দু' হাত পাশে সোজা করে রাখো। এই একইভাবে বিপরীত দিকে করো। এই ব্যায়াম কয়েক দফায় আট-দশবার করতে হবে।

ব্যায়ামটি অভ্যাস করার সময় নিশ্চয় বুঝতে পারবে, শিরদাঁড়ায় মোচড় পড়ছে। এর ফলে শিরদাঁড়া ছুঁয়ে এবং শিরদাঁড়া থেকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেসব শিরা-উপশিরা চলে গেছে সেগুলোর মাধ্যমে রক্ত সেইসব জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ছে।

এই ব্যায়ামটি আর-একভাবেও করা যায়। তবে এটা অভ্যাস করা শক্ত। তোমরা যারা পারবে, শুধু তারাই এভাবে অভ্যাস করবে। দু' হাত কাঁধের সমান রাখো। শ্বাস নিয়ে এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাঁ হাত দিয়ে ডান পায়ের পাতা ধরতে হবে এবং ডান পায়ের পাতা পাশ দিয়ে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে রাখতে হবে। বাঁ পায়ের পাতা ৬০ ডিগ্রি কোণে রাখো। ডান হাত মাথার ওপর সোজা করে দাও। এভাবে দু-তিন সেকেন্ড থাকার চেষ্টা করো। আবার শ্বাস নিতে নিতে আগের অবস্থায় হাত সোজা করে দাঁড়াও। এভাবে অন্যদিকে করো। এই ব্যায়ামটি কয়েক দফায় আট-দশবার করতে পারলে ভাল। পিঠের পেশী এতে শক্ত হবে।

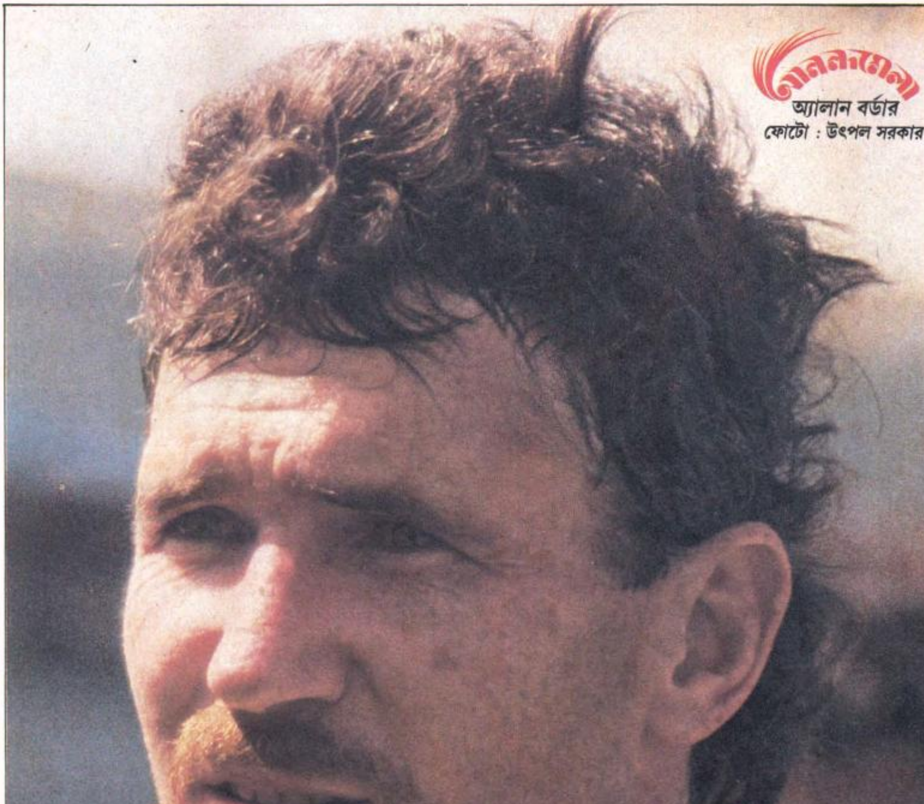
খেলার মেলা
অ্যালান বর্ডার
ফোটো : উৎপল সরকার

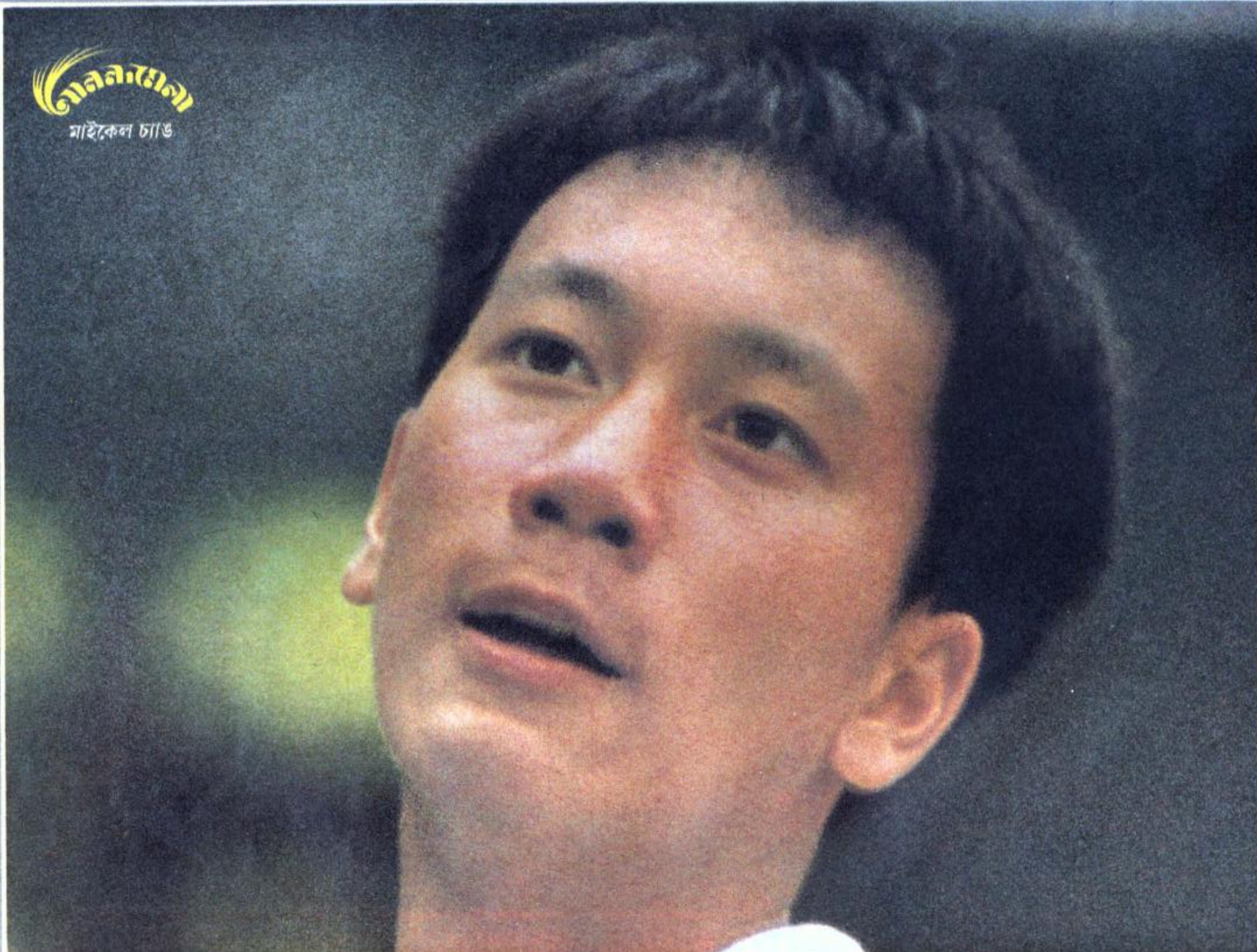
মাইকেল চ্যাঙ

ঘরের পাশে ত্রিপুরা

গোপাল লাহিড়ী

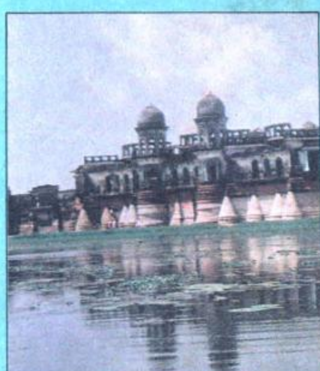

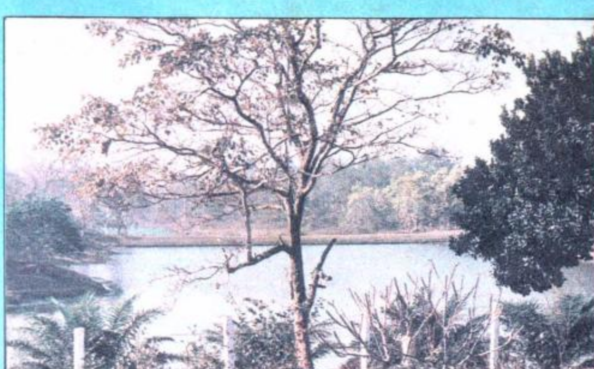

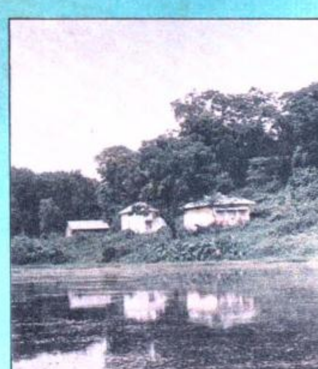

বোয়িং-৭৩৭ যখন দমদম থেকে আকাশে উড়ল, ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ। জানলার ধারেই আমার সিট। ফেব্রুয়ারির শেষ দিক হলেও আকাশ মেঘে-ঢাকা। একটু পরেই হয়তো বৃষ্টি নামতে পারে। প্লেন ক্রমেই মেঘের ওপরে চলে যাচ্ছে। ঝাঁক-ঝাঁক মেঘের জন্য চারপাশ অস্পষ্ট। অনেক নিচুতে বাড়িঘর, মাঠ, গাছপালা, নদীর রেখা মুছে যাচ্ছে। পাশে-বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আগেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছি। উনি বললেন, "আমরা এখন বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি।" বাইরের দিকে তাকালাম। নীচে সব-কিছু মেঘে ঢাকা, ওপরে রোদ-ঝকঝকে নীল আকাশ। এই প্রথম ত্রিপুরা যাচ্ছি। কয়েকদিন ঘুরে বেড়াব। কলেজের বন্ধু সঞ্জয় আগে ত্রিপুরায় থাকত। ওই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ অজানা এক জায়গায় যেতে অদ্ভুত উত্তেজনা হচ্ছে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা আগরতলা পৌঁছে যাব।

ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্যর প্রতিষ্ঠিত দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নাম থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণ হয়েছে—এইরকম ধারণা এতদিন প্রচলিত ছিল। এখন বলা হচ্ছে, এটি সঠিক নয়। আসলে ত্রিপুরা শব্দটি এসেছে ত্রিপুরী ভাষার 'তুই' ও 'প্রা' শব্দ দুটি থেকে। তুই হল 'জল' আর প্রা'র অর্থ নিকটে। বহুকাল আগে এই রাজ্যকে বলা হত 'তুইপ্রা' অর্থাৎ 'জলের ধারে অবস্থিত এক রাজ্য'। শোনা যায়, তখন ত্রিপুরা রাজ্য দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। আর সেকালের রাজাদের আধিপত্য ছিল গারো পাহাড় থেকে আরাকান পর্যন্ত। এই তুইপ্রা ভেঙে হল 'তিপ্রা', তারপর একসময় 'ত্রিপুরা'। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। 'রাজমালা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকে প্রায় একশো পঞ্চাশজন রাজা ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছেন। ত্রিপুরার 'মাণিক্য' বংশ খুবই বিখ্যাত ছিল। মাণিক্য উপাধিটি মহারাজা রত্নাকা পেয়েছিলেন গৌড়ের রাজার কাছ থেকে। এখন জানা গেছে যে, রত্নাকা'র আগেই দুই মাণিক্য রাজা ছিলেন—মহামাণিক্য ও ধর্মমাণিক্য। মহামাণিক্যর রাজত্বকাল থেকেই মাণিক্য বংশের প্রতিপত্তির সূচনা। শেষ হয় এই শতাব্দীর মাঝামাঝি, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে এই প্রতিপত্তির শেষ হয়। ইংরেজরা ত্রিপুরার পুরোপুরি শাসনভার হাতে নেন ১৮৭১ সালে। মাণিক্য বংশের রাজারা তখনও ছিলেন। মাণিক্য বংশের শেষ রাজা

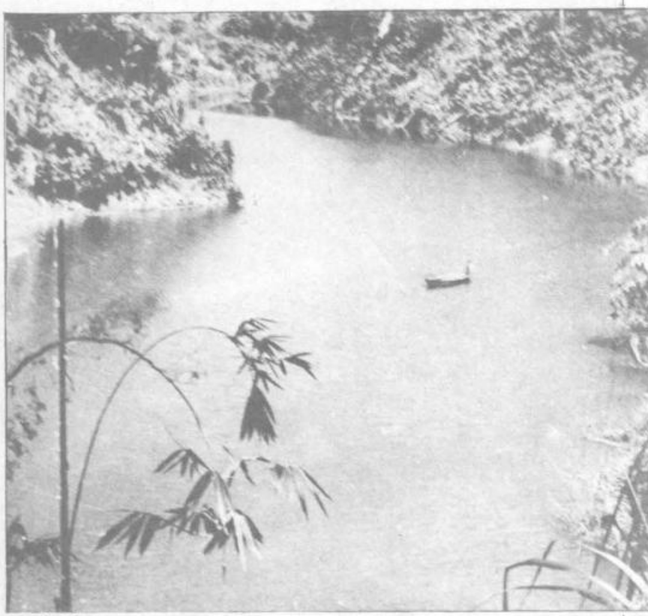

গোমতী নদী

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য মারা যান ১৯৪৭ সালে। তখন তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনপ্রভা দেবী রাজ্যের ভার নেন ও অবশেষে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অনেক দিনের ইচ্ছে পূর্ণ হয়। ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পাকাপাকিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিণত হয় ১৯৭২ সালে।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে অটোরিকশ পেয়ে গেলাম। রাস্তাঘাট ফাঁকাই ; দু'পাশে খোলা মাঠ, ছড়ানো কিছু বাড়ি, অজস্র গাছপালা। অটোরিকশ প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এল সার্কিট হাউসে। মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এখন বিকেলের লালচে আলো। উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে হাঁটতে ভাল লাগছিল। সামনেই কুঞ্জবন প্রাসাদ। ছোট টিলার ওপরে প্রাসাদের চারপাশে সবুজ গাছপালা। সুন্দরভাবে সাজানো ফুলের বাগান, নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। প্রাসাদের পূর্ব প্রান্তে সেই বিখ্যাত গোল বারান্দা। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩২ (১৯২৬) সালের ফাল্গুন মাসে, সপ্তম ও শেষবারের মতো ত্রিপুরায় এসে এই প্রাসাদে ছিলেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবির সম্পর্ক খুবই নিবিড় ছিল। তিনি সেবার ছিলেন রাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের সম্মানিত অতিথি। এই গোল বারান্দায় বসে কবি দেখেছিলেন দু' চোখ ভরে দূরের বড়মুড়া পাহাড়ের সৌন্দর্য। রচনা করেছিলেন 'বৈকালী'র গান।

দুঃখের কথা, এই কুঞ্জবন প্রাসাদ এখন আর সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এটি এখন ত্রিপুরা সরকারের রাজভবন। রাজ্যপালের আবাস। কুঞ্জবন প্রাসাদের লাগোয়া মালঞ্চাবাস। বাগানে ঘেরা আর-একটি সুন্দর বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে এই মালঞ্চাবাসে ছিলেন। তখন অবশ্য কাঁচা বাড়ি ছিল। পাশেই রবীন্দ্রকানন। চমৎকার সাজানো আলো-ঝলমলে একটি উদ্যান। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। পার্কের আলো জ্বলে উঠেছে। পার্কের মাঝখানে সিঁড়ির ওপরে বেদী। রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর মূর্তি আছে এখানে। জায়গায়-জায়গায় বেঞ্চ পাতা। নরম সবুজ ঘাসের ওপরে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে। একপাশে ডলস্ মিউজিয়াম। কাঁচের বাক্সে নানারকম পুতুল সাজানো। দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

পরদিন সকালে ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দফতরের বাসে আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখা হবে। বাস ছাড়ল সকাল আটটায়। সামনেই আগরতলার প্রাণকেন্দ্র বটতলা। বাজারে লোকজনের ভিড়। বটতলা ছাড়িয়ে হাওড়া নদীর ওপরে জহর ব্রিজ। অরুন্ধতীনগর, বড়দোয়ালি, বাদরঘাট, আমতলি—বাস এগিয়ে চলল। একসময় আগরতলা-বিশালগড় রোড ছেড়ে পশ্চিমে কমলাসাগর রোডে পড়ল। আমরা যাব কসবা কালীবাড়িতে। দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ, গাছগাছালি, ঘরবাড়ি, উঁচুনিচু টিলা, ধানজমি পেরিয়ে বাস এক বিশাল দিঘির কাছে এসে থামল। এই হল কমলাসাগর। পুবদিকে একটা রাস্তা টিলার ওপরে চলে গেছে। এখানেই কসবার শ্রীজয়কালীর মন্দির। শোনা যায়, কসবা একসময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। তখন নাম ছিল কৈলাগড়। একটি দুর্গ ছিল এখানে। প্রায় চার-পাঁচশো বছর আগে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কসবাতে মহাদেবী কমলাবতীর ইচ্ছায় একটি দিঘি খনন করেছিলেন। সেই দিঘি হল কমলাসাগর। শ্রীজয়কালীর মন্দির পরে হয়েছে। কিংবদন্তি আছে, মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা থেকে দেবী-মূর্তি এনে এখানে মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

টিলার ওপরে মন্দির। মন্দির-চূড়া সুন্দর কারুকার্যময়। সামনে নাটমণ্ডপ, ঠিক যেন কালীমূর্তি নয়, কালো পাথরের সিংহবাহিনী দশভূজার মূর্তি, পায়ের নীচে শিবলিঙ্গ, মন্দিরের ভেতরে বেশ ভিড়। বিচিত্র পোশাকে এসেছে কয়েকটি চাক্‌মা পরিবার। বাইরে এলাম। একদিকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে কমলাসাগরের ঘাট পর্যন্ত। অনেকেই দিঘির জল মাথায় ছিটোচ্ছেন। দিঘির পাশে সবুজ ধানখেত। পুবদিকে হেঁটে গেলাম। সীমান্তরক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা পাহারা দিচ্ছেন। দূরে রেললাইন। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার কসবা স্টেশন। একটি নীল-সাদা রঙের ট্রেন চলে গেল শব্দ করে। অনতিদূরেই ধানজমিতে ও-দেশের কৃষকরা চাষ করছেন। আর এগনো যাবে না। ফিরে এলাম বাসে। এর পর যাওয়া হবে সিপাহিজলার জঙ্গলে। বিশালগড়ে বাস থামল। চা-জলখাবার খাওয়া হল। সকালের ঠাণ্ডা ভাবটুকু কেটে গেছে। বাস যখন সিপাহিজলা পৌঁছল তখন রোদের তাত যথেষ্ট বেড়েছে। নির্মেঘ আকাশ। ফরেস্ট গেটে প্রবেশপত্র নেওয়া হল। জঙ্গলের মধ্যে আঁকাবাঁকা পথে বাস চলেছে। দু'পাশে উঁচু উঁচু শাল, দেবদারু ও মহুয়ার জঙ্গল। কোথাও জঙ্গল এত গভীর যে, ভাল করে সূর্যের আলো আসছে না। একটা ছোট টিলার সামনে বাস থামল। সবাই নেমে টিলার ওপরে উঠলাম। আশ্চর্য দৃশ্য। নীচেই জলাশয়, গাছপালার মধ্য দিয়ে কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। একদিকে দোতলা রেস্টহাউস। সিঁড়ি উঠে গেছে, টিনের ছাদ। প্যাডেল-বোটে চেপে খানিকক্ষণ জলে ভেসে বেড়ালাম। চারপাশে জঙ্গলের ঘেরাটোপ। আবার বাসে উঠলাম। চিড়িয়াখানা দেখানো হল। এখানে এক ভারী মজার জন্তু আছে। চশমা-বানর। কালচে গা, পেটের কাছটা সাদাটে, কালো চোখের মণির চারপাশে সাদা বর্ডার। ঠিক মনে হয় মানুষের মতো চশমা পরে আছে। ট্যুরিস্ট দেখে কয়েকটি বানর ভয়ে চিৎকার করছে। এই চশমা-বানর একমাত্র এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। চিড়িয়াখানাটি বড়সড়। নানারকম জন্তু আছে এখানে। একপাশে ডিয়ার পার্ক। দল বেঁধে হরিণেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু দূরে পাখিরালয়। অজস্র পাখি সেখানে নিশ্চিন্তে ওড়াউড়ি করছে। বেশ খানিকটা দূরে বটানিকাল গার্ডেন। অজস্র গাছপালা, উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, রং-বেরঙের অর্কিড, গ্রিনহাউস। জঙ্গলের শেষপ্রান্তে ফরেস্ট ট্রেনিং স্কুল। ছোট ছেলেমেয়েরা টয়-ট্রেন চড়ে এল। জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে সবাই ক্লান্ত।

আবার বাসে ওঠা। সবশেষে দেখা হবে নীরমহল। বিশ্রামগঞ্জে নেমে দুপুরের খাওয়া হল, তারপরে সামান্য বিশ্রাম। আবার বাস এগিয়ে চলল হুহু করে। দু'পাশে পাহাড়, জঙ্গল। কোথাও একটু সমতল জমি, কিছু বাড়িঘর, দোকান। কোথাও পাহাড়ি ঝোরার জল বয়ে যাচ্ছে। রুদ্রসাগর পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। আগরতলা থেকে রুদ্রসাগরের দূরত্ব ৫৩ কিলোমিটার। রুদ্রসাগরের ও-প্রান্তে নীরমহল। তিনটি ডিঙি নৌকো ভাড়া করা হল, আকাশে স্তূপের মতো মেঘ জমে আছে, রোদের তেজ কমে গেছে। বসন্তের হাওয়ায় নৌকো দুলে উঠছে। জলে ছোট-ছোট ঢেউ। রুদ্রসাগরে প্রচুর মাছ। জেলেরা বড়-বড় জাল ফেলেছে, অনেকেই গান করছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে নীরমহল যেন জলের মধ্যে ভেসে রয়েছে। রুদ্রসাগর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের গা ঘেঁষে সোনামুড়া। ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর (১৯৩৭-৪৭) মাণিক্য গ্রীষ্মকালে বিশ্রামের জন্য তৈরি করেছিলেন এই জলপ্রাসাদ। নীরমহলে পৌঁছে বোঝা গেল জলপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। তবে এখন সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, পর্যটন বিভাগের ছোট অফিস আছে এখানে। ঘুরে ঘুরে দেখা হল বিভিন্ন মহল। চমৎকার সূক্ষ্ম কারুকাজ, কিন্তু অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। দরবার হল, শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, উদ্যান সবই ভেঙে পড়ছে, দেওয়ালের পলস্তারা খসে পড়ছে। মনখারাপ হয়ে গেল।

সিপাহিজলার রেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। সন্ধে হয়ে গেছে। চৌকিদার জানিয়ে গেল খাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। স্নান সেরে বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, জ্যোৎস্নারাতে জঙ্গলের এমন মায়াময় রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। সিপাহিজলা এখন চাঁদের আলোতে রুপোলি জলা। ঘুম ভেঙে গেল জিপের হর্ন শুনে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাইরে এসে দেখি মুকুন্দ এসে গেছে জিপ নিয়ে। জঙ্গলের ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে লাগছে। চারপাশে হালকা রোদ। চলেছি ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে। একান্নটি পীঠস্থানের মধ্যে এটি একটি। আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। দু'পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝেমধ্যে ছোট বসতি, ঘরবাড়ি। উদয়পুরের উপকণ্ঠে জৈনগড়ের কালো পাথরের সূর্য-মূর্তি দেখে নিলাম। অপূর্ব ভাস্কর্য। কিছু পরেই গোমতী নদী চোখে পড়ল। ত্রিপুরার গোমতী আমাদের গঙ্গার মতো পবিত্র, স্থানীয় লোকেদের ধারণা গোমতী পাতাল-পথে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত। নেতাজি ব্রিজ পার হয়ে বিশাল জগন্নাথ দিঘি, চোখে পড়ল জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

অদূরে মহাদেব দিঘি। পাশেই মহাদেব মন্দির। কারুকার্যময় তোরণদ্বার। ১৬৭২ সালে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। গোমতী নদীর তীরে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যর (১৬৬০-৭৫) প্রাসাদ। এখন অবশ্য ভগ্নপ্রায়, অনতিদূরে ভুবনেশ্বরী মন্দির। মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'রাজর্ষি'তে এই মন্দির যেন অমর হয়ে আছে

উদয়পুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে মাতাবাড়ি। উঁচু টিলার ওপরে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। প্রশস্ত চত্বর, বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম, বাঁ পাশে শিবমন্দির, একপাশে কচ্ছপের সমাধি-বেদী। চওড়া কারুকার্যময় নাটমণ্ডপ। মন্দিরের স্তূপশীর্ষ চারচালা ধরনের, মন্দিরচূড়ায় পতাকাদণ্ড। কালো পাথরের তৈরি অলঙ্কারে ভূষিতা দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। মন্দির-চত্বরে অগণিত ভক্ত। মহারাজা ধন্যমাণিক্য ১৫০১ সালে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের পুবদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। সামনে কল্যাণসাগর। দিঘির জলে

ঘুরে বেড়াচ্ছে শোলমাছ আর বড় বড় কচ্ছপ।

পতিছাড়িতে আমাদের জিপ যখন পৌঁছল, দুপুরের রোদ বেশ চড়া। দু'পাশে রবার বন। উদয়পুর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে এই পতিছাড়িতে বনবিভাগ রবারের চাষ শুরু করে ১৯৬৩ সালে। এখানকার রবারের বৈশিষ্ট্য হল সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত; রবার সংগৃহীত হয় প্রচুর পরিমাণে। এই রবার চাষ এখন ত্রিপুরার উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

এবারে পিলাকের প্রত্নক্ষেত্র দেখতে যাব। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমায় এই সুবিশাল প্রত্নক্ষেত্র অবস্থিত। আগরতলা থেকে দূরত্ব প্রায় ৯৪ কিলোমিটার। প্রাচীনকালে পিলাকের নাম ছিল 'পিলাক পাথার'। পিলাকের ইতিহাস এখনও পুরোপুরি উন্মোচিত নয়। হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের বহু দেবদেবীর মূর্তি এখানে ছড়িয়ে আছে পাহাড়-ঘেরা সমতলভূমির মধ্যে।

পরদিন খুব সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। জোলাইবাড়ি বাজারের পশ্চিমে টিলার ওপরে বাসুদেব বাড়ির বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি দেখলাম। খোলা মাঠে, খেতের মধ্যে অপরূপ সব মূর্তি ছড়িয়ে আছে। শ্যামসুন্দর টিলাটি যেন কোনও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। ৮ম-৯ম শতাব্দীর ভগ্নপ্রায় বোধিসত্ত্বের মূর্তির ভাস্কর্য আজও আমাদের আশ্চর্য করে দেয়।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বেশ বড় মহকুমা অমরপুর। সকালে গেলাম গোমতী নদীর ঘাটে। নৌকোও জোগাড় হল। গোমতী নদী ধরে নৌকো এগিয়ে চলল। গলুইয়ের দেবতামুড়া বড় দুর্গম। উদয়পুর ও অমরপুরের মাঝখানে বড়মুড়া পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্ত হল দেবতামুড়া, ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। অনেকে ছবিমুড়া বলে; প্রকৃতই ছবি দিয়ে মোড়া। পাথরছবি।

ত্রিপুরার আঠারো লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। উনিশটি উপজাতি এখানে আছে। 'তুইমা' হলেন আদিবাসী মানুষের সবচেয়ে পবিত্র দেবতা। ত্রিপুরার মহাতীর্থ 'তীর্থমুখ'-এ যাচ্ছি। গোমতীর উৎস তীর্থমুখে। তীর্থমুখে পৌষ-সংক্রান্তির মেলা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদিবাসী মেলা। অরণ্যময় প্রকৃতির মধ্য দিয়ে জিপ ছুটে চলেছে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল, উঁচু উঁচু টিলা, লালচে মাটি, বনভূমির মধ্যে নির্জন পথ। ত্রিপুরার এত ঘন সবুজ প্রকৃতি আর কোথাও দেখা যাবে না। নতুন বাজারে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার, হালকা রোদ

অরণ্যে বিশ্রামাবাস

উঠেছে। চা-খাবার খেয়ে আবার জিপে ওঠা। যতনবাড়ি থেকে প্রকৃতি যেন আরও মনোরম, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁক বাঁকা রাস্তা। কখনও চড়াই, কখনও উতরাই বেয়ে জিপ চলেছে, জিপ এসে থামল ডম্বুরে। কেউ-কেউ বলেন যে ডম্বুর হল 'সাত তালা' বা 'সাত ডম্বুর'। সাতটি কুণ্ডের জলই সমান পবিত্র এবং সব জায়গাতেই পুজো করা যায়। প্রধান কুণ্ডটি হল 'রানিকুণ্ড'। জলের গভীরতা কম, ওপর থেকে ঝরনার জল নেমে আসে স্রোতের মতো। এই কুণ্ড থেকে গোমতী নদী-রূপ ধারণ করে ক্রমে প্রশস্ত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সামনেই ডম্বুর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। গোমতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এখন প্রাকৃতিক গ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। বড়মুড়া ও রোখিয়াতে টারবাইন বসানো হয়েছে। বাঁ দিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড় কেটে রাস্তা। ডম্বুর লেকের বিরল সৌন্দর্য। জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের এই জলাধারটি প্রায় ৪০ বর্গকিমি জায়গা জুড়ে আছে। দিগন্তজোড়া সবুজের মাঝখানে এক নির্জন লেক। জলের মধ্যে ছোট-ছোট দ্বীপ, নারকেল, লিচু, আনারস ও আপেলের খেতে ভরে আছে দ্বীপগুলো। দূরে পাহাড়, সবুজ বনানী। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয়।

পরদিন আগরতলার সার্কিট হাউসে যখন ফিরে এলাম, বেশ বেলা হয়ে গেছে। তিয়াত্তর মাইল রাস্তা যেন মনে হচ্ছিল অন্তবিহীন পথ। হাতে সময় খুব কম, সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া। খয়েরপুরের বাস ধরে এলাম পুরনো আগরতলায়, পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। হাওড়া নদীর ওপরে ব্রিজ পার হলাম।

আগরতলা খুব বড় শহর নয়। রিকশ করেই ঘুরে দেখা যায় নানা জায়গা। কামান চৌমুহনিতে হুসেন শাহের কামান দেখে গেলাম পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে সরকারি মিউজিয়ামে, পরিচ্ছন্ন মিউজিয়াম। নীচের তলায় মাঝখানের ঘরে ত্রিপুরা গ্যালারিতে পিলাক অঞ্চল থেকে আনা নটরাজ শিবমূর্তিটি নজর কাড়ল। পাশে বেলে পাথরের দুর্গা-মূর্তি।

টাউন হলের পাশেই রাজবাড়ি। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য (১৮৩০-১৮৫০) পুরনো আগরতলা থেকে এখানে উঠে আসেন। তখন অবশ্য অন্য প্রাসাদ ছিল। সেটি ভূমিকম্পের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইজন্য ১৮৯৯-১৯০১ সালে এই নতুন প্রাসাদটি তৈরি হয়। দোতলা প্রাসাদটির তিনটি উঁচু গম্বুজ আছে, মধ্যেরটি ৮৬ ফুট উঁচু। চারপাশে মোগল ধাঁচের বাগান, সামনে দুটি দিঘি, প্রধান অংশটি ৮০০ একর জায়গা জুড়ে আছে। দরবার হল, গ্রন্থাগার, সিংহাসনকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, অতিথিকক্ষ—সবই নানা শিল্পসামগ্রীতে সুসজ্জিত। মাণিক্য বংশের রাজারা ছিলেন শিল্পমনস্ক ও সংস্কৃতিবান। মহারাজা বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য ও বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য—এঁরা সকলেই ছিলেন শিল্পী মানুষ। দোল, ঝুলন, রাসলীলা ও বসন্ত-উৎসবে নিয়মিত সঙ্গীতসভা হত। বীরচন্দ্রের দরবারে ছিলেন তানরাজ যদুভট্ট।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। দিঘির ওপর দিয়ে একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। গোধূলির আলো পড়েছে জলে। রবীন্দ্রভবন দেখে কলেজ টিলায় গেলাম। টিলার ওপরে বীরবিক্রম কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। সাজানো-গোছানো কলেজ টিলা থেকে আগরতলা শহরটা ভারী সুন্দর দেখায়। সন্ধে হয়ে গেছে, রবীন্দ্র সরণি ধরে উত্তরে এগোলাম, সামনে বুদ্ধমন্দির।

সেই ভোরেই এসে গেছে মুকুন্দ। অগত্যা বিছানা ছাড়তেই হল। আজ যাব কৈলাসহরের কাছে উনকোটি পাহাড়ে। জিপ চলেছে অসম আগরতলা রোড ধরে। ত্রিপুরার পুবে-পশ্চিমে বাংলাদেশ। উত্তরে এই হাইওয়ে অসমের সঙ্গে যুক্ত। জিরানিয়া

বাজার, চম্পকনগর হয়ে জিপ বড়মুড়া রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকল। হাওড়া নদীর ওপর ব্রিজ পেরোতেই শুরু হল চড়াই-উতরাই। বড়মুড়া পাহাড় কেটে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দু'পাশে ঘন শালজঙ্গল। পাহাড়ের মাথায় তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের রিগ দেখা যাচ্ছে। ড্রিলিং চলছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান চলছে ত্রিপুরার নানা জায়গায়। বড়মুড়া পাহাড় অতিক্রম করে গাড়ি ডান দিকে দিকে বাঁক নিল। বাঁ দিকের রাস্তা খোয়াই উপত্যকায় চলে গেছে। প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার বর্গকিমি জায়গা জুড়ে ত্রিপুরা রাজ্য। একেবারে পশ্চিম প্রান্তে আগরতলা। পশ্চিম থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে গেলে সারিবদ্ধ ভাবে পাহাড়-উপত্যকা চোখে পড়বে। তেলিয়ামুড়া ছেড়ে কিছুদূর যাওয়ার পর এল চাকমা ঘাট, সামনে বাঁধ তৈরি হচ্ছে; বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।

শুরু হল আথারামুড়া। সবচেয়ে দুর্গম পর্বতমালা। আথারামুড়ার ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জিপ চলেছে। এর পরে লাংতরাই। এখানকার গভীর জঙ্গলে প্রচুর হাতি আছে। মুকুন্দ বলল, মাঝে-মাঝে হাতির পাল এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। চারপাশে শাল, বাঁশ, মহুয়ার জঙ্গল। কুমারঘাটে এসে খাওয়া-দাওয়া করে নিলাম। কর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেললাইন বসানোর কাজ চলছে। ধর্মনগর থেকে ট্রেনে করে অসম হয়ে কলকাতা যাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে আগরতলা অবধি ট্রেন লাইন বসানো হবে।

কুমারঘাট পেরোতেই দেখা গেল টানেল তৈরির কাজ চলছে। আকাশ পরিষ্কার, ঝকঝকে রোদ। জঙ্গলের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা ভাব। হুহু করে জিপ চলছে। রাস্তার কখনও ডানপাশে, কখনও বাঁপাশে রেললাইন পাতা হয়েছে। ট্রেন-চলাচল এখনও শুরু হয়নি। মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে কমলা-হলুদ রঙের বেলেপাথরের টিলা, উঁচু-নিচু জমি, কোথাও উপত্যকায় শস্যের খেত, ধানজমি, গোরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে।

বাঘবাসা থেকে গাড়ি বাঁ দিকে মোড় নিল। ধর্মনগর পৌঁছলাম যখন বেলা প্রায় একটা। ধর্মনগর ছাড়ালেই আবার পাহাড়ি রাস্তার শুরু। উনকোটি পাহাড় আর মাত্র ন-দশ কিলোমিটার দূরে। চড়াই-উতরাই ধরে গাড়ি উঠে যাচ্ছে। মুকুন্দর কোনও ক্লান্তি নেই। দু'পাশে মুলি বাঁশের গভীর জঙ্গল। ত্রিপুরার বাঁশ ও অসমের বেত ভারত-বিখ্যাত। বাঁশের শিল্প আগেই দেখেছি। কোথাও-কোথাও পোড়া জমি, হয়তো জুম চাষ হয়ে গিয়েছে। নিঝুম বনের মধ্য দিয়ে উনকোটিতে এসে পৌঁছলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উনকোটি উপত্যকায় নামতে লাগলাম। ডানপাশের খাড়া পাহাড়ের গায়ে অনুপম ভাস্কর্য। দুটি বিশাল আকারের মূর্তি। শিব ও শিবানীর মগ্নমূর্তি। চারপাশে সবুজ বনানী, উনকোটি পাহাড় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত; উনকোটি ছড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে বয়ে চলেছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে, নুড়ি-পাথর ঠেলে জল এসে পড়ে অষ্টমীকুণ্ডে, তারপর সেই জলধারা উপত্যকা দিয়ে বয়ে যায়, আর কিছুদিন পরেই এই বসন্তকালেই অশোকাষ্টমীর মেলা বসবে। উনকোটি তীর্থে বহু মানুষ আসবে পুণ্য করতে। এই শৈবতীর্থ শুরু হয়েছিল ৮ম-৯ম শতাব্দীতে। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ভাস্কর্য অবাক করে দেয়। অষ্টমীকুণ্ডের সামনে ডানপাশে একটি উঁচু প্রস্তরখণ্ড। শিবমুণ্ড খোদিত। গোলাকার বেদীর ওপরে শিবলিঙ্গ। ডানপাশের পাহাড়ের গায়ে উনকোটিশ্বর শিব খোদিত। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু; মাথার মুকুটটি প্রায় ১০ ফুট দীর্ঘ, কানে চাকার মতো কুণ্ডল। মুকুটের দু'পাশে গঙ্গা ও গৌরী দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে আরও একটি শিবমূর্তি। সেইরকম মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, হাতে মালা। আরও উঁচুতে পাহাড়গাত্রে বীরভদ্রের মূর্তি খোদিত, তাঁর হাতে ধনুক, শর, খড়্গ ও গদা। একটি গোলাকার পাথরে দুটি কিরাত-কিরাতিনীর মূর্তি। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে তিন-চারটে কৃষ্ণমূর্তি, একটি কচ্ছপ, গায়ে তার পদ্মফুলের অলঙ্কার।

উনকোটি ছড়ার তীর ধরে এগিয়ে যাই। বিকেল হতে বেশি দেরি নেই। হাওয়ায় পাতার সরসর শব্দ। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল ছড়ার উপর দিয়ে। ছড়ায় নামলাম। বড় পাথরখণ্ড, নুড়ি পাথরে ভরে আছে ছড়া। দু'পাশে পাহাড়ের দেওয়াল। পাহাড়ের গায়ে অজস্র চিত্র খোদাই করা। উনকোটি, অর্থাৎ কোটির থেকে একটা কম। এইসব দক্ষ কারিগরের কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করে। এই উনকোটিতে না এলে জীবন অসার্থক বলে মনে হয়। উনকোটির গল্পটি মনে পড়ছে—কালু কর্মকারের বড় ইচ্ছে ত্রিপুরাতে নবকাশী প্রতিষ্ঠা করবেন। বিশ্বনাথ শিব তাঁর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, মনু নদীর তীর থেকে কিছু দূরে, পূর্ব দিকে যে শৈলমালা আছে সেখানে একদিন এক রাত্রির মধ্যে এককোটি দেবতার মূর্তি নির্মাণ করলে এখানে নবকাশী প্রতিষ্ঠা হবে। শিল্পীদের নিয়ে কালু প্রায় অসাধ্যসাধন করলেন। রাত শেষ হয়নি তখনও, এক কোটির থেকে একটি কম মূর্তি নির্মিত হয়ে গেছে। কালু কর্মকারের বড় লোভ হল। তিনি নিজের মূর্তি নির্মাণ শুরু করলেন। ভোর হয়ে গেল; মূর্তি নির্মাণ শেষ হল না। এক কোটি দেবতা হল না, হল না নবকাশী, উনকোটি তীর্থ হয়ে রইল। সন্ধে হয়ে আসছে। ধর্মনগরে ফিরে এলাম।

সকালেই রওনা হলাম। এবারে গন্তব্য জম্পুই পাহাড়। কেউ-কেউ বলে ত্রিপুরার সুইজারল্যান্ড। জম্পুই পাহাড় প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। এখানে চিরবসন্ত। চারপাশে শুধু কমলালেবুর বাগান। পাহাড়ের পূর্ব দিকে মিজোরাম রাজ্য। জম্পুই-এ প্রচুর মিজো বাস করেন, পোশাক-পরিচ্ছদে খুবই আধুনিক এঁরা। ছোট-ছোট মিজো ছেলেমেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করছে। পাহাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটতে দারুণ লাগছে। রাস্তার পাশে সাজানো ফুলের বাগান, কোথাও গির্জা, স্কুলবাড়ি, দোকানপাট আর চোখজুড়নো সবুজ গাছপালা। খুব আপসোস হচ্ছে রাত্রিতে থাকতে পারব না। কাল সকালেই ফ্লাইট। আমার ছুটি শেষ। কলকাতা ফিরে যাব। বিকেল হয়ে আসছে। জিপে উঠে পড়লাম। আগরতলা এখান থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে। প্রায় সাত ঘণ্টা লাগবে। কুঞ্জবন সার্কিট হাউসে যখন ফিরে এলাম তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, একটু পরেই আলো ছড়িয়ে যাবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। মুকুন্দ জিপ নিয়ে এসে গেছে। মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, হাতে সময় আছে। চারপাশ একটু ঘুরে নিই। আথাউড়া রোড ধরে এগিয়ে চললাম। এই রাস্তাটি বাংলাদেশে চলে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা বন্ধ। এখানেই ভারতের সীমানা শেষ, সামনে অফিস। কিছু লোক এই সকালেই কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। ও-দেশে যাবে। ওপাড়ে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার আথাউড়া। একটু দূরেই আথাউড়া স্টেশন। একটা গাছের তলায় চুপচাপ বসে রইলাম। রোদ ঝকঝকে সকাল, পাখিরা উড়াউড়ি করছে।

আমাদের প্লেন ছাড়ল ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। বিষণ্ণ লাগছে, ত্রিপুরার পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। মনে পড়ছে কবি ডব্লু. বি. ইয়েটসের সেই কবিতার লাইন: সবুজ গাতায় মুড়ে রেখে যাচ্ছি আমার কান্না।

ফোটো : পার্থ সেন ও পুষ্পেন্দু চৌধুরী

টুপিতে খরগোশ

এই খেলাটা তোমরা খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। প্রথমে ৬×১০ সেন্টিমিটার মাপের একটা শক্ত কাগজ নাও। কাগজটার মাঝখান দিয়ে একটা ভাঁজ করো। এবার কাগজটা খুলে, বাঁ পাশের অংশে আঁকো একটা খরগোশ এবং ডান পাশের অংশে আঁকো একটা টুপি। ছবিতে যেমন দেখানো আছে।

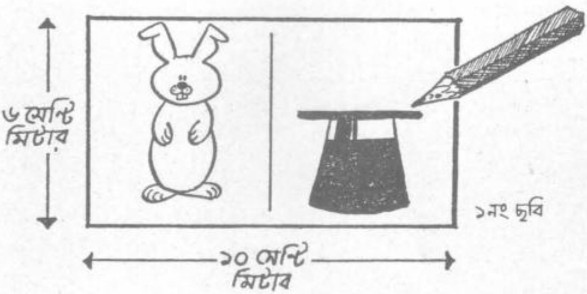

১নং ছবি

একটা বড় মাপের পোড়া দেশলাই কাঠি ছবিতে যেমন দেখানো আছে সেভাবে ভাল কোনও আঠা দিয়ে উলটো পিঠে লাগিয়ে নাও। এবার বাঁ দিকের অংশটা ভাঁজ করে ডান দিকের অংশে ভালভাবে আঠা লাগিয়ে জুড়ে নিতে হবে।

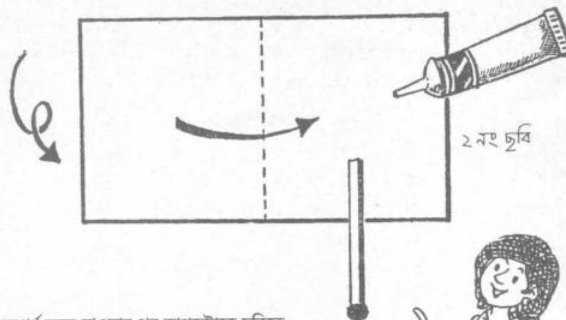

২নং ছবি

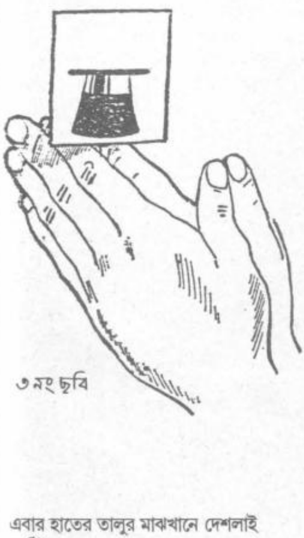

৩নং ছবি

সম্পূর্ণ জুড়ে যাওয়ার পর কাগজটাকে ছবিতে যেমন দেখানো আছে সেইভাবে দু' হাতের আঙুলের মাঝখানে ধরো। টুপির দিকটা নিজের দিকে, অথবা যারা তোমার এই হাতের কাজটা দেখছে তাদের দিকে রাখো।

৪ নং ছবি

এবার হাতের তালুর মাঝখানে দেশলাই কাঠিটা এমনভাবে ঘোরাও যাতে ওপরের কাগজটা পুরোপুরি ঘুরতে পারে। এখানে কাগজটার দিকে লক্ষ করে দ্যাখো, মনে হবে খরগোশরা টুপির মধ্যে বসে আছে।

কবির

এবার এল
সেরা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালফ্যাশনের স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতী
আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর
belle
পালোমা
প্যান্টি
অভিনব, নরম স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর কাপড়
সূক্ষ্মতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।
পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য
এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো— পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।
মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট
এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম।
দাম মাত্র ১৮ টাকা
বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম
বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।
পালোমা স্ট্রাইপস—১৮/-
পালোমা রিবড—১৬/-
পালোমা ডোরি—১২·৫০
যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।
Belle Wears Private Ltd
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48 3708
HTA 3578 R2
belle দেখতে ভালো, পরতে ভালো, মন ভরালো বেল্ Paloma

রানিপুরের রানিকুঠি

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

সন্ধের মুখে আঁধার যখন তার পাতলা চাদর বিছিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই কুমিরডাঙার খালপাড়ে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটাও শালতির দেখা না পেয়ে মনে-মনে বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম আমি।

তারাপদ, মানে আমার সহকর্মী-ডাক্তারবাবুটি এই সুন্দরবন-অঞ্চলেরই লোক। তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত পথনির্দেশ পেয়েছিলাম। পই-পই করে বলে দিয়েছিলেন তারাপদ, ট্রেন থেকে নেমে বেলা থাকলে সোজা চলে যাবেন খালপাড়ে, সেখান থেকে শালতিতে চড়ে রানিপুর। আধঘণ্টার মতো লাগবে।

তবে সন্ধে হয়ে গেলে খবরদার নয়। স্টেশনমাস্টারের ঘরেই ভালয়-ভালয় কাটিয়ে দেবেন রাতটা। সন্ধের পর শালতিতে চড়া নাকি রীতিমত বিপজ্জনক চোর-ডাকাতের ভালই উৎপাত আছে এ-অঞ্চলে। টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়ে পেটে ছুরি মেরে জলে ফেলে দেবে।

সন্ধের পর এমনিতেই শালতিচালকের সংখ্যা কমে যায়। অল্প যে ক'জন থাকে, তাদের দেখে চেনার উপায় নেই কে আসল চালক আর কে খুনি। তাই সন্ধের পর খালপাড়ে যাওয়া বিপজ্জনকই বটে।

তখন খুব-একটা গুরুত্ব দিইনি তারাপদর কথার। এখন বুঝতে পারছি খুব ভুল করেছি। তা এখন শালতি পাই কোথায় ? ফিরে যাওয়াও আর সম্ভবপর নয়। ফিরে যেতে হলে পায়ে-হাঁটা পথ ধরতে হবে। সেও তো বিপজ্জনক পথ। তার ধারে-ধারে জঙ্গলে যে হিংস্র ডাকাত কিংবা খুনে থাকবে না তা কে বলতে পারে ? তা ছাড়া সেই পথ চিনে ফিরতে পারব কি না তারও ঠিক নেই। তাই আমার অবস্থা এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

রানিপুরে খবর দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ আমি যাব, হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। জানি না শেষ অবধি পৌঁছতে পারব কি না।

বর্ষা সবে শুরু হয়েছে। এদিকটায় তার প্রকোপ আবার বেশ বেশি। যদি বৃষ্টি শুরু হয়, তা হলে আমার অবস্থা হবে একেবারে শোচনীয়। কেন যে সন্ধে হয়ে যাবে জেনেও খালপাড়ে এলাম ! বিপদের সময় এমনিই হয়তো বুদ্ধিনাশ হয়।

অগত্যা কী আর করা, ডাক্তারি-ব্যাগ আর সুটকেস পাশে রেখে আমার পাশে দাঁড়ানো বিশাল বটগাছটার তলায় বসে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম যদি কোনও উপায় হয়। অন্ধকার নেমে আসছে, ব্যবস্থা তো একটা-কিছু করতেই হয়। কিন্তু কী করব সেটা আর মাথায় ঢুকছে না।

খালপাড়ে দু-একটা শালতি নাকি যাতায়াত করে সন্ধের পর। গোলপাতা আর গরান কাঠের বোঝা নিয়ে। তাদের দেখা পেলেও মন্দ হয় না,পাটিয়ে-পাটিয়ে উঠে পড়া যাবে। কিন্তু তাতেও ভয় আছে। যদি শালতিচালক ভাল মানুষ না হয়ে ডাকাত কিংবা খুনে হয় তারাপদ বলেছে, "যারা সত্যিকারের ভাল লোক তারা দেখবেন তুলতে চাইবে না আপনাকে। বেকার বোঝা কে বাড়াতে চায়। ছোট শালতি বোঝা বাড়লে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে। আর যারা খুনে-ডাকাত তারা মিষ্টি কথায় আপনাকে ডাকবে। বলবে, 'আসেন কর্তা ভয় কী, পৌঁছে দেব রানিপুরে।' খবরদার,একদম বিশ্বাস করবেন না তাদের। জানবেন খারাপ মতবল আছে তাদের মাথায়। মিনি-মাগনা দিতে চাইলেও চড়ে বসবেন না তাদেত শালতিতে।"

বলাবাহুল্য তারাপদ সব রকমই বলেছিল আমায় কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার পরামর্শ মেনে চলিনি আমি। বাকিটা কী হয় দেখা যাক।

শরীরটা ভাল নয় আমার, জ্বর হয়েছে। মাথার যন্ত্রণা, আর তার সঙ্গে ম্যাজম্যাজ করছে শরীর। বহুদিন বাদে জ্বর হল আমার। শরীর খারাপ নিয়েই আসতে হয়েছে এখানে। কারণটা আর কিছু নয়, কর্তব্যের চাপ। সরকারি ডাক্তার আমি। রানিপুরের লোকেদের খুব আন্ত্রিক রোগ হচ্ছে। তাই সরকারি ডাক্তার হিসাবে আমায় পাঠানো হয়েছে। আজকের মধ্যে পৌঁছনোর কথা আমার। শরীরের কথা চিন্তা না করেই সোজা চলে এসেছি।

নানারকম ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কার ডাকে চমক ভাঙল। "আসেন কর্তা," কে ডাকে আমায় ? মুখ তুলে দেখি, একখানা শালতি আসছে মজা খালের বুকে। আমায় মুখ তুলে তাকাতে দেখেই হেসে মাঝি বলল, "আসেন কর্তা, আসেন, দেরি করবেন না।"

এতক্ষণে তো দেখা পাইনি কারও। হঠাৎ কোথা থেকে এই শালতিটি এল। এ-লোকটা কি ভাল, নাকি খুনে-ডাকাত ? এর শালতিতে ওঠা কি ঠিক হবে। এইসব নিজের মনেই ভাবছি, আবার বলে উঠল সে, "আসেন ডাক্তারবাবু, রানিপুর যাবেন তো ?"

ওর কথা শুনে বেশ অবাকই হয়ে গেলাম। আমি যে ডাক্তার আর রানিপুরে যাব তা ও বুঝল কী করে ? বেশ ধাঁধা ঠেকছে ব্যাপারটা। বটগাছের তলা থেকে উঠে এক পা দু' পা করে এগিয়ে খালের কিনারে পৌঁছে প্রশ্ন করলাম তাকে, "আমি কে, আর কোথায় যাব, তা তুমি জানলে কী করে ?"

তারাপদ বলেছিল যাকেই দেখবেন একবার অন্তত যাচাই করে নেবেন, তাই প্রশ্ন করতে ছাড়লুম না।

এবার দাঁত বার করে লোকটি হেসে বলল, "রানিপুরের কর্তাই আমায় পাঠিয়েছেন। আপনার আসার কথা আজ। নিতে এসেছি তাই। একটু দেরি হয়ে গেল যা।" এবার আর মনে কোনও সংশয় রইল না। এ তা হলে নিতেই এসেছে আমায়। নির্ভয়ে চেপে বসলাম শালতিতে।

মাঝি জিজ্ঞেস করল, "রানিপুরের রানিকুঠির নাম শুনেছেন ?"

"রানিকুঠি !" জানতে চাইলাম আমি,

মাঝি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, রানিকুঠি। আমার কর্তা তো সেখানেই থাকেন।"

"কে তোমার কর্তা ?"

"আমার কর্তা হলেন শ্রীপ্রদীপনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার বংশের ছেলে। ওঁর পূর্বপুরুষ সাহেবের কাছ থেকে একটা কুঠিবাড়ি কিনেছিলেন। তারই নাম রানিকুঠি।"

"কী করেন তোমার কর্তা ?" জানতে চাই আমি।

"আমার কর্তা বলতে গেলে কিছুই করেন না। যা সম্পত্তি আছে। তার উপরেই বসে খান। তবে জমিদারের রক্ত গায়ে আছে তো। তা সে মেজাজটা যাবে কোথায়। গাঁয়ের মোড়ল তিনি এখন। বিচারটিচার সব তিনিই করেন।" জবাব দিল মাঝি।

মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই মাঝিটি আবার বলতে শুরু করল, "আমি আদতে মাঝি নই। কর্তার ভৃত্য আমি। যাবতীয় কাজ সব-কিছু আমিই করি। দরকার পড়লে যেমন দড়ি ছাড়াই তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে ডাবের কাঁদি পেড়ে নিয়ে আসি, তেমনিই আবার পুকুরে ডুব সাঁতার দিয়ে ঝিনুক তুলে আনি। হেঃ হেঃ, আমি এমনই লোক কর্তা।" এই বলে নিজের মনেই হাসতে লাগল ও।

আমাকেও কর্তা বানিয়ে ফেলেছে। আমি এবার প্রশ্ন করলাম ওকে, "তা তোমার নাম কী ?"

"ভূত," হেসে জবাব দিল ও।

সে কী ! মানুষের নাম কখনও ভূত হয় ! ভূতনাথ কিংবা ভুতো হতে পারে। বেশ ঘাবড়ে গেলাম আমি। আমায় অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে উঠল ও। দু' সারি দাঁত ঝকঝক করে উঠল ওর।

আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। সন্ধ্যা নেমেছে। তবে জাঁকিয়ে নয়। এখনও আলো-আঁধারি একটা পরিবেশ রয়েছে। তারই মধ্যে এগিয়ে চলেছে শালতিখানা। খালের দু'পাশে নানারকম গাছের সারি। অন্ধকার জমাট হয়ে চেপে বসেছে তাদের মাথায়। ঝাঁক-ঝাঁক জোনাকির দল গাছে-গাছে খেলা করছে।

আবার মাঝির দিকে তাকালাম। প্রশ্ন করলাম ওকে, "তোমার বয়স কত হল ভাই ?"

"তা ধরুন, দু'-তিনশো বছর।" হেসে জবাব দিল ভূত।

শুনে আমার অবস্থা হতবাক হওয়ার মতো, ও বলে কী ! পাগল নাকি ! নাকি বয়স সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই ? দু'-তিনশো বছর কোনও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ? নিশ্চয়ই ভুলভাল বকছে ও।

হাসিমুখে বললাম, "তুমি ভুল করছ ভূত, বয়স কখনও কারও দু-তিনশো বছর হয়, আমার সঙ্গে রসিকতা করছ তুমি।"

"না, না, এটা একেবারে সত্যি, রানিকুঠির আদি মালিক রবার্ট-সাহেবকে আমি নিজে চোখে দেখেছি, কর্তা কী স্বাস্থ্য আর গায়ের রং ছিল তাঁর, যেমন গোরাদের হয় আর কি। একখানা কালো কুচকুচে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। হাতে সব সময় চাবুক ঝুলত তাঁর। তাঁকে আসতে দেখলে সবার বুক ভয়ে কাঁপত। যে একটু বেয়াদপি করত হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে দিতেন গাঙের জলে। বড় অত্যাচারী ছিলেন তিনি।" লক্ষ করলাম কথাগুলো বলতে গিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে ভূত।

এবার ভাল করে তাকালাম ভূতের মুখের দিকে। লম্বাটে, শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথার চুলে সাদা-কালোর মিশেল, আর ওর ঘোলাটে চোখ দুটোর দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক। পরনে একখানা ময়লা ধুতি। সব মিলিয়ে ওর চেহারাটার মধ্যে একটা অন্যরকম ভাব আছে।

এদিকে শরীরে কেমন যেন অস্বস্তি, মাথাটাও বড্ড ঝিমঝিম করছে আমার। কিন্তু পরিবেশ আর এই অদ্ভুত লোকের কথাবার্তা আমায় যেন চাঙ্গা করে রেখেছে।

প্রসঙ্গ পালটে আমি বললাম, "ভূত, তোমাদের গাঁয়ের অবস্থা কীরকম ? আন্ত্রিকে কীরকম লোক ভুগছে ?"

"আর ভুগছে !" আমার কথা শুনে একটু কাষ্ঠহাসি হাসল ভূত। তারপর বলল, "এত দেরি করে এলেন কর্তা, কত লোক প্রাণ হারাল। বড় সাঙ্ঘাতিক রোগ বাবু।"

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল বেশ। কিন্তু আমি আর কী করব। আমায় যখন পাঠানো হয়েছে, তখনই ছুটে এসেছি।

ভূতকে সে-কথা বলতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন কর্তা, সরকারি কাজই তো এরকম।" এই বলে ভূত চুপ করে জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আবার বললাম, "তুমি কিন্তু তোমার বয়সটা ঠিক বললে না ভূত। কারও বয়স কি কখনও দু'-তিনশো হতে পারে ?"

এবার বেশ তেতে উঠল ভূত। "আমি কি মিছে কথা বলছি কর্তা। আমার বয়স নয়-নয় করে দু'-তিনশো বছর হবে। জন্মসালটা ঠিক বলতে পারব না আমি। তবে এটা জানি, আজকের লোক নই। অনেক কিছুই দেখেছি আমি, হিসেব করে মিলিয়ে নিন।

"তেত্রিশের সেই ভয়ঙ্কর বান, যা সমস্ত এলাকাটাকে চারমানুষ-সমান জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। ছিয়াত্তরের সেই আকাল। একটুখানি ভাতের ফ্যানের জন্য জমিদার-বাড়ির দুয়ারে এসে বসে থাকত কত লোক। সব দেখেছি কর্তা, সব দেখেছি। অনেকদিনের লোক আমি।" এই বলে আবার লগি ঠেলতে লাগল ও। আমি বুঝলুম এসব নিয়ে ওর সঙ্গে বেশি কথা বলা অর্থহীন।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্তির নেমে এসেছে। খালের দু'পাশের সারি-সারি গাছগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় যেন নদীপথে কোনও এক বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি।

আকাশে মেঘ নেই। চাঁদ উঠেছে। তায় মোলায়েম আলোয় যেন আরও মোহময় মনে হচ্ছে পরিবেশটাকে। গাছে-গাছে জোনাকির দল এখন আরও উজ্জ্বল। ঝাঁক-ঝাঁক মুক্তোবিন্দুর মতো মনে হচ্ছে তাদের। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ।

ভূতের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম, "বলি ও কর্তা, কী ভাবছেন ?"

হেসে বললাম, "রূপ দেখছি, প্রকৃতির রূপ।"

আমার কথা শুনে হেসে উঠল ভূত, "রূপ দেখছেন ? আমিও দেখি, ভাল লাগে।"

এবার একটা প্রশ্ন খেলে গেল মনে, "আচ্ছা ভূত, এখানে চোর ডাকাতের ভয় নেই ?"

"নেই আবার, আলবাত আছে।" চোখ বড়-বড় করে উত্তর দিল ও। "একসময় গঞ্জালেসের খুব উৎপাত ছিল এ-অঞ্চলে।"

গঞ্জালেস ? কোন গঞ্জালেসের কথা বলছে ও। সেই ঔরংজেবের আমলের বিখ্যাত পর্তুগিজ জলদস্যু গঞ্জালেস ? যার ভয়ে কিনা সমস্ত বাংলা থরথর করে কাঁপত।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই গঞ্জালেস।" ভূতের কথায় চমকে উঠলাম আমি। ভূত বলে চলল, "গঞ্জালেস ছিল সাঙ্ঘাতিক দস্যু। কী তাগদ ছিল তার। লাল দাড়িতে মুখ থাকত ঢাকা, আর তার লাল চোখ দুটো সবসময় দপ-দপ করত। গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে দিত ও। এসব শোনা কথা নয় কর্তা, নিজের চোখে দেখা।"

গঞ্জালেসের কথা বইতে পড়েছি। ভূতের বিবরণে তা জীবন্ত মনে হল। তবে সত্য-মিথ্যে যাই হোক লোকটার বলার ঢং-টা কিন্তু বেশ সুন্দর। একেবারে সত্যি বলে মনে হয়। ওর কথাবার্তার জন্যই এই শরীর খারাপ নিয়েও শালতি-যাত্রাটা মন্দ লাগছে না।

"তবে ডাকাতদের মধ্যে ভাল ডাকাত ছিল বিশে ডাকাত। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ও।" বিশে-ডাকাত সম্বন্ধে এবার ওর বলা শুরু হল।

"গোরা সৈনিকরা পর্যন্ত বিশে-ডাকাতের ভয়ে কাঁপত। ও ছিল বড়লোকের যম, আর গরিবদের দেবতা। বড়লোকদের ধন-দৌলত কেড়ে নিয়ে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। ওরা ছিল সব ডাকাতের মতো ডাকাত।"

"আর এখনকার ডাকাতরা ?" আমার কথা পড়তে দিল না ভূত। বলে উঠল, "দূর, দূর, আজকের ডাকাতরা নস্যি ওদের কাছে। এদের না আছে সাহস, না আছে বাহাদুরি।"

ভূতের কথা শুনে বুঝলাম আজকের ডাকাতদের পরোয়া করে না ও। তাই ওকে একটু তাতিয়ে দেওয়ার মতো করে বললাম, "তা ভূত, আমাদের যদি কোনও খুনে-ডাকাত আক্রমণ করে তবে জান বাঁচবে তো ?"

ভূত আমার দিকে তাকাল, একদম নীরব ও। স্বল্প আলোয় ওর মুখের ভাব-প্রকৃতি ঠিক বোঝা গেল না। তবে বুঝলাম, ও কিছু একটা ভাবছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব আস্তে-আস্তে ও বলল, "কর্তা, কোনও ভয় নেই আপনার। যদি ডাকাত আসে তবে আমার সঙ্গে পারবে না।" এই বলে হঠাৎ ডান হাতে কোমরের ঝোলাটা থেকে একখানা ছোরা বের করে আনল ও। চাঁদনি আলোয় ঝকঝকে ইস্পাতের ছোরাটা যেন লকলক করে উঠল।

"এ বড় সাঙ্ঘাতিক ছোরা কর্তা। কেউ এলে তাকে আর ফিরতে হবে না জান নিয়ে।" দপদপ করতে লাগল ভূতের চোখ। ছোরাটা দেখিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিল ও। আমি মনে-মনে ভাবলাম, আচ্ছা, ভূত যদি ডাকাত হয় ? হয়তো নানারকম বলে ভোলাচ্ছে আমায়। তারপর আসল জায়গায় নিয়ে গিয়ে সাবাড় করে দেবে। ওর শক্ত-সমর্থ চেহারাটার সঙ্গে আমি লড়ে পারব না। আর ইস্পাতের ছোরাটা যা দেখলাম তাতে লড়ার বিশেষ সময়ও পাব বলে মনে হয় না। তাই চিন্তা করাটা অনর্থক বলে মনে হল আমার। অগত্যা চুপচাপ বসে রইলাম।

এমন সময় ভূত বলে উঠল, "ভয় পেলেন নাকি কর্তা ? ভয়ের কিছু নেই, আর কিছুক্ষণের মধ্যে রানিপুর পৌঁছে যাব।" এই বলে শালতিটাকে আরও জোরে এগনোর চেষ্টা করতে লাগল। ওর কথায় আন্তরিকতার ছাপ রয়েছে। ওকে ডাকাত ভাবাটা ভুল আমার। এখন রানিপুর ভালয়-ভালয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি। এইসব ভাবতে-ভাবতে আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। চাঁদের আলো কমে আসছে। বলা যায় না যে-কোনও সময়

চিনে নাও আসল হ্যান্ডিবয়কে!
A
B
C
D
E
F
G
H
I
চারজোড়া খোকা দেখতে হুবহু এক,
বলতে পারো কোনটি জুড়ি কার?
আসল হ্যান্ডিবয় যেই
তার কিন্তু জুড়ি নেই,
বলোদিকি কোন্ খোপটি তার?
বন্ধু যেমন স্ট্রিপ
Handyplast®
® Registered Trade Mark
HTA 1424

বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে। ভূতকে জিজ্ঞেস করলাম, "বৃষ্টি আসার আগেই পৌঁছে যাব তো ?"

"নিশ্চয়ই কর্তা। এই তো এসে গেলাম বলে।" তারপর ম্লান হেসে বলল, "রানিপুরে গেলে আর কী দেখবেন কর্তা। কেবল ভূত দেখবেন।"

"ভূত ?" চমকে উঠলাম আমি। "আজ্ঞে হ্যাঁ, যারা মারা গেছে, তাদের প্রেতাত্মারা রোজ রাতে টহল দিয়ে বেড়ায়।"

"তুমি দেখেছ তাদের ?" জানতে চাইলাম আমি।

"ভূত কি জীবনে কম দেখেছি কর্তা, অঢেল। তবে রাগীভূত ছিলেন রবার্ট-সাহেবের কাকার ভূত। ভীষণ মেজাজি লোক ছিলেন তিনি। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তারপর মাঝে-মধ্যেই তাঁকে দেখা যেত রাতবিরেতে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুধু মাঠ, জলাজঙ্গল সব পার হয়ে যাচ্ছেন। মানুষরা তখন যে-যার দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে ঠকঠক করে কাঁপত। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। কেবল তখন ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেত, ঠক ঠক ঠক, আস্তে-আস্তে সে সুর মিলিয়ে যেত একসময়।"

"আর 'এখনকার ভূতরা ?"

"এখনকার ভূতরা খানদানি ভূত নয় কর্তা। রাতের বেলায় গাছের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। আপনি যদি তার তলা দিয়ে যান তবে তাদের বিকট হাসি শুনতে পাবেন, আর দেখবেন তাদের বিচ্ছিরি চেহারা। তবে যদি একটু সাহস ধরেন তেনারাই উলটে পালাবেন। তবে সদ্য-ভূতদের তেজটা বেশি। তাই তাদের উৎপাতও লেগে আছে। রানিপুর জুড়ে এখন ভূতেদের তাণ্ডব। রানিপুর সন্ধের পর নিঝুম হয়ে যায়।"

কথা বলতে-বলতে অনেকটা সময় কেটে গেছে। এক-সময় ভূত বলে উঠল, "এই, এসে পড়েছি কর্তা।"

চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এ আমাকে কোথায় এনে ফেলল ভূত। চাঁদনি আলোয় দেখছি বিশালএক বিলের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা,ভূতের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিশ্চিন্তে পাঁকের মধ্যে লগি ঠেলে-ঠেলে শালতিখানাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। বিলের অন্য কিনারে এসে স্থির হল শালতিটা। তারপর বলল, "এবারে নামুন কর্তা। আমরা এসে গেছি।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। শালতিটা প্রচণ্ড জোরে দুলে উঠল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিলাম। চাঁদনি আলোয় দেখলাম বিলের চারপাশ ঘিরে কেবল বিশাল-বিশাল গাছ। আর এইসব গাছের গা বেয়ে ওঠা লতানে গাছের দল হঠাৎ একখণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিকে কোথাও কোনও আলো চোখে পড়ল না। ঘন অন্ধকার। বিলের ধারে শুধু আমরা দুজন। ভূত বলল, "আমার পিছু-পিছু আসেন কর্তা, অন্ধকারেও আমি চোখ বুজে চলতে পারি।"

আমি বললাম, "আলোর ব্যবস্থা আছে আমার।"এই বলে ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করলাম। তারপর জ্বালিয়ে দিলাম সেটা।

ভূতকে অনুসরণ করে একটা বিশাল মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। মাঠের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একখানা সরু পায়ে-চলা পথ। তা ধরেই এগিয়ে চলল ভূত, পিছু-পিছু চলেছি আমি।

কিছুক্ষণ চলার পর ভূত আমাকে এনে হাজির করল একতলা একটা নিঝুম বাড়ির সামনে। বাড়ির সামনেটায় বিরাট উঠোন, বেশ ফাঁকা জায়গাটা। তবে উঠোনের চারপাশে গাছগাছালি আছে। ভূত বলল, "এটা হল গিয়ে আপনার জমিদার-বাড়ির অতিথি-ভবন। আজ রাত্তিরটা আপনি এখানেই থাকবেন। কাল সকালে কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে। গাঁয়ে কেবল উনিই জানেন যে, আপনি আসছেন। শরীর ভাল থাকলে উনি অবশ্যই আসতেন।"

টর্চের আলো এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আমি বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম।

"একটু দাঁড়ান কর্তা। আমি আসছি।" এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল ভূত। দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানা হ্যারিকেন হাতে হাজির হল সে। এগিয়ে গেলাম। বাড়ির সামনে বারান্দা, তারপর তিনখানা ঘর, ঘরের সামনে বারান্দার উপর টর্চ ফেলে দেখলাম, মেঝেতে টালি পাতা। তবে টালিগুলো যে অনেকদিনের পুরনো সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

ট্যাঁক থেকে একখানা চাবি বার করে মাঝখানের ঘরটার দরজা খুলে দিল ভূত। স্বল্প আলোয় যেটুকু বোঝা গেল তাতে মনে হল ঘরটা খারাপ নয়। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থেও বেশ বড়। ঘরের একপাশে টেবিল-চেয়ার। মাঝখানে খাট, পরিপাটি করে বিছানা পাতা। কোথাও একটু ধুলোবালির চিহ্ন নেই। বোধ হয় আমি আসব বলেই সব-কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। আমি গিয়ে সটান বিছানার উপর বসে পড়লাম। সারাদিনে ধকল তো কম হয়নি। তারপর শরীরও বিগড়ে আছে।

ভূত বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, "কুয়ো থেকে জল তুলে দিচ্ছি কর্তা। তারপর আমি চলে যাব। একেবারে রান্না করে নিয়ে আসব আপনার খাবার।"

ভূত সত্যিই জল তুলে দিয়ে হ্যারিকেনটা রেখে চলে গেল। আমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলাম, চুপচাপ শুয়ে রইলাম বিছানায়।

চারদিকে জমাট অন্ধকার। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে আছে। বিল, জলা জুড়ে শুধু মাঝে-মধ্যে কেবল শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অদ্ভুত এক পরিবেশ। এমন গ্রাম এখনও আছে! আশ্চর্য, সরকারি-ডাক্তার হিসেবে বেশ কয়েকবার আমায় গ্রামে যেতে হয়েছে। কিন্তু এরকম নিঃসাড়-গ্রাম আমি আর কখনও দেখিনি। বিদ্যুৎ নেই,চিকিৎসা নেই, রাস্তা নেই, আধুনিক জীবনের কোনও ছোঁয়াই নেই এখানে।

নিজের মনেই নানারকম ভাবছি, এমন সময় ভূতের ডাকেসংবিৎ ফিরে পেলাম। ভূত ডাকছে, "দরজা খুলুন কর্তা, খাবার এনেছি।"

দরজা খুলে দিলাম। ভূতের হাতে ঢাকা-দেওয়া একরাশ খাবার, টেবিলের উপর সেগুলো রাখল ভূত। ভালই আয়োজন করেছে ভূত। ভাত, ডাল, বেগুনভাজা আর মাছের ঝোল। ভূতকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি খাবে না ?"

ভূত বলল, "না, আমি খেয়েছি। আপনি খান।" খেতে শুরু করলাম। জ্বরের মুখে ভেবেছিলাম খেতে রুচি হবে না, কিন্তু খিদে ছিল বলেই বোধ হয় খারাপ লাগল না, খেয়ে নিলাম সব চেটেপুটে। ভূত রান্নাও করেছে চমৎকার, ভালই হল ভোজটা। আমাকে খাইয়েদাইয়ে চলে গেল ভূত। যাবার আগে বলে গেল, সকালে এসে নিয়ে যাবে কর্তাবাবুর কাছে। তখনই পরিচয় হবে। ভূত চলে যেতে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম আমি। বিছানায় শুয়ে নানা কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় ঠকঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝমঝম শব্দ একসুরে বেজেই চলেছে। ভাবলাম, অন্য কোনও শব্দ হবে। কিন্তু আবার দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে যেন আমায় ডাকছে মনে হচ্ছে। ঝড়, বৃষ্টির শোঁশোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে কার যেন কাতর গলা শোনা যাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর টলতে-টলতে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দরজা খুলে দেখলাম ভূত আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে হাতজোড় করে বলে উঠল, "দয়া করে চলুন কর্তা। আমার কর্তাবাবু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। কিছুতেই জ্ঞান

ফিরছে না। আপনি চলুন, কর্তা।"

শরীরটা খুব খারাপ, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। ভূতের হাতে দেখলাম দু'খানা ছাতা। চটপট তৈরি হয়ে ব্যাগ আর টর্চ নিয়ে চললাম ভূতের সঙ্গে।

ভূত আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নিল। বলল, "আমাকে আলোটা দিন কর্তা। তা হলে সুবিধে হবে। আর আপনি আমার পিছুপিছু আসুন।" তাই হল। আগে-আগে পথ দেখাতে-দেখাতে চলল ভূত। আর আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

"শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না কর্তার। আজ রাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।" ভূত বলতে-বলতে একটা কাঁচা পথ ধরল। পথটা এত কর্দমাক্ত যে, চলতে গিয়ে কাদায় পা বসে যাচ্ছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

ভূতের সঙ্গে চলতে-চলতে একটা বিশাল মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। মাঠের মধ্যে বিরাট এক বটগাছ। ঝোড়ো হাওয়ায় ঝুরিগুলো দুলছে তার।

মাঠ পেরিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে বিশাল লাগছে বাড়িটাকে। ভূত আমার দিকে ফিরে বলল, "এসে গেছি, এই হল রানিপুরের রানিকুঠি।"

হঠাৎ কড়কড় কড়াত শব্দে বিদ্যুৎ ঝলকে গেল। বিদ্যুতের আলোয় এক ঝলক দেখা গেল বাড়িটা। জীর্ণ, শীর্ণ একটা পুরনো বাড়ি। সিমেন্টের ইটগুলো সব দাঁত বার করে হাসছে। তবে একঝলক দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না এককালে দারুণ ছিল বাড়িটা। পুরনোদিনের জমিদার-বাড়ির মতো এখন অবস্থা তার।

বাড়ির সামনে জং-ধরা লোহার বড় ফটক। খোলাই ছিল সেটা। ভূতের পেছন-পেছন বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। সামনেটা ইটবাঁধানো উঠোন, তারপরে লম্বা সার দেওয়া ঘর। ভেতরেও মহল রয়েছে বলে মনে হয়।

আমাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে একখানা ভারী চেয়ার টেনে তাতে বসতে দিল ভূত। তারপর বলল, "আপনি বসুন কর্তা। আমি আলো নিয়ে আসছি।" এই বলে আলো আনতে চলে গেল ও। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাইরে এত ঠাণ্ডা হাওয়া কিন্তু ঘরের ভেতরটায় ভ্যাপসা গরম।

একটু বাদেই ভূত হাজির। হাতে ওর একটা কালিঝুলিমাখা হ্যারিকেন। টিমটিম করে জ্বলছে সেটা। হ্যারিকেনের আলোয় ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। বেশ বড়ই ঘরটা। চুনবালি অনেক জায়গায় খসে-খসে পড়েছে। জানালাগুলো সব বন্ধ। তাই এত গরম লাগছিল ঘরের মধ্যে।

ভূত বলল, "আসুন আমার সঙ্গে, পাশের ঘরে কর্তাবাবু আছেন।" ভূতের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমি। মাথার যন্ত্রণাটা আরও বেড়ে গেছে। শরীরটাও অবসন্ন লাগছে বেশ।

ঘরের কোনায় একটা খাট। আর তাতে শুয়ে আছেন একজন। বিশাল খাটে নানারকম কারুকার্য করা। রোগীর পাশে গিয়ে বসলাম। তারপর ভূতের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলাম রোগী সম্পর্কে।

ভূত বলল, "কর্তাবাবু আমার এমনিতে ভালই থাকেন। অসুখে-বিসুখে ভোগেন না। কিন্তু আজ রাতে কী যে হল, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়েছেন। কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না।"

রোগীর নাড়ি দেখলাম। খুবই দুর্বল মনে হল। ভূতকে বললাম, "সম্ভবত দুর্বলতাই ওঁর অজ্ঞান হবার কারণ। তেমন ভয়ের কিছু নেই।"

এবার হ্যারিকেনটা নিজের হাতে নিলাম। তারপর রোগীর মুখের উপর হ্যারিকেনটা ধরতেই চমকে উঠলাম। আরে এ তো আমার নিজেরই মুখ দেখছি আমি। রোগীর শরীরটাও ঠিক আমার মতো। হুবহু একরকম, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল আমার।

হঠাৎ মনে হল, এ বাড়িঘর সব-কিছু আমার যেন চেনা। আগে তো কখনও আসিনি এখানে। ওপাশে ঠাকুরঘর না। তার পাশে দালান। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে চললাম আমি। ঠাকুরঘরে ঢুকলাম। ওই তো শিবের মূর্তি। এই মূর্তি আমি কতবার যেন দেখেছি। ওই তো পুব দিকের নিমগাছটা। সব সব-কিছু আমার পরিচিত। এ-বাড়ির সব চিনি আমি। মাথা ঘুরতে লাগল আমার। কিছুই বুঝতে পারছি না। আমারই মতো একজন শুয়ে আছেন। কোনওদিন দেখিনি অথচ পরিচিত বাড়ি। আমার সব চিন্তা কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। চোখের সামনে কালো পরদা দুলে উঠল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল। মুখে একঝলক সোনালি রোদ্দুর এসে পড়েছে। শরীরটা অল্প ম্যাজম্যাজ করছে।

দেখলাম আমি খাটে শুয়ে আছি। আর আমারই মতো দেখতে অবিকল সেই মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, "তোমার হাতের এই তাবিজটা কোথা থেকে পেয়েছ?"

আমি বললাম, "পাইনি। এটা আমার ছিল।"

সে উৎফুল্ল গলায় বলল, "তুমিই তা হলে আমার যমজ ভাই। পাঁচ বছর বয়েসে মামার সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলে।"

আমি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি। নিজের পরিচয় জানি না। অবাক হয়ে তাই তাকিয়ে রইলাম সেই মুখটির দিকে। সে বলল, "তোমার চেহারা আর তাবিজই প্রমাণ করছে, তুমি আমার ভাই।"

এতক্ষণে সব-কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার। এটা তা হলে আমারই বাড়ি। পাঁচ বছর বয়স অবধি এখানেই মানুষ হয়েছি আমি। শৈশবে হারিয়ে গিয়ে, অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়ে বাল্যকালের স্মৃতি মন থেকে মুছে গিয়েছিল, তাই এখানে আসতেই সেই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আবার জেগে উঠতে শুরু করেছিল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল ভূত। বুঝলাম ওর মালিকই আমার ভাই প্রদীপনারায়ণ। প্রদীপনারায়ণ ভূতকে দেখে বলল, "ভূত, তুই সত্যিই ভূত! ডাক্তারবাবুকে দেখেও বুঝতে পারলি না যে, ও আমারই ভাই।"

ভূত বেজার মুখে বলল, "কী আর বুঝব বলুন। রোগী দেখতে এসে ডাক্তারবাবুই তো রোগী বনে গেলেন, আপনার জ্ঞান এমনিতেই ফিরে এল। আর ডাক্তারবাবু অজ্ঞান হলেন।"

ভূতের কথা শুনে একটু হেসে নিল প্রদীপনারায়ণ। বলল, "যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। ঘরের ছেলে যে ঘরে ফিরে এসেছ, এটাই সৌভাগ্য।" তারপর একটু থেমে যোগ করল, "বাড়ির সবাই গঙ্গাসাগরে গেছে। ফিরে এসে তোমায় দেখে খুব খুশি হবে।"

এবার আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর এক পা দু' পা করে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম আমার ভাই প্রদীপনারায়ণকে। শরীরটা ভারী ঝরঝরে লাগছিল আমার। মনে হচ্ছিল আর কোনও ব্যামো নেই। ম্যাজিকের মতো সব সেরে গেছে। স্মৃতি ফিরে আসছে। অল্প-অল্প মনে করতে পারছি প্রদীপনারায়ণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কেমন খেলে বেড়াতাম। স্মৃতি ফিরে আসছে। বড় মধুর সেই স্মৃতি। শরীরটাও তাজা চনমনে লাগছে। এখন আর শরীরে কোনও কষ্ট নেই।

ছবি: অনুপ রায়

দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি হাই স্কুল

পথ ছিল তাঁর নেশা। পথের টানে তিনি বারবার ঘর ছেড়েছেন। বদলেছেন ঠাঁই। চলার পথের ধুলো গায়ে মেখে গরীয়ান সেই মানুষটি ঠাঁইনাড়া হওয়ার খেলার পালায় একদিন এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন রূপনারায়ণ নদের কূলে। অজানা অচেনা নদের দুকূলপ্লাবী বিস্তার, নৈসর্গিক শোভা, কোলাহলবর্জিত পরিবেশ তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। আজন্ম বাউন্ডুলে সেই মানুষটি, বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রূপনারায়ণের বাঁধনছেঁড়া রূপের মধ্যে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন পরিণত বয়সের শান্তি। ঘর বেঁধেছিলেন সামতাবেড়ে গ্রামে। মিশে গিয়েছিলেন সামতাবেড়ে, পানিত্রাস, বিরামপুর, মানকুর, বাকসি, দেউলগ্রাম, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হরেক গ্রামের দীন দরিদ্র সরল সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে। পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চল আর এখানকার মানুষজন তাঁর লেখায় উঠে এসেছে বহুভাবে। শরৎচন্দ্রের নামে এখনও এখানের মানুষ শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান। হাওড়া জেলার বাগনান ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে

প্রধানশিক্ষক

জাতীয় সড়ক থেকে যে পথটা উত্তরে বাঁক নিয়েছে, তা ধরে বাসে চেপে ঘণ্টাখানেক পথ গেলে আগেপিছে পড়বে দেউলগ্রাম, মানকুর, বাকসিহাট প্রভৃতি গ্রাম। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পানিত্রাস, সামতাবেড়ে, বিরামপুর, আমতলা, কল্যাণচক··· । রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে রূপনারায়ণের বুকে। সেখানে খেয়া পেরোতে হয়। শীর্ণ পথে এর উঠোন তার গোয়ালের পাশ ঘেঁষে বাস চলে ধড়ফড়িয়ে। দু'পাশে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। সবুজের প্লাবন। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে সীমাহীন নীল আকাশ মিলেমিশে একাকার। জীবন এখানে সংগ্রামময়। প্রতিনিয়ত লড়াই। বর্ষায় গ্রাম ভেসে যায় বন্যায়। গ্রীষ্মে পুকুর, বিল, কুয়ো ফুটিফাটা। একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পাশে, কলকাতার কাছেই, এ হল প্রদীপের নীচে অন্ধকার। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও দারিদ্র্য এখানের মানুষদের পেড়ে ফেলতে পারেনি। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন উত্তরণের। শিক্ষাকে চালিকাশক্তি করে বুনে চলেন বীজ। এবং নিজেদের চেষ্টাতেই। গর্বের সঙ্গে সে-কথা উচ্চারণ করেন দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি হাই স্কুলের শিক্ষক-ছাত্ররা, "দরিদ্র অভাবী এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের চেষ্টায়, স্বতঃস্ফূর্ত দানে গড়ে উঠেছে এই স্কুল। একটা স্বপ্নকে সামনে রেখে। তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন স্কুলকে। আজও।"

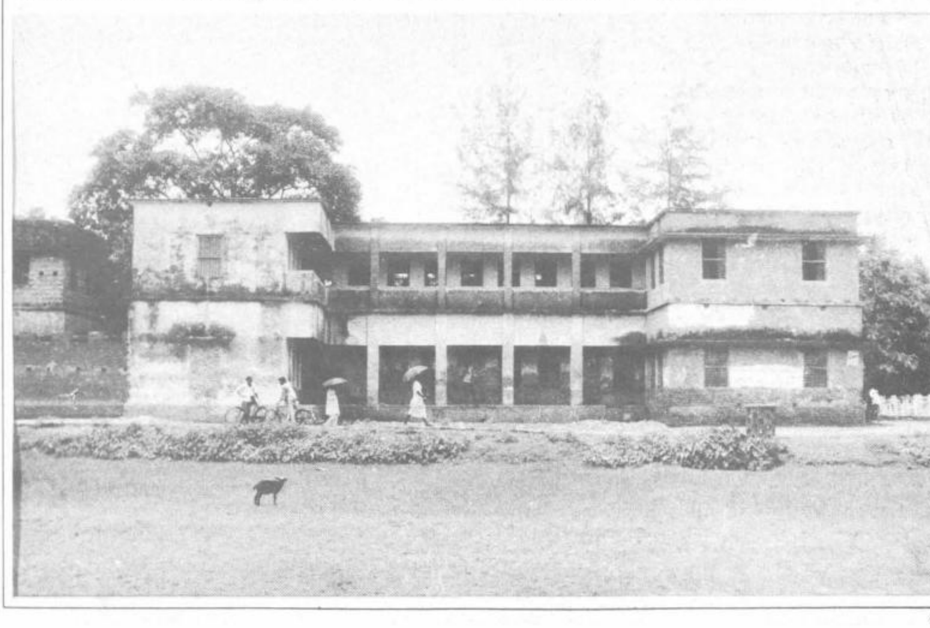

মানকুর বাকসি হাই স্কুলের সূচনা হয়েছিল ১৯২১ সালে। বিধুভূষণ সামন্ত, বিপিনবিহারী ঘোষ, শশিভূষণ কোল্যা, নগেন্দ্রনাথ গুড়ে, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য। এর আগে মানকুরে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা ছিল। স্কুলের জন্য জমি দান করেন পঞ্চানন সামুই। বাকসিহাটে পঞ্চাননবাবুর পাঁচ বিঘে জমির ওপর গড়ে ওঠে স্কুলবাড়ি। স্কুলের নাম রাখা হয় তিনটি গ্রামের নামে। মাটির দেওয়াল, ৪০-৫০ জন ছাত্র, প্রথমদিকে এই ছিল স্কুলের ছবি। স্কুলের প্রধানশিক্ষক শান্তিপ্রসাদ মণ্ডল ১৯৪১ সাল থেকে এখানে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মনে পড়ে সেই সময়ের কথা। "দুটো মাত্র মেটে ঘর ছিল। ছাত্র-সংখ্যা ছিল খুব বেশি হলে আড়াইশো। খালি পায়ে ধুতি পরে স্কুলে আসতাম। প্রাইভেট টুইশনি কী জানতাম না। মাস্টারমশাইদের শাসন যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভালবাসাও। সন্তানস্নেহে আগলে রাখতেন। একজনই তিন-চারটি বিষয় পড়াতেন। গোটা স্কুলে তিন-চারজনের বেশি গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু তার জন্য কোনওদিন কোনও অসুবিধে হত না।"

সেই শুরুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত, পুরোপুরি সাধারণ মানুষের উৎসাহে উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই স্কুল। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। সম্পন্ন সচ্ছল মানুষেরা কোনওদিনই এর পেছনে ছিলেন না। তিনটি গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করে ধীরে-ধীরে স্কুলকে দাঁড় করিয়েছেন। অনেকটা জায়গা জুড়ে দোতলা স্কুলবাড়ি। টানা চলে গেছে ঘরের সারি। বিশাল চৌহদ্দি জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অজস্র গাছপালা। ফুল। মস্ত খেলার মাঠ। স্কুলের মাঝখানে পঞ্চাশ মিটারের একটি সুন্দর সাঁতারের ট্যাঙ্ক। আধ কিলোমিটার দূরত্বে রূপনারায়ণের ভরা জল। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এক হাজার। এগারো-বারোতে দু'শো। পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি ভাল। পাশের হার শতকরা ষাট-সত্তর ভাগ। গড়ে মাধ্যমিকে চার-পাঁচ জন ও উচ্চমাধ্যমিকে দু-তিনজন ছাত্র প্রথম বিভাগ পায়। '৮০, '৮৬, '৮৮-তে একজন করে ছাত্র ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছে। স্কুলের কৃতী ছাত্রদের তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ পাল, অশোককুমার মণ্ডল, ডাঃ বিষ্ণুপদ মণ্ডল, ডাঃ মনোজকুমার ঘোষ, পার্থ

স্কুলে খেলাধুলোর চর্চাও চলে সমানে

ঘোষ, ডাঃ গুরু দাস, মিহির দে প্রভৃতি। নামী ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগ রয়েছেন ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং ও অধ্যাপনা এই তিনটি পেশায়।
স্কুলে বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শহিদ দিবস ইত্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। ছাত্ররা তাতে অংশ নেয়। উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষকদের পরিচালনায় ছাত্ররা নাটক মঞ্চস্থ করে। ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় স্কুলের বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা 'কাকলি'। দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি হাই স্কুলের খেলাধুলোর মান খুব ভাল। হকিতে তারা জেলায় রানার্স, স্কুল বেঙ্গলে সেমিফাইনালিস্ট। ফুটবলে থানা চ্যাম্পিয়ান। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র লক্ষ্মীকান্ত ঘোড়ুই খোখোতে বাংলা-দলের হয়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলে এসেছে। সাঁতারে দশম শ্রেণীর ছাত্র সুকুমার বেরা তার বিভাগে

দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র

লড়িয়ে ছেলে সুদীপ্ত মান্না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে সে হয়েছিল চতুর্থ। তারপর প্রতি বছর এক ধাপ উন্নতি করে এইবার দশম শ্রেণীতে উঠেছে প্রথম হয়ে। মোট নম্বর পেয়েছে ৬৭৬। দেউলগ্রামে বাড়ি। বাড়িতে আছেন মা, বাবা, ঠাকুমা, কাকা আর বোন। দিনে সাত-আট ঘণ্টা পড়ে; ব্যাডমিন্টন,

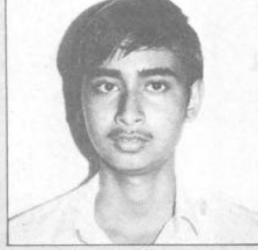

ক্রিকেট খেলে। ছবি আঁকে। হবি ফুলগাছ লাগানো। বাড়িতে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, ক্যাকটাস লাগিয়েছে। প্রিয় লেখক আশাপূর্ণা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিয় খেলোয়াড় শ্রীকান্ত, কপিলদেব। প্রিয় বিষয় ভৌতবিজ্ঞান। ইচ্ছে এঞ্জিনিয়ার হওয়ার। ঘুরতে ভালবাসে। একা-একা বেরিয়ে অনেক দূর চলে যায়। রূপনারায়ণের পাড়ে গিয়ে বসে থাকে। তার আরও একটি গুণ আছে। সে মাঝে-মাঝে গল্প লেখে। এবং এ-কথা জানাতে গিয়ে ফুটফুটে ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে যায়। দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি উচ্চ বিদ্যালয়ে এ-বছর পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে রাজীব দাস। সপ্তম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে দেবাশিস মান্না। অষ্টম ও নবম শ্রেণীর প্রথম ছাত্ররা হল যথাক্রমে রঞ্জিত পাল ও রাজিবুল হুসেন।

জেলায় প্রথম ও রাজ্যে চতুর্থ হয়েছে। স্কুলের ছোট অথচ সুন্দর গ্রন্থাগারটিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রায় দু' হাজার বই আছে। আগে আরও বই ছিল। কিন্তু '৭৮ সালের বন্যায় প্রায় পাঁচ হাজার বই নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু বইই নয়, বন্যা স্কুলের অনেক-কিছুই শেষ করে দিয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে নতুন করে সব-কিছু তৈরি করতে হয়েছে। রয়েছে একটি ভাল ল্যাবরেটরি, যেখানে ছাত্ররা হাতে-কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

সময়-সুযোগমতো শিক্ষকরা ছাত্রদের নিয়ে এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়েন।

এখানের অভিনব ব্যাপার হল, শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রাইভেট ট্যুইশনিতে নিরুৎসাহ করেন। এ নিয়ে তাঁরা সোচ্চার, "প্রাইভেট ট্যুইশনি ছাত্রদের ক্ষতি করছে।" স্কুলে শিক্ষক আছেন সাতাশজন। কর্মচারীর সংখ্যা আট জন। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল। ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসনের মধ্যে রাখা হয়। শিক্ষকদের বক্তব্য, "ছাত্রদের চরিত্র গঠন, মানুষ হয়ে ওঠা, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি।"

প্রধানশিক্ষক শান্তিপ্রসাদ মণ্ডল ১৯৫৪ সালে এখানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে প্রধানের দায়িত্ব পান। "একই স্কুলে প্রথমে ছাত্র, তারপরে শিক্ষক, অবশেষে প্রধানশিক্ষক, এ যে কী আনন্দের ব্যাপার বলে বোঝাতে পারব না। যদি কিছু করে যেতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব।" সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, "ইংরেজির পরিবর্তন বিপজ্জনক অবস্থায়। গ্রামের ছেলেরা যে অবস্থা থেকে আসে সেখানে এই পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষা কষ্টকর। যদি এই শিক্ষাব্যবস্থাই থাকে তা হলে ইংরেজিকে ঐচ্ছিক করে দেওয়া হোক। অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেকটা বই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে।

অনেক বই চাই। শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে ছাত্রকেই নিজেকে পড়তে হবে। বাড়িতে প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর লেখা অভ্যেস করা দরকার। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সত্তর ভাগ তাগিদ থাকা চাই ছাত্রের। কুড়ি ভাগ শিক্ষকের। বাকি পরিবেশের। শিক্ষকরা সাহায্য করবেন। উসকে দেবেন। কিন্তু মূল দায়িত্ব ছাত্রদের। এটি আমার সুদীর্ঘকালের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা।" বর্তমান পরীক্ষাবর্ষ বদলের সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন করেন। তাঁর মতে, "এতে ছাত্রদের উপকার হবে।"

প্রধানশিক্ষকের বিষয় অঙ্ক। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, "অঙ্কে উন্নতি করতে গেলে

ছাত্ররা হাতে-কলমে শিখছে

ছাত্রকে চিন্তা করতে হবে। যতক্ষণ না ভাবনা-চিন্তা করছে ততদিন গণিতে তার কোনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করলে যান্ত্রিকভাবেই সে অঙ্ক করতে পারে। কিন্তু তার প্রকৃত উন্নতি হবে না। সহ-প্রধানশিক্ষক অশোককুমার ঘোষের বিষয় বিজ্ঞান। তিনি জানালেন, "অ্যানালেটিক্যালি না পড়লে কিছু হবে না। পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত এই দুইয়ের মাধ্যমেই বিজ্ঞান পড়া উচিত। আর প্রয়োজন হাতেকলমে পরীক্ষা।" জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক রমেন্দ্রকুমার ঘোষ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সংযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলেছেন। মৃণালকান্তি কোলে রসায়নের শিক্ষক। তাঁর বক্তব্য, "খুঁটিনাটি জিনিস জানতে হবে। একাধিক বই দেখতে হবে।" পদার্থবিদ্যা কীভাবে পড়া উচিত, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষক তাপস দত্ত জানিয়েছেন, "প্রবলেম সলভের ওপর জোর দিতে হবে, সহজ মডেল তৈরি করে তা দেখে পড়লে উপকার পাওয়া যাবে। টেক্সট বইয়ের সঙ্গে রেফারেন্স বইও পড়া দরকার। মডেল কোয়েশ্চেনস দেখে উত্তর লেখা অভ্যেস করতে হবে।" ইংরেজি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন শিবপ্রসাদ মিশ্র, "ইংরেজির বর্তমান সিলেবাস ভাল। কারণ ডিরেক্ট মেথড অনেক প্রাকটিক্যাল। কিন্তু ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের আগে থেকেই ভীতি থেকে যায়। অভিভাবকদেরও অনীহা রয়েছে। এসব দূর করতে গেলে নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগেরও প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে সপ্তাহে দু'-তিনটি স্পেশ্যাল টিউটোরিয়াল ক্লাস করা দরকার। তা ছাড়া আলাদা কোনও গ্রামারের বই নেই। এটি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই খারাপ। ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডির ওপরও ভাল সহায়ক-গ্রন্থ দরকার।" ভূগোলের শিক্ষক বিজয়কুমার মল্লিকের মতে, "এখন প্রশ্নের যা ধারা হয়েছে তাতে যে-কোনও পাতার যে-কোনও লাইন থেকে প্রশ্ন হতে পারে। সেইজন্য মানচিত্র অনুসরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে। প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে এগোতে হবে। শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

একটা স্বপ্নকে বুকে বয়ে দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি হাই স্কুল দুরূহ পথ অতিক্রম করে চলেছে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাতে শামিল। শিক্ষকদের খোলাখুলি বক্তব্য, "স্কুল খানিকটা এগিয়েছে। কিন্তু যতটা যাওয়া উচিত ছিল তা যায়নি। কারণ, ছাত্ররা বেশিরভাগ আসে দুস্থ পরিবার থেকে। তাদের চাষবাসের কাজ করতে হয়। ফলে স্কুলে কামাই হয়। পড়াশুনাও সব সময় ঠিকমতো করে উঠতে পারে না। তবে আমরা আশাবাদী।" তাঁদের প্রেরণা স্থানীয় সাধারণ দীন-দরিদ্র মানুষ, শত কষ্টের মধ্যেও সব সময় যাঁরা হাসিমুখে স্কুলের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অঞ্জন সিকদার

ফোটো : অরূপ মিত্র

দাঁড়ানোর ভঙ্গি 'সানচিন দাচি'

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

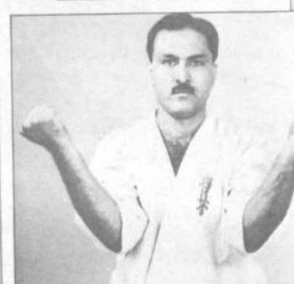

হাতের আঙুলের জোর কীভাবে বাড়ানো যায় ও কীভাবে মুঠো শক্ত করা যায় সে বিষয়ে আমি গত তিনটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবার আমি কিওকুশিন ক্যারাটের দাঁড়ানোর বিশেষ একটি ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন মার্শাল আর্টে দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো এক-একরকম। কুংফু (চিন), তাইকোনডু (কোরিয়া) এবং ক্যারাটে (জাপান)—এ-সবই মার্শাল আর্ট। কিন্তু এই মার্শাল আর্টে দাঁড়ানোর ভঙ্গি আলাদা আলাদা। কিছু ক্ষেত্রে মিলও যে পাওয়া যায় না, তা নয়। কুংফু, তাইকোনডু ও ক্যারাটের নানা ঘরানা ও স্টাইল আছে। আবার ক্যারাটের বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে দাঁড়ানোর ভঙ্গির কিছুটা মিল পাওয়া যেতে পারে।

ক্যারাটেতে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ভঙ্গিতে দাঁড়াতে না পারলে বা তা ঠিকমতো অভ্যাস না করলে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হবে না, প্রতিআক্রমণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ফলে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই ক্যারাটের দাঁড়ানোর ভঙ্গিগুলো বেশ ভালভাবে অভ্যাস ও অনুশীলন করা উচিত। এটা করতে পারলে শরীরের বিভিন্ন পেশী শক্ত ও সবল হবে। শরীরের ভারসাম্য রাখার ক্ষমতাও বাড়বে। ক্যারাটের সময় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া সহজ, সুন্দর ও সাবলীল হবে।

এবার কিওকুশিন ক্যারাটের বিশেষ একটি দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করছি। ভঙ্গিটির জাপানি নাম হল 'সানচিন দাচি'। দু' পা প্রথমে কাঁধ সমান ফাঁক করে দু' পায়ের ওপর শরীরের ওজন সমানভাবে রেখে হাত দুটো শরীরের দু'পাশে রাখতে হবে। মুঠো শক্ত করে শরীরটাকে টানটান করে দাঁড়াতে হবে। হাত দুটো কনুই থেকে একটু মুড়ে থাকবে। ক্যারাটে অনুশীলনের সময় প্রথমে এভাবেই দাঁড়ানো উচিত। বিভিন্ন কৌশল ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি অভ্যাস করার সময় যখন যেভাবে দরকার সেভাবে নড়াচড়া করতে হবে। সানচিন দাচি অভ্যাস করার আগে দুটো হাঁটু একটু মুড়ে দাঁড়ানো উচিত।

তাতে দ্রুত নড়াচড়া করা যায়। এই অবস্থাটাকে জাপানি ভাষায় বলে 'ইওইদাচি'। ইংরেজিতে এটাকেই বলা হয় 'রেডি স্টান্স'। এবার প্রথমে হাত দুটোকে কনুই থেকে মুড়ে বুকের দু'পাশে আনতে হবে। ডান পাটাকে সরিয়ে বাঁ পায়ের কাছে আনো। দেখতে হবে ডান পায়ের গোড়ালি যেন বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করে। তারপর হাত দুটোকে একই অবস্থায় রেখে ডান পাটাকে বাইরের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দু' পায়ের পাতার মধ্যে মোটামুটি যেন দু' ফুটের মতো ফাঁক থাকে। পায়ের গোড়ালি দুটো একই জায়গায় রেখে পায়ের আঙুলগুলো ভিতর দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরিয়ে রাখতে হবে। এবার হাত দুটোকে বুকের দু'পাশ থেকে এনে সামনের দিক থেকে অনেকটা ইংরেজি 'X' অক্ষরের মতো করে, (ডান হাত বাইরে, বাঁ হাত ভিতরে) বেশ জোরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো শরীরের সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনে, ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যেন কনুই দুটো শরীরের কাছাকাছি ও মুঠো দুটো শরীরের থেকে একটু দূরে থাকে। যখন শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় আনা হচ্ছে, তখন পেটের পেশী ও নিতম্বের পেশী শক্ত করতে হবে। প্রতিদিনের অভ্যাসে আস্তে-আস্তে এটা সহজ হয়ে উঠবে। তারপর আবার শুরুর অবস্থায় ফিরতে হবে। তখন ডান পাটাকে আবার বাঁ পায়ের কাছে এনে, আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসবে এবং হাত দুটো মুখের সামনে ইংরেজি X অক্ষরের মতো করে এবং পরে নামিয়ে শরীরের দু'পাশে আনতে হবে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন খেয়াল রাখতে হবে, যেন শরীরের ওজন দু' পায়ের ওপর সমানভাবে থাকে এবং একটি সরলরেখা টানলে বাঁ পায়ের আঙুল এবং ডান পায়ের গোড়ালি যেন সেই সরলরেখা স্পর্শ করে।

ফোটো : উৎপল সরকার

গাবলু
আইস
আইসক্রিম
একটা সোডা... দুটো নল, আসছি!
এত বড় আস্পদ্দা!
তুমি ওই গাবলুর মতো ভদ্রলোক হতে শেখো না কেন?
5-31

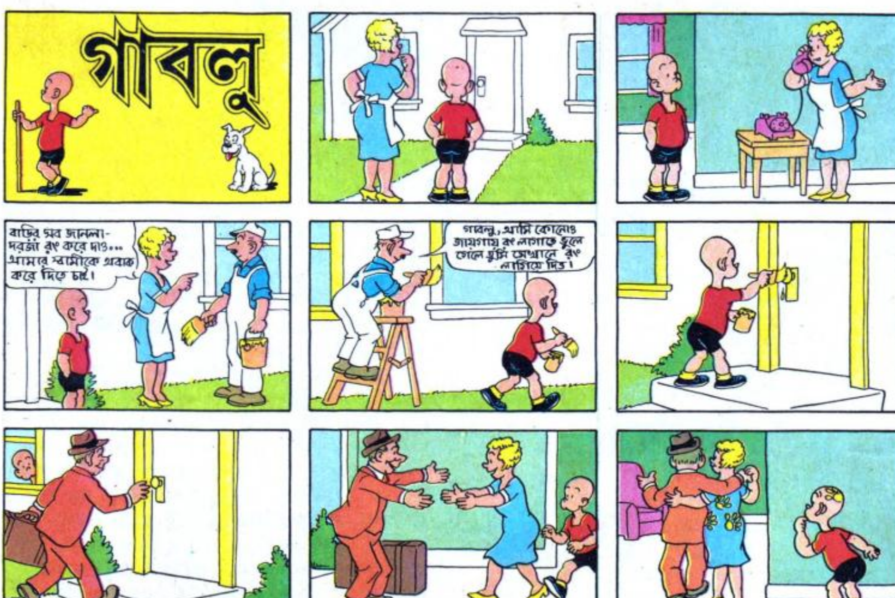

গাবলু
বাড়ির সব জানলা-দরজা রং করে দাও... আমার স্বামীকে অবাক করে দিতে চাই।
গাবলু, আমি কোনোও জায়গায় রং লাগাতে ভুলে গেলে তুমি সেখানে রং লাগিয়ে দিও।
8-30

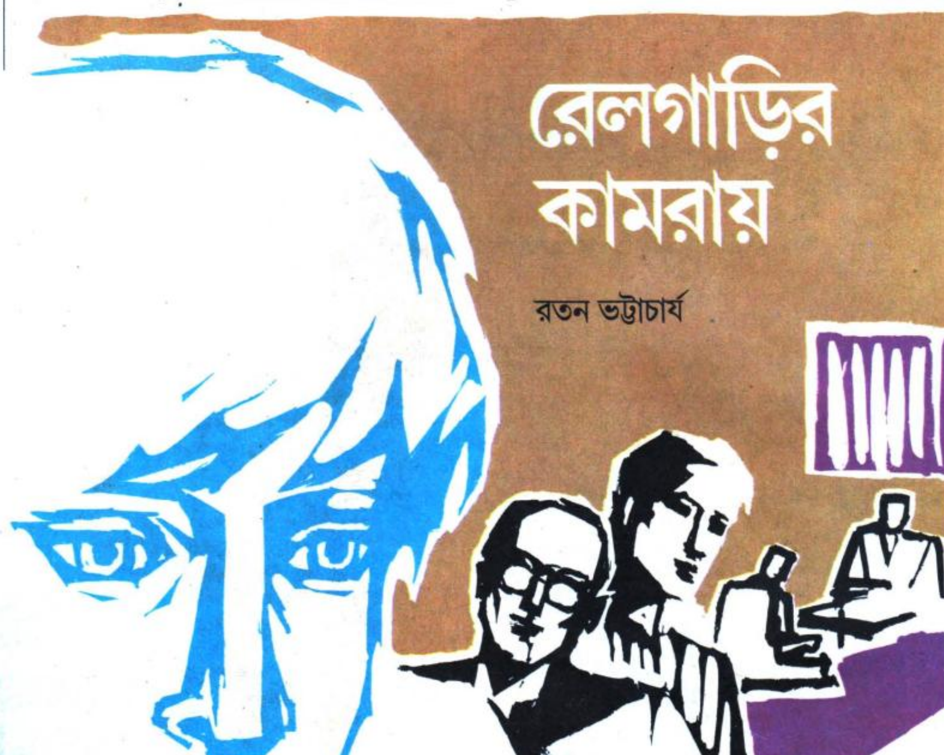

রেলগাড়ির কামরায়

রতন ভট্টাচার্য

এই আমার প্রথম বাইরে যাওয়া। আমাদের গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। এমনকী, কলকাতা পর্যন্ত না। কলকাতা আমাদের গ্রাম থেকে বাসে এক ঘণ্টার রাস্তা। বাসও অনেক। তবু যাওয়া হয়নি আমার। সেই আমি হঠাৎ চলেছি একেবারে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে। আমাদের গ্রামের মুজিবরদা রায়পুরে থাকে। সে-ই নিয়ে যাচ্ছে আমায়।

মা একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, "ছোট ছেলে। ও কি সবাইকে ছেড়ে অতদূরে গিয়ে থাকতে পারবে?"

মা যেতে দেবেন না মনে করে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিলুম, "হ্যাঁ পারব। খু-উ-ব পারব।" মুজিবরদা বলেছিল, "দু-একদিন মন খারাপ হবে বউদি। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। সত্য তো তেমন ছোট নয়। ষোলো-সতেরো নিশ্চয় হল। যাদব-জরিঅলার কারখানায় ওর চেয়ে ছোট ছেলেরা আছে। এখানকারই ছেলে সব। এই তো গেল বছর রঘুনাথ বাগের ছেলেটাকে নিয়ে গেলুম। বারো বছর বয়েস। আমি দোনোমোনো করেছিলুম। সে-ছেলে সেখানে গিয়ে এখন দিব্যি আছে।"

মুখ ভার করে মা বলেছিলেন, "পারবে বলছ ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। পারবে। সত্য পারবে। তুমি থাকতে পারবে কি না তাই ভাবো।" বলে মুজিবরদা হেসে ফেলেছিল। "তোমার কোনও ভয় নেই বউদি। আমি আছি। গ্রামের আরও সব ছেলে আছে। ওর একটুও কষ্ট হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ওকে ছেড়ে দিতে পারো।"

মা তারপরেও জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার কারখানার সব ছেলে এই গ্রামের ?"

মুজিবরদা বলেছিল, "হ্যাঁ, এই গ্রামের। এই গ্রামের মানে এখানকার আশপাশের সব গ্রামের। মেলো, ধুনকি, হাটবাসুদেবপুর, তেহট্ট।"

মায়ের একদম ইচ্ছে ছিল না আমাকে পাঠান। আমি এখানেও জরির কারখানায় কাজ করি। তবু শেষ পর্যন্ত মা যে আমায় পাঠালেন তার আসল কারণ হল টাকা। আমাদের গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের জরির কারখানাগুলোতে মজুরি বড্ড কম। কাজ করতে হয় বারো-চোদ্দ ঘণ্টা। সেখানে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে মজুরি হল ডবল এবং কাজের সময়ও বাঁধাধরা। দশ ঘণ্টা। কাজের সময় নিয়ে মায়ের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। মা পাঠাচ্ছেন টাকার জন্যে। আমি একটু বেশি টাকা দিতে পারলে সংসারে সুসার হবে।

এক বছর আগে আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। আমার বাবা ছিলেন এ-তল্লাটের নামকরা কাঠের মিস্ত্রি। সব বড়-বড় বাড়ি থেকে বাবার ডাক আসত। বাবুদের মতো অনেক টাকা বাবা আয় করতেন না। কিন্তু সংসার চলে যাচ্ছিল। আমি ক্লাস নাইনে পড়তুম। দাদা স্কুলে পড়েনি। তাকে ছেলেবেলা থেকে কাজ শিখিয়ে বাবা ভাল মিস্ত্রি করে দিয়েছিলেন। আমার দাদার বিয়েও হয়ে গেছে। দাদার পরে যে আমার দুটো দিদি তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। বাবাই করে গেছেন এসব কাজ। বাবার ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হই। তাই আমাকে হাতের কাজ শেখাননি। প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ হলে হাই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পড়াশুনায় খারাপ ছিলাম না। মানুষ না হই, লেখাপড়াটা হয়তো শিখতে পারতাম। কিন্তু শেখা হল না বাবার জন্যে। বাবা বাদ সাধলেন। গত বছর পুজোর সময় হঠাৎ মারা গেলেন বাবা। পুজোর সময় কাজ ছিল না। সকালবেলা চা খেয়ে বাবা উঠোনে গাঁদা ফুলের চারা বসাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় বুকে হাত চেপে ধরে অজ্ঞান। জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। ডাক্তারবাবু এসে নাড়ি টিপে বলেছিলেন,"ফিনিশ। নেই।"

বাবা মারা যাবার দু-এক মাসের মধ্যে মায়ের সঙ্গে বিবাদ করে দাদা বাড়ি ছেড়ে আলাদা হয়ে উঠে গেল। আমরা পড়লুম অকূল পাথারে। বাধ্য হয়ে আমাকে স্কুল ছেড়ে ঢুকতে হল জরির কারখানায়।

সাধারণভাবে কারখানা বলতে যা বোঝায় জরির কারখানা কিন্তু সেরকম কিছু নয়। এ হল আমাদের এদিককার গ্রামগুলোর একপ্রকার কুটিরশিল্প। জর্জেট শাড়ির থানের ওপর জরির কাজ। দড়ির খাটিয়ার মতো আয়তনের বড়-বড় কাঠের ফ্রেমে জর্জেট শাড়ির থান টান করে বেঁধে সুচ দিয়ে সেলাই করে জরি বসাতে হয়। কাঠের এই ফ্রেমগুলোকে বলে ঢাড্ডা। একটা ঢাড্ডার চারপাশে পাঁচ-সাত জন ছেলে বসে জরিগুলি বসায়। সাধারণ সুচ নয়; আরির সুচ। কলমের মাথায় নিবের মতো সুচটাকে একটা কাঠের মুটিয়ায় ঢুকিয়ে সেলাই করা হয়। শুধু জর্জেটের থান নয়, সিল্কের ঘাঘরা এবং পিলার ওপরেও জরির কাজ করেছি আমরা। পিলা জিনিসটা যে কী তা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। ওস্তাগরের মুখে শুনেছি পিলা নাকি বিয়ের সময় লাগে। বিয়ের লজ্জাবস্ত্র। এসব ঘাঘরা, পিলা, শাড়ি কোনওটাই আমাদের বাঙালিদের জন্য নয়। দু-একজন শখ করে পরলেও পরতে পারে। কিন্তু জিনিসগুলো বানান হয় রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাইয়ের মেয়েদের জন্য। শুনেছি আরব দেশেও নাকি যায়।

আমি রায়পুরে যাব কারখানায় কাজ করব তার নাম যাদব জরিঅলা। ওখানকার সব কারখানার মালিকেরাই নাকি পদবি হারিয়ে জরিঅলা হয়ে গেছে। যেমন বিমল জরিঅলা, তিলক জরিঅলা। জরিঅলা শুনে আমি হেসে ফেলায় মুজিবরদা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। মুজিবরদা ওই কারখানার ম্যানেজার। আমাদের গ্রামে তার বাড়ি। দিন-পনেরোর জন্য বছরে একবার করে সে গ্রামে আসে এবং দুটো-চারটে করে ছেলেকে রায়পুরে নিয়ে যায়। গেলবার নিয়ে গিয়েছিল রঘুনাথ বাগের ছেলে গৌতম বাগকে। এবার আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। আমাদের গ্রামের জরির কারখানাগুলোর সব ছেলে রায়পুর কিংবা বোম্বাই যাবার কথা ভাবে। স্বপ্ন দেখে। বোম্বাইতে আবার রায়পুরের চেয়ে বেশি মজুরি। যায়ও দু-চার জন। কিন্তু বেশির ভাগই যেতে পারে না। যেতে পারে না টাকার অভাবে। আমি জানি না ভাড়া কত। শুনেছি অনেক টাকা। দেড়শো-দুশো হয়ে যাবে। কোথায় পাবে জরির কারখানার ছেলে অত টাকা ? আমি কিন্তু কোনওদিন রায়পুর অথবা বোম্বাই যাবার কথা ভাবিনি। অথচ আমার ভাগ্যেই শিকেটা ছিঁড়ল।

ছেলেবেলার কথা আমার খুব আবছা মনে পড়ে। কাচের পাত্রে আঁকা একটা আস্ত ছবি পড়ে গিয়ে ভাঙলে যেমন হয় আমার ছোটবেলার ছবিগুলো ঠিক তেমনি ভাঙা ও টুকরোমতো। যেন বাউল বৈরাগীর আলখাল্লার নানা রঙের তালি। মনে পড়ে মা আমায় খাইয়ে দিচ্ছেন। মা বলছেন, "হাঁ কর, হাঁ কর।" আমি চোখ বুজে হাঁ করে আছি। মা আমার মুখের মধ্যে ভাতের গেরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। ওই একখানা বড় ছবির ভাঙা টুকরো একটু। মনে পড়ে একবার বাবা একমাসের জন্য দূরে কোনও বাবুদের বাড়ি কাজে গিয়েছিলেন। একমাস বাদে সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে বাবা আমায় কোলে তুলে আমার হাতে একটা নতুন চকচকে রবারের বল দিয়ে বলেছিলেন, "তোর জন্যে এনেছি। খেলিস।" বাবা মারা গেছেন। কিন্তু সেই নতুন বলের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে আমার। আমাদের প্রাইমারি স্কুল ছিল সরকারবাবুদের দালানে। তখনও একতলা নতুন বাড়িটা হয়নি। সরকারবাবুদের দালানটায় মানুষ-সমান উঁচু-উঁচু জানলা ছিল অনেকগুলো। একটু বৃষ্টিতেই জানলার নীচে জল দাঁড়িয়ে যেত। একদিনের কথা মনে পড়ে। সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। হচ্ছে তখনও। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কত ছেলে জামার নীচে বইখাতা ঢুকিয়ে ছুটতে-ছুটতে বাড়ি চলে গেল। আমি শুধু একলা চুপচাপ একটা জানলায় বসে নীচে জমে যাওয়া জলের দিকে তাকিয়ে বুঁদ হয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনে যাচ্ছি। ছোট বয়সের এইসব স্মৃতি। গ্রামের গাছপালা, আকাশ, মাঠ, আমার মা, সবাইকে ছেড়ে কে জানে আমি কোথায় চললুম। মধ্যপ্রদেশ কথাটা স্কুলে ভূগোলের বইতে পেয়েছি। রায়পুরের কথা শুনেছি জরির কারখানার ছেলেদের মুখে। শুধু এইটুকু। এ ছাড়া জায়গাটা সম্পর্কে আমার আর কোনও ধারণা ছিল না। অথচ আমি ভয় পাইনি। একটুও কষ্ট হচ্ছিল না আমার। মা শুধু-শুধু ভাবছিলেন আমার জন্য। সতেরো বছর বয়েস হল। আমি কি আর সত্যি সেরকম ছোট আছি!

আমাদের ট্রেন ছাড়ল রাত্তির সাতটা পঁয়তাল্লিশে। উত্তেজনায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। জীবনে এই প্রথম ট্রেনে চাপলুম। ট্রেন দেখেছি। আমাদের গ্রামের আড়াই মাইল দূর দিয়ে লাইন গেছে। স্কুল পালিয়ে একবার আড়াই মাইল হেঁটে গিয়ে লাইন ও ট্রেন দেখে

এসেছি। কিন্তু চড়িনি। তাই ট্রেন ছাড়তে বুকের মধ্যে যেন কীরকম করে উঠল। অজানা ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। খুব হালকা লাগছিল। মনে হল আমার কোনও ওজন নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমাদের গ্রামের সোজাসুজি সেই জায়গাটাকে অনুমান করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারা গেল না। অন্ধকার। পরদিন সকাল দশটায় রায়পুর গিয়ে পৌঁছলুম।

॥ ২ ॥

কারখানার মালিক যাদব জরিঅলাকে দেখে আমার একদম ভাল লাগল না। লোকটা এমনিতে দেখতে খারাপ না। ছিপছিপে চেহারার মানুষ। লোকটার মাথায় টাক আর কানে চুল। সরু ফ্রেমের একটা চশমা আছে। সেটা সবসময় নাকের নীচের দিকে ঝুলে থাকে। কথা বলবার সময় চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ওই চোখ দুটোই আমার ভাল লাগল না। উনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিলেন। আদ্দির পাঞ্জাবি। ওরকম দামি ধুতি-পাঞ্জাবি কালীপুজোর দিন আমাদের গ্রামের সরকারবাবুদের পরতে দেখেছি। যাদব জরিঅলা ধুতির কোঁচাটা উলটে কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছিলেন। আমার মনে হল মানুষটা খুব ছটফটে। গলায় একটা সোনার হার ছিল। সেই হারের সঙ্গে আটকানো ছিল একটা স্টিলের দাঁত-খোঁটা। সেইটে দিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাঁ, তো ইয়ে লেড়কা! মুজিবকো নয়া চিড়িয়া। কাজটাজ জানে তো মুজিব? না কি ঘুমতে চলে এল।"

"কী যে বলেন শেঠজি। পকেট থেকে গাড়িভাড়া খরচ করে আমি ঘুমাতে নিয়ে আসব।" কাজ করতে করতে মুখ তুলে মুজিবরদা হাসল। "জরির কারখানায় এক বছর আছে। সব কাজ শিখে নিয়েছে। হাতের কাজও পরিষ্কার।"

"কী নাম আছে তোর?" জরিঅলা আমাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বাংলাটা শুদ্ধ নয়। 'ছ' এর জায়গায় 'স' বললেন। আছে না বলে বললেন আসে। "কী নাম আসে তোর?"

আমি কিছু বলার আগেই মুজিবরদা বলে উঠল, "ওর নাম সত্য, সত্যকাম পাল।"

যাদব জরিঅলা বললেন, "শুনা হ্যায়, তোমার দো ছোকরাকো পুলিশ পাকড়েছিল?"

মুজিবরদা অবাক হয়ে বলল, "পুলিশ!"

"হাঁ-হাঁ পুলিশ। তুম নেই থে, ও দোনো সিনেমা দেখনে গিয়া নাইট শো মে। ব্যস্! ফিরবার সময় পুলিশ পাকাড় লিয়া।"

যাদব জরিঅলার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার বোধ হয় আমার রায়পুর আসার চারদিনের মাথায় হয়েছিল। উনি ছিলেন না। যেদিন আমরা এলাম সেদিনই সকালবেলা উনি গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে বোম্বাই চলে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে ফিরেছেন। ফিরে আজ সকালে এসেছেন কারখানায়। মুজিবরদা বোধ হয় পুলিশের ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল, উনি একটা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "ছোড়ো ইস্ বাত কি। ভক্কাকো পেমেন্ট দেনেকো কেয়া হোগা?"

মুজিবরদা বললেন, "ভক্কা-ভাইয়ের পেমেন্ট তো দিতে হবে।"

"দিতে হবে ঠিক বাত। লেকিন রুপিয়া কাঁহা?"

"কেন? আপনি টাকা আনেননি?"

"কোই দেগা তব্ তো আনব। কোইভি রুপিয়া নেহি দিয়া।"

গম্ভীর গলায় মুজিবরদা বলল, "ভক্কা-ভাই কিন্তু রাগ করবে। সপ্তাহে-সপ্তাহে পেমেন্ট হচ্ছিল। আপনি বললেন, না, মাসে-মাসে হবে। এখন এক মাস হয়ে গেছে। ও টাকা না পেলে খুব রেগে যাবে।"

একটু ঝাঁঝের সঙ্গে যাদব জরিঅলা বললেন, "হুঁ, রেগে যাবে। রেগে যাবে তো কী হল? টাকা মিলবে তব্ তো আমি টাকা দিব?" একটু থেমে নরম গলায় বললেন, "চলো। এক দফে ভক্কাকো সাথ ভেট করে আসি।"

মুজিবরদা বললেন, "না যাদবজি, আমি এখন যেতে পারব না। যেতে হলে রাত্তিরে যাব। এখন গেলে কাজ নামাতে পারব না। আপনি তো আবার কালই বোম্বাই যাবেন। কাজ না নামলে কী নিয়ে যাবেন?"

সমস্ত ঘর জুড়ে মাদুর পাতা। মাদুরের ওপর চারখানা ঢাড্ডা ফেলে আমরা কুড়িজন ছেলে মাথা নামিয়ে কাজ করে চলেছি। কারখানা-ঘরে প্রায় সবসময় রেডিওতে হিন্দি গান বাজে। এ-ঘরেও বাজছিল। যাদব জরিঅলা এসে পড়ায় রেডিওটা কমানো আছে। বাজছে, কিন্তু খুব আস্তে করে। মুজিবরদা কাজ করতে-করতে কথা বলছে। কাজ করতে-করতে কথা বলায় অসুবিধে নেই। শুধু সর্বক্ষণ কাজের দিকে চোখ রাখতে হবে। তাই মুজিবরদা যখন মুখ তুলে জরিঅলার দিকে তাকাচ্ছে, তখন হাত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কথা বলিনি, শুনছি। আমাদের হাত একবারও বন্ধ হয়নি, কিন্তু এবারে হল। মুজিবরদার কথা শুনে আর কারও নয়, আমার হাত বন্ধ হয়ে গেল। ভারী খটকা লাগল আমার। বোধ হয় আমি নতুন বলেই।

মুজিবরদা জানল কী করে যাদব জরিঅলা আবার কাল বোম্বাই চলে যাবেন? জরিঅলা কাল রাত্রে বোম্বাই থেকে ফিরেছেন। আজ সকালবেলা সর্বপ্রথম কারখানায় এলেন তিনি এবং এই অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে একবারও বলেননি বোম্বাই যাবার কথা। তা হলে মুজিবরদা বলল কী করে? আর কথাটা যে ভুল নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় জরিঅলার মেনে নেওয়ায়। কী করে জানল মুজিবরদা? খুব রহস্যপূর্ণ লাগল ব্যাপারটা আমার। আড়চোখে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম সবাই নির্বিকার। কথাটা শুনে আর কারও কোনওরকম খটকা লাগেনি। নির্বিকার চোখ নামিয়ে দ্রুত হাত চালিয়ে চলেছে সবাই। আমিও শুরু করে দিলাম। কিন্তু মনের থেকে খটকার কাঁটাটাকে সরাতে পারলাম না। সত্য না জানায় নানারকম কল্পনা করতে লাগলুম। বোম্বাই থেকে কি মুজিবরদাকে চিঠি দিয়েছিলেন জরিঅলা? অথবা কাল রাত্রে ফিরেই কি মুজিবরদাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? একটু সময় ভাবতেই চিঠির ব্যাপারটা আপনাআপনি বাতিল হয়ে গেল। কেননা আমরা যেদিন রায়পুর এলাম সেদিনই ভোরে জরিঅলা বোম্বাই যান। আমরা এসেছি মোটে চারদিন। চারদিনের জন্য গিয়ে বোম্বাই থেকে কেউ চিঠি দেয় না। দিলেও সে-চিঠি চারদিনে আসবে না। আজকাল সাত-আটদিনের আগে কোনও চিঠি কোথাও যায় না। আসানসোলে আমার মাসি থাকে। হাওড়া থেকে আসানসোল এমন-কিছু দূর না। তিন-চার ঘণ্টার রাস্তা। সেই আসানসোল থেকে হাওড়ায় চিঠি আসতে সাত-আটদিন লেগে যায়। অতএব চিঠির কল্পনা বাতিল। রইল তা হলে রাত্রে মুজিবরদাকে ডেকে নেবার ব্যাপারটা। হয়তো তাই নিয়েছে। মনে-মনে সিদ্ধান্তটাকে পাকা করে ফেললুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টার গা থেকে রহস্যটা উঠে গেল না। খটকাটাও রয়ে গেল।

যাদব জরিঅলা আর কথা বলেননি। দেওয়াল-আলমারি থেকে অনেকগুলো খাতা নামিয়ে কীসব দেখছিলেন। কাউকে কিছু বললেন না। শুধু খাতাগুলোর পাতা উলটে-উলটে দেখলেন। খাতাগুলো যে ব্যবসার হিসেবপত্রের সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল না। দেখা হয়ে

যেতে বন্ধ করে খাতাগুলো আবার জায়গামতো তুলে দিয়ে বললেন, "তব্ ঠিক হ্যায়। ভক্কার কাছে রাত্রিবেলা যাবে।" দাঁত খোঁচানো বন্ধ ছিল এতক্ষণ। এখন আবার হারটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে স্টিলের দাঁত-খোঁটাটা খুঁজে বার করে হাতে নিলেন। বললেন, "তো আপলোগ সব জলদি-জলদি কাম খতম করো। হামি একদফে ব্যাঙ্কসে ঘুমকে আতা।" দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে উনি ঘর থেকে রকে গেলেন এবং তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। কাঁধের ওপর ধুতির কোঁচা উলটে আগের মতোই ফেলা। সিঁড়িতে ওঁর স্যান্ডেলের ফটরফটর আওয়াজ উঠল। আমার ভারী হাসি পাচ্ছিল। বেরোবার আগে শেষ কথাটা উনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। আপলোগ মানে আপনি। আমাকে কেউ আপনি বলতে পারে বা আমাদের বয়সের কাউকে, আমার ধারণা ছিল না। উনি মুজিবরদাকেও একটু আগে বলেছেন তুমি। অথচ যাওয়ার সময় আমাদের বললেন আপনারা কাজ করুন। এই মজার আপনি শুনে আমার হাসি। তাই বলে বাচ্চাদের মতো হেসে ফেলিনি। শুধু মনের মধ্যে হাসি-হাসি ভাবটা ফুটে উঠেছিল।

জরিঅলার জুতোর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। তার অর্থ তিনি রাস্তায় নেমে পড়েছেন। মানুষটা হয়তো খারাপ না। ভাল। যাওয়ার সময় আমাদের আপনি বলে সম্মান করে গেলেন। কিন্তু কে জানে কেন আমার ভাল লাগল না। এরকম হয়। আমি আগে দেখেছি। কোনও কারণ নেই, তবু কাউকে কাউকে ভাল লাগে না। স্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাইকে আমার ভাল লাগত না। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। সকলে পছন্দ করত তাঁকে। কিন্তু আমার ভাল লাগত না। মাথা নামিয়ে কাপড়ের ওপর সুচ চালাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম। সেই অবস্থায় আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম পরিবেশটা যেন কীরকম থমথমে। কেউ কথা বলছে না। কারও মুখে হাসি নেই। যেন চারখানা ঢাড্ডা ঘিরে গোল করে বসে আছে কুড়িটা মানুষ নয়, কুড়িটা যন্ত্র। ঘরের মধ্যে জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদের মধ্যে ডাঁই করা আছে আমাদের কুড়িজনের বিছানা। একটা ময়লা চাদর দিয়ে বিছানাগুলো ঢাকা। ওদিকেই দেওয়ালের ওপর ক্যালেন্ডারটা হাওয়ায় অনবরত নড়ছে। একঘেয়ে দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগার শব্দ হচ্ছে একটা।

আরও কিছু সময় বাদে ঘরের থমথমে ভাবটা ভাঙল একটি ছেলে। আমি নাম জানি না। কুড়িজন ছেলের সকলের নাম ঠিক-ঠিক মুখস্থ হয়নি এখনও আমার।

একবার মনে হল ছেলেটির নাম মাসুদ। পরক্ষণেই মনে হল হায়দার। নাম যাই হোক, সে হঠাৎ ঘরের থমথমে ভাব ভেঙে দিয়ে বলে উঠল, "মুজিবভাই, শেঠ আমাদের হিসেবের কথা কিছু বলল না তো?"

মুজিবরদা যেন প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু অবাক হল না। ভুরু কুঞ্চিত হল না। মাথা নামিয়ে কাজ করতে-করতে বলল, "তোদের আবার কী হিসেব?"

"বাঃ! আমাদের হিসেব দিতে হবে না। কত টাকা পেলুম, কত টাকা খরচ, জরিঅলার কাছে কত টাকা জমা থাকল, সেসব হিসেব জানাতে হবে না আমাদের?"

"জেনে কী হবে? হাত পা গজাবে? তোদের এ-মাসে বাড়ি পাঠাবার জন্যে টাকা দেয়নি শেঠ?"

"দিয়েছে। সে তো সেই একশো টাকা।"

"হ্যাঁ। একশো টাকাই তো পাঠাবি। বোকার মতো বেশি পাঠাতে যাবি কেন?"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "বাড়িতে একশো টাকার বেশি পাঠাব না?"

মুজিবরদা কাজ থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না। কেন পাঠাবি? এই নিয়ে এই মুখ্যুগুলোর সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়েছে আমার। কামাইয়ের সব টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া মানে ভস্মে ঘি ঢালা। মনে রাখিস জরিঅলার কাছে যে টাকা জমছে সেটা তোর। তোর নিজের। ছুটিতে ঘরে গেলে সঙ্গে নিয়ে যাবি। ঘরে ফেরার সময় ভাইবোন, কুটুম-স্যাঙাতের জন্যে কিছু উপহার নিতে হবে না? সব যদি পাঠিয়ে দিস তখন কোথায় পাবি টাকা?"

কে একজন বলল, "তাদের কখনও একশো টাকায় চলে? দেশে ষাট-সত্তর টাকা হপ্তা পেয়েছি। তাতেও চলত না। বিদেশে এসে লাভ হল ভারী। ষাট-সত্তর টাকার জায়গায় হপ্তা হয়ে গেল পঁচিশ টাকা।"

"পঁচিশ টাকা হপ্তা হয়ে গেছে বলছিস!" মুজিবরদা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল। "কত বছর আছিস তুই রায়পুরে?"

"চার বছর।"

"তা হলে এই চার বছর ধরে শেঠের কাছে যা জমেছে তার দাবি ছেড়ে দিচ্ছিস তুই?"

আমাদের গ্রামের রঘুনাথ বাগের ছেলে গৌতম বাগ বলে উঠল, "শেঠের কাছে টাকা জমিয়ে লাভটা কী হচ্ছে? দেশে মা, ভাইবোন না খেয়ে মরে গেল আর এখানে আমরা টাকা জমাচ্ছি।"

মুজিবরদা একটু চটে গিয়ে বলল, "দ্যাখ গৌতম, এক বছরে তুই পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছিস। তারা মরে গেল বলে তোকে চিঠি দিয়েছে?"

"চিঠি আর কে লিখছে বলো মুজিবভাই। মা-বাবা কি লিখতে জানেন যে চিঠি লিখবেন। যদি-বা কাউকে ধরেটরে কখনও একটা চিঠি লেখেন, সে চিঠি তুমি পড়ে দাও আমাদের। আমরা কেউ পড়তে জানি না। চিঠিতে মরার খবর থাকলে সে-কথা কি আর তুমি আমাদের শোনাবে?"

মুজিবরদা এবারে আরও চটে গিয়ে বলল, "নে, নে। কাজ কর দিকিনি সবাই। একফোঁটা ছেলে সব। মেলা কথা শিখে গেছিস। হিসেবপত্র যা বুঝে নেবার শেঠ এলে বুঝে নিবি। আমি জানি না কিছু।"

মুজিবরদা চটে গেছে দেখে আর কেউ কোনও কথা বলল না। সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মুজিবরদা কিন্তু কাজ ধরল না। একটুখানি চুপ করে থেকে খুব গম্ভীর ভারী গলায় বলল, "সেখানে মজুরি কম। ভাল হবে মনে করে আমি তোদের নিয়ে এসেছি। যদি না পোষায় হিসেব বুঝে নিয়ে চলে যাবি। আমি কাউকেই আটকাব না। তোদের অভাবে জরিঅলার কারখানা উঠে যাবে না। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না, বুঝলি।"

সবাই চুপ। মাথা নামিয়ে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। রেডিওটা আস্তে করে বাজছিল। মুজিবরদার কথা শেষ হতেই কে যেন হাত বাড়িয়ে টুক করে বাড়িয়ে দিল আওয়াজটা। বেশ জোরে বিবিধ ভারতীর হিন্দি গান বেজে উঠল। মুজিবরদা ফিরে চেয়ে দেখল একবার। কিছু বলল না। এর পর আর কোনও কথাই হল না। আস্তে-আস্তে ব্যাপারটা যেন ভুলে গেল সবাই। যেমন হয়, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি শুরু হয়ে গেল। কাজের সঙ্গে চলল ঠাট্টা-ইয়ার্কি। এতক্ষণে যেন ঘরখানা জরির কারখানা হয়ে উঠল। হিন্দি গান, টুকটাক ঠাট্টা, খুনসুটি, তার সঙ্গে যোগ হল অল্পস্বল্প মুখ-খারাপ।

আমার মুখে খারাপ কথা আসে না। এ বোধ হয় আমার ন'বছর স্কুলে পড়ার ফল। এক বছর আগেও আমি স্কুলে পড়েছি ভাবলে

আমার বুকের মধ্যে যেন কীরকম করে ওঠে। একটু সময়ের জন্য আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এ-ঘরে যে-কুড়িজন ছেলে কাজ করছে তাদের একজন ছাড়া আমি বাকিদের চিনি না। শুধু জানি তারা আমাদের গ্রামের আশপাশের গ্রাম থেকে এখানে এসেছে। আর একটা জিনিস জানলুম এইমাত্র। ছেলেগুলোর একজনও লিখতে-পড়তে জানে না। স্কুলে পড়েনি। এমনকী,প্রাইমারিতে পর্যন্ত না। কাজেই ওরা যা পারবে আমি তা পারব না। গ্রামের কারখানাতেও আমি অন্য সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারিনি। গ্রামের কারখানায় তারা যখন নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করেছে, সিনেমার গল্প বা সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে রসিকতা করেছে তখন আমি মাথা নামিয়ে আমার স্কুলের দিনগুলোর কথা ভেবেছি। এখানে এখন চুপচাপ বসে আমি বাড়ির কথা ভাবতে লাগলুম। এ ক'দিন শুধু আমার মায়ের কথাই মনে পড়ছে। আসবার সময় মা বাসরাস্তা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছিলেন। আমার চুলে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বাস ছাড়লে ছলছল চোখে বাসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা। চারদিন হল এখানে এসেছি। সবসময় মায়ের কথা মনে পড়ছে। একটা ব্যাপারে খুব মজা পাচ্ছি ক'দিন ধরে। আমাদের গ্রাম ছেড়ে, মাকে ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছি আমি। মুজিবরদা বলেছিল, প্রায় সাড়ে ছশো-সাতশো মাইল। কিন্তু চোখ বুজলে এই দূরত্ব এক মুহূর্তে মুছে যায়। মা, আমাদের গ্রাম, আমার স্কুল, কারখানা, সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে। যেন তার মধ্যেই আছি। ইচ্ছে করলেই যেন ছোঁয়া যায় সকলকে। অথচ সত্যি-সত্যি তো আর তা হয় না। তখন ভীষণ মনখারাপ হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

তাই বলে আমি যে সর্বক্ষণ একটা কষ্টের মধ্যে আছি, তা কিন্তু নয়। মা আশঙ্কা করেছিলেন আমি তাঁক ছেড়ে থাকতে পারব না। পরে কী হবে জানি না, এ-চারদিন ভালই আছি। নিজের যাবতীয় কাজ নিজে করছি যা আগে কোনওদিন করিনি। অথচ কই, খুব একটা কষ্ট বা অসুবিধে হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। এখানে নীচে রাস্তার টাইম-কল থেকে জল তুলে ওপরে চান করতে হয়। এই ঘরের বাইরে যে রক, সেই রকের একপাশ ঘিরে চানের জায়গা। কোনও দিন কলের জল তুলেছি বলে মনে পড়ে না। কল টিপে খাবার জল বরাবর মা-ই এনেছেন। আমি পুকুরে চান করেছি। এখানে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে জল তুলতে বেশ কসরত করতে হয় আমাকে। মাঝ-সিঁড়িতে বালতি নামিয়ে বিশ্রাম করে নিতে হয় একটু। এমনকী, আমাদের গ্রামের গৌতম যে কিনা আমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট, সে-ও একবারে টেনে তুলে ফেলে। আমি পারি না। ব্যস, ওই একটা কাজই যা একটু শক্ত। আর তো কোনও কাজই নেই। জলখাবার নিয়ে চারবেলা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসা আর এই ঘরে সারাদিন ঢাড্ডা ফেলে বসে-বসে সুচ চালানো। সকাল আটটায় জলখাবার খেয়ে এসে বসি। মাঝখানে শুধু দু'বার বেরোতে পাই। একবার বারোটার সময় আর একবার চারটেয়। বারোটা থেকে এক ঘণ্টার ছুটি। তখন আমরা হোটেলে গিয়ে ভাত খাই। চারটের সময় আধ ঘণ্টা। তখন খাই চা। ছুটি হয় সাড়ে-সাতটায়। ওভারটাইম থাকলে রাত এগারোটা। ওভারটাইম প্রায় রোজ লেগে আছে। আমি তিনদিন দেখলুম। তিনদিনই ওভারটাইম হয়েছে। যে চারখানা শাড়ি আজ ঢাড্ডায় আছে, যদি তার কাজ শেষ করতে হয় তা হলে আজও ওভারটাইম হবে। একটু আগেই শুনলাম এ-কাজ আজই শেষ করতে হবে। কাল সকালের গাড়ি ধরে শেঠ বোম্বাই যাবেন।

এই একটা ব্যাপারে আমার কষ্টের কথা স্বীকারে দোষ নেই। আমি বরাবর ঘুমকাতুরে ছেলে। ছেলেবেলায় ঘুমের জন্য কতদিন রাত্রে

আমার খাওয়া হয়নি। এখানে ঘুমের খুব কষ্ট। রাত্তির এগারোটায় ঢাড্ডা তুলে হোটেল থেকে খেয়ে এসে আমাদের কুড়িজনকে এই ঘরেই শুতে হয়। আমাদের নীচে আছে একটা বড় তেলেভাজার দোকান। গাড়ি থামিয়ে লোক ওখান থেকে তেলেভাজা কেনে। আগে নাকি হোটেল ছিল। দিলবাহার হোটেল। দোকানটার মাথায় এখনও বড় করে নামটা লেখা আছে। ফলে দোতলা আমাদের এই কারখানা-বাড়িটার নামই হয়ে গেছে দিলবাহার হোটেল। মুজিবরদা নীচের ওই তেলেভাজা দোকানে শোয়। ঘুমের কষ্ট আমার একার না। আমাদের কুড়িজনেরই। রোজ এগারোটা-বারোটায় শুয়ে রাত চারটেয় ওঠা যে কী ভয়ানক শাস্তি তা কাউকে বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। আবার বারো-চোদ্দ ঘণ্টা ঢাড্ডার ওপর উপুড় হয়ে বসে কাজ করার পর।

হ্যাঁ, আমাদের সকলকেই প্রায় ভোর চারটেয় উঠতে হয়। সকালে আমাদের অনেক কাজ। হাত-মুখ ধোওয়া, কল থেকে জল তুলে চান। আটটায় জল বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেও আছে বস্তির মানুষের ভিড়। সবশেষে হোটেলে গিয়ে জলখাবার খাওয়া। ভোর চারটে থেকে আটটা, সকালবেলার এই চার ঘণ্টা যে কীভাবে হুশ করে কেটে যায় আমরা বুঝতে পারি না। এক-একদিন মনে হয় যেন নিশ্বাস ফেলারও সময় পাচ্ছি না। চারদিনেই যদি আমার এই অভিজ্ঞতা, তা হলে যারা এখানে তিন-চার বছর আছে তাদের অবস্থা কী তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

"এই সত্য, চুপ করে বসে কী ভাবছিস রে অত?" হঠাৎ মুজিবরদা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি চমকে উঠলাম। অপ্রস্তুত মুখে হেসে বললাম, "কী ভাবছি?"

"হ্যাঁ। আমি তো তাই জানতে চাইছি। সবাই কথা বলছে। তুই অমন গুম মেরে আছিস কেন ? বাড়ির কথা ভাবছিলি ?"

কিছু না বলে আমি হাসলাম। প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলাম যে, বাড়ির কথাই ভাবছিলুম।

মুজিবরদা বলল, "এখন কেমন ভিজে বেড়ালটি হয়ে আছিস। দু'দিন বাদে তুইও তো ওদের দলে ভিড়ে যাবি।"

কথাটা শুনে আমার কষ্ট হল। কিন্তু আমি উত্তর করলুম না। মাথা নিচু করে কাজ করে যেতে থাকলুম। উত্তর দিল গৌতম বাগ। বলল, "মুজিবভাই চায় আমরা সবাই চিরকাল ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকি।"

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একজন বলে উঠল, "বেশিদিন কেউ ভিজে বেড়াল থাকে না।"

মুজিবরদা এবারে আর রাগ করল না। চট করে প্রসঙ্গটা পালটে ফেলে বলল, "কাদের পুলিশ ধরেছিল ? শেঠ বলে গেল একটু আগে। কাদের ধরেছিল রে ?"

কে যেন বলল, "নিজাম আর রহমানকে।"

ঘরের শেষ ঢাড্ডায় বসে কাজ করছিল নিজাম আর রহমান। মুজিবরদাকে একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে হল, "এই রহমান, কী হয়েছিল রে ?"

রহমানটা একদম বাচ্চা। তেরো-চোদ্দর বেশি বয়স হবে না। সব সময় লুঙ্গি পরে থাকে বলে একটু ঢ্যাঙা দেখায়। মুখে এখনও গোঁফের রেখা পড়েনি। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বসে ছিল। কাজ থামিয়ে লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছে বলল, "নাইট শো-এ সিনেমা দেখে ফিরছিলাম, পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।"

"তখন কত রাত ?"

"দেড়টা হবে।"

"তোরা বলিসনি সিনেমা দেখে ফিরছি ?"

"বলেছিলুম। কিন্তু টিকিট দেখাতে পারিনি। টিকিট ফেলে দিয়েছি।"

"যাদব জরিঅলার নাম করিসনি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব করেছিলুম। তবু ধরে নিয়ে গেল। রাত্তিরটা আটকে রাখে। পরদিন জরিঅলা গিয়ে ছাড়িয়ে আনল।"

"জরিঅলা জানল কী করে ?"

"ওরা জরিঅলার বাড়িতে ফোন করেছিল।"

"তোরা বাঙালি ছেলেদের নাম ডোবালি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তোদের !"

সকলে মন খুলে হেসে উঠল। মুজিবরদা বলল, "ঠিক আছে। কাজ তাড়াতাড়ি নামা। শ্যাম টকিজে কী বই হচ্ছে ?"

তিন-চারজন একসঙ্গে বলল, "রুটি কপড়া ঔর মকান।"

মুজিবরদা বলল, "আজ সত্যকে নিয়ে আমরা রাত দশটার শো-এ রুটি কপড়া ঔর মকান দেখব। খরচপাতি আমার। আমি দেখাব সবাইকে।"

ফুর্তির একটা চাপা ঐকতান উঠল ঘরের মধ্যে। মুজিবরদা বলল, "আর আজ যদি পুলুশ আমাদের ধরে তা হলে তাকে দেখে নেব আমরা।" হাসাবার জন্য মুজিবরদা পুলিশ না বলে পুলুশ বলল। আমাদের গ্রামের অশিক্ষিত মানুষরা ওইরকম বলে। তারা পরোটাকে বলে প্যারোটা। মুজিবরদা পুলুশ কথাটা হাসাবার জন্য বলল এবং শুনে সকলে প্রাণখুলে হেসেও উঠল। আমিও হাসলাম। আমার

আরও বেশি আনন্দ হল এই ভেবে যে, আজ আমি একটা সিনেমা দেখব। এর আগে গ্রামের কারখানায় কাজ করবার সময় আমি মাকে লুকিয়ে তিনটে সিনেমা দেখেছি। এক বছরে তিনটে সিনেমা। খুবই কম। আবার সতেরো বছরে তিনটে সিনেমা দেখা আরও হাসির ব্যাপার। স্কুলে পড়ার সময় আমি কোনও সিনেমা দেখিনি। মা দেখেছেন। পাড়া-প্রতিবেশী বউ-ঝিদের সঙ্গে মা প্রায়ই যেতেন। কিন্তু আমি যাইনি। বাবার নিষেধ ছিল বলে মা নিয়ে যেতে পারতেন না। সিনেমা দেখতে যাওয়ার উত্তেজনায় আমার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। আমি কাজে মন দিতে পারলুম না। কাজ থামিয়ে আমি চট করে উঠে দাঁড়ালুম। পা ছাড়িয়ে নেবার জন্য অনেক সময় আমরা উঠে দাঁড়াই। আমি শুধু দাঁড়ালুম না। দু'পা হেঁটে মানুষসমান জানলাটার কাছে চলে গেলুম। বাইরে বেশ শুকনো খটখটে রোদে-ভরা দিন। রাস্তার উলটো দিকে মেয়েদের হাই স্কুল। এখনও স্কুল বসেনি। ছোট মেয়েরা রোদের মধ্যে স্কুলের সামনে মাঠে ছোটাছুটি করছে। স্কুলের বাঁ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বস্তি। মাথার ওপর নীল আকাশ। আর নীচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের অট্টালিকা। রাস্তা দিয়ে রিকশ, সাইকেল আর মানুষজন যাচ্ছে। কখনও ট্রাকও যাচ্ছে একটা-দুটো। আমার হঠাৎ মনে হল, নতুন জায়গায় এসে আমার যে মনখারাপ হয়নি তার কারণ বোধ হয় এই যে, এটা একটা শহর। গ্রাম হলে কী হত কে জানে। আমি আগে কখনও শহর দেখিনি। গ্রাম থেকেই বেরোইনি কোনওদিন তো শহর দেখব কী করে। ইলেকট্রিক লাইট দেখেছি। আমাদের নেই, কিন্তু গ্রামের বাবুদের পাকা বাড়িগুলোতে আছে। আমাদের গ্রামের বাজার এলাকাটা সকালে-বিকেলে অনেকটা শহরের মতো। গ্রামের পাশের হাই রোডে আমি বাস, ট্রাকও দেখেছি অনেক। এদের সবাইকে মিলিয়ে এক জায়গায় করলে যে শহর তা আমি আগে দেখিনি। প্রথম শহর দেখলুম বাড়ি থেকে বাসে উঠে হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার দিন। হাওড়া স্টেশনের অনেক আগেই হাওড়া শহরের শুরু। সেই শহরের ওপর দিয়ে যখন বাস যায় তখন আমি প্রথম শহর দেখলুম। বাস থেকে নেমে হাওড়ার ব্রিজ দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলুম আমি। ট্রেনে উঠে শুনেছিলুম ওই ব্রিজ পার হয়ে ওপারে গেলে নাকি কলকাতা। কলকাতা আমি দেখিনি। আমার দেখা প্রথম শহর এই রায়পুর। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে আমি শহরটাকে দেখতে লাগলুম। একটু বাদেই ঢংঢং শব্দে মেয়েদের স্কুলে ঘণ্টা বেজে উঠল।

॥ ৩ ॥

আজ রোববার। আজ আমাদের ছুটি। ছুটি থাকলেও বেলা অবধি ঘুমিয়ে থাকবার জো নেই। চান এবং কাচাকাচি ভোরেই করে নিতে হয়। না হলে জল পাব না। আটটার পর রাস্তার কলের জল বন্ধ। চানটান করে এসেছিলাম জলখাবার খেতে। হোটেলের নাম জুম্মান হোটেল। বেশ বড় হোটেল। একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশজন বসে খেতে পারে। ভোরবেলা থেকে ক্যাসেট বাজতে শুরু করে। চলে রাত একটা পর্যন্ত। আমাকে হোটেলের ছেলেগুলো চিনে গেছে। টেবিলে গিয়ে বসতেই প্লেটে করে দুটো গুলগুল্লা দিয়ে গেল। জিনিসটা আটা আর চিনি একসঙ্গে গুলে গরম তেলে ফেলে ভাজা। দেখতে গোল আলুর চপের মতো। আমার খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু কিছু বলা যায় না। হোটেলঅলার সঙ্গে জরিঅলার ব্যবস্থা ছেলেরা এখানে খাবে। মাসের শেষে একসঙ্গে টাকা দেবে জরিঅলা। আগে ছিল সপ্তাহে সপ্তাহে। এখন হয়েছে মাস। বলা যে যায় না তা নয়। বলা হয়তো যায়। বললে হয়তো অন্য-কিছু দেবে। হয়তো দু'খানা রুটি আর ডাল দিয়ে যাবে। কিন্তু আমার বলতে লজ্জা করে। ডিশের গুলগুল্লা দুটোকে একবার দেখে নিয়ে আমি হোটেলের চারদিকে তাকালুম। অনেক লোকজন বসে আছে। সকলের সামনেই প্রায় চায়ের কাপ এবং কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। দু-চার জনের সামনে দেখলুম কচুরি ও রুটি। আমার ডাল দিয়ে গরম রুটি খেতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলুম না। এমন সময় আমার চোখে পড়ল একদম দেওয়ালের কাছে একটা টেবিলে একলা গৌতম বাগ বসে আছে।

রঘুনাথ বাগের ছেলে গৌতম বাগের সঙ্গে আমার চেনাজানা ছেলেবেলা থেকে। আমাদের বাড়ি পাশাপাশি। পাশাপাশি মানে একটা বড় পুকুরের এপার-ওপার। ওর বাবা রঘুনাথ বাগ রিকশ চালায়। নিজের রিকশ নেই। অন্যের রিকশ তিন টাকা রোজে ভাড়া নিয়ে চালায়। লোকটা প্রত্যেকদিন রাত্রে নেশা করে বাড়ি ফেরে। তাই ওদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ। ও স্কুলের মুখও দেখেনি। একদম বাচ্চা বয়সে জরির কারখানায় ঢুকে যায়। এত চেনাজানা আমাদের, অথচ এখানে আসার পর কে জানে কেন ও তেমন আগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেনি। শুধু অবাক হয়ে গিয়েছিল পড়া ছেড়ে দিয়ে আমি জরির কাজ করছি শুনে। গৌতম জানত না আমার বাবা মারা গেছেন। আমার সঙ্গে অচেনার মতো ব্যবহার করায় আমিও ওর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করিনি। আমার মনে হত ও অহঙ্কার দেখাচ্ছে। জরির কাজ আমার অনেক আগে থেকে করছে বলে অহঙ্কার। কারখানায় কাজ করতে-করতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখেছি গৌতম আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে সঙ্গে-সঙ্গে মুখ নামিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাকানোটা আমার ভাল লাগেনি। বছর-তেরোর বেশি বয়েস হবে না ওর। খুব বেশি হলে চোদ্দ। কিন্তু চেহারায় আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছে। পাশাপাশি দাঁড়ালে ওকে আমার চেয়ে বড় দেখাবে। আর এই পরিবর্তনটা হয়েছে ওর এখানে আসার এক বছরের মধ্যে।

গৌতমও আমায় দেখেছিল। হঠাৎ টেবিল-চেয়ার ও লোকজনের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে ও আমার কাছে উঠে এল। আমার টেবিলের উলটো দিকে দুজন লোক ছিল। এক মুহূর্ত আগে তারা উঠে গেছে। উলটো দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ে গৌতম বলল, "গুলগুল্লা আজ ভাল না। গন্ধ। আমাকেও দিয়েছিল। আমি খেয়েছি। খেয়ে এখন কেমন যেন লাগছে।"

"পচা ?"

"হ্যাঁ।"

কিছু না বলে একটা গুলগুল্লা থেকে একটুখানি ভেঙে মুখে দিয়ে থুথু করে টেবিলের নীচে ফেলে দিলাম। বললাম, "হুঁ। পচা। তুই এই পচা খাবার খেয়ে নিলি ?"

"কী করব ? বাকিতে খাই।"

"তুই বাকিতে খাস, না জরিঅলার বাকি ? বাকিতে খেলেই-বা। পচা হলে বলতে হবে না ?"

"বললেই কি ওরা পালটে দিত নাকি ?"

"না পালটে দেয় খাব না। জরিঅলাকে বলব অন্য হোটেলে ব্যবস্থা করতে। তাই বলে পচা খাব ?" বলতে-বলতে আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমি জানতুম হোটেলের ছেলেদের কাউকে ডেকে বললে কাজ হবে না। বলতে হবে খোদ মালিককে। মালিক হল ভক্কা-ভাই। বেরোবার রাস্তায় আধখানা গোল কাউন্টারের মধ্যে বসে গম্ভীর মুখে গান শুনছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে গৌতম জিজ্ঞেস করল,

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"ভক্কা-ভাইয়ের কাছে ।"

গৌতম আঁতকে উঠল । ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ভক্কা-ভাইয়ের কাছে ? সে কী ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?"

"কেন ?"

"ও একটা খুনে । মারাত্মক লোক । ওর ড্রয়ারে দুটো রিভলভার আছে ।" উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে গৌতম বলল, "নিজের দাদাকে খুন করে ও এই হোটেলের মালিক হয়েছে । খবরদার যেও না ওর কাছে । আমরা কোনওকালে কেউ যাই না ।"

আমি খুব আস্তে করে বললাম, "আমি যাব ।" তারপর গৌতমের বাধা অগ্রাহ্য করে সোজা হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম কাউন্টারের সামনে । লোকটা একটা উঁচু টুলের ওপর বসে আছে । আমাকে দাঁড়াতে দেখে কী দরকারের ভঙ্গিতে ভুরু তুলে মুখে থমথমে বলল, "কেয়া বাত্ হ্যায়?"

ভক্কা-ভাইয়ের সারা মুখে বসন্তের দাগ । সেই দাগ দেখতে-দেখতে খুব আস্তে করে আমি বললুম, "গুলগুল্লায় গন্ধ হয়ে গেছে ।"

এত জোরে গান বাজছিল ভক্কা-ভাই শুনতে পেল না । হাত বাড়িয়ে গান ছোট করে দিয়ে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ?"

আমি আবার বললুম । শুনে তার থমথমে মুখটা আরও থমথমে হয়ে গেল । অবাক চোখে আমায় দেখল একটুখানি । কোনও কথা বলল না । নিঃশব্দে টুল থেকে নেমে কাউন্টার খুলে বেরিয়ে সোজা চলে এল আমাদের টেবিলে । ডিশ থেকে ভাঙা গুলগুল্লাটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে ধরল । বোধ হয় এক-দু' মুহূর্ত তারপর নিজেই বিনাবাক্যে টেবিল থেকে ডিশটা তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল ।

আমরা দু'জন কাণ্ড দেখে থ । কাউকে ডেকে ডিশটা সরিয়ে নিতে বললে আমাদের এত অস্বস্তি হত না । ভক্কা-ভাই নিজে হাতে ডিশ তুলে নিয়ে যাওয়ায় আমরা খুব ঘাবড়ে গেলাম এবং তাও কিছু না বলে । গৌতম ভয় পেয়ে গিয়েছিল । ফিসফিস করে বলল, "চলো, পালাই ।"

পালাবার কথা আমার মাথায় আসেনি । গৌতম বলায় পালাতাম কি না কে জানে । তার আগেই ভক্কা-ভাই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল । তার হাতে তখনও একটা ডিশ । ডিশটা আমাদের টেবিলে রেখে দিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল সে । বসে নির্বিকার গান শুনতে লাগল । আমি তাকিয়ে দেখি ডিশের মধ্যে আছে দু'খানা গরম রুটি আর ডাল । গৌতম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার সাহস আছে সত্যদা । আমাকে হাজার পচা দিলেও আমি ভক্কা-ভাইয়ের সামনে গিয়ে কথা বলতে পারতুম না ।"

গৌতমের কথা শুনে আমি ভক্কা-ভাইকে একবার ভাল করে দেখলুম । কিন্তু কোথাও ভয়ের কিছু পেলাম না । হাঁড়ির মতো মুখ ভক্কা-ভাইয়ের । বেশ বড় ভুঁড়ি আর বিশাল চেহারা । ভয় পাওয়ার কী আছে আমি বুঝতে পারলাম না । লোকজন ঢুকছে, খাচ্ছে । বেরোবার সময় কাউন্টারে ভক্কা-ভাইকে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে । ভেতর থেকে ছেলেগুলো শুধু একবার চেঁচিয়ে বলে দিচ্ছে, কত পয়সা নিতে হবে ভক্কা-ভাইকে । যারা ঢুকছে কিংবা পয়সা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের কারও মুখে আমি ভয়ের কোনও চিহ্ন দেখলাম না ।

ঠিক এই সময় একটা ঘটনা ঘটল । পরিষ্কার জামাকাপড় পরা একটা ভদ্র চেহারার লোক আমাদের পাশের টেবিলে বসে চেঁচিয়ে বলল, "দো গুলগুল্লা ঔর একঠো চায়ে ।" লোকটা গুলগুল্লা চাওয়ায় স্বভাবতই তার দিকে দৃষ্টি গেল আমাদের । শৌখিন লোক । অর্ডার দিয়েই তাল ঠুকে লোকটা গুনগুন করে গান ধরেছিল । এক মিনিটও হয়নি সে গান থামিয়ে চেঁচিয়ে তাগাদা দিল, "জলদি দে না ভাই । দো গুলগুল্লা ঔর এক কাপ চায়ে ।"

ছেলেদের একজন তার কাছে এসে বলল, "আজ গুলগুল্লা আচ্ছা নেহি হ্যায় সাহাব । দোস্‌রা কুছ খাইয়ে ।"

"নেহি বাবা । হাম তো গুলগুল্লাহি খায়গা । সুভহ্‌সে জি আজ গুলগুল্লা মাঙতা ।"

"গুলগুল্লা আজ আচ্ছা নেহি বনি সাব ।"

"ইস হোটেলমে কব গুলগুল্লা আচ্ছা বনতা ? যাও । লে আও গুলগুল্লা ।"

ভক্কা-ভাইয়ের দিকে তাকালাম আমি । দেখলাম সে একদৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে । এই সময় বোধ হয় নিরুপায় হয়ে ছেলেটাও ভক্কা-ভাইয়ের দিকে তাকাল । চোখের তারাটা সামান্য নড়ল ভক্কা-ভাইয়ের । চোখের তারার সেই সামান্য কম্পনে কী নির্দেশ ছিল কে জানে । ছেলেটা দ্রুত ভেতরে চলে গেল এবং একটা ডিশে দুটো গুলগুল্লা নিয়ে এসে লোকটার সামনে টেবিলে রাখল । বলল, "লিজিয়ে । খাইয়ে গুলগুল্লা । হাম চায়ে লে আতা ।"

সে বোধ হয় দু' পা গেছে, লোকটা গুলগুল্লায় কামড় বসিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আরে, ইয়ে তো সড়া হুয়া হ্যায় । বিলকুল খারাপ । এ ক্যায়সে খায়গা ?"

এতক্ষণ যা হচ্ছিল আস্তে-আস্তে । শুধু লোকটা দু'বার চেঁচিয়ে গুলগুল্লা চেয়েছিল । কিন্তু এখন তার চিৎকারে হোটেলের যেখানে যে ছিল তার দিকে ফিরে তাকাল । কেউ কোনও কথা বলল না, শুধু অবাক হয়ে দেখতে লাগল এবং বুঝতে চেষ্টা করল হঠাৎ এভাবে চেঁচিয়ে ওঠার কারণ কী । লোকটা দু'বার চিৎকার করার সময় পেল না । তার আগেই ভক্কা-ভাই কাউন্টার থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে লোকটার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল । একদম হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় মারল লোকটার গালে । টেবিল থেকে ডিশটা হাতে তুলে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, "আজ সুভহ্‌সে জি চাহ্‌তা হাম্ কিসিকো মার ডালে ।"

লোকটা চড় খেয়ে মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল । পরক্ষণেই গালে হাত বুলোতে-বুলোতে কাঁই-কাঁই করে বলে উঠল, "ভক্কানে মুঝে মারা । আপলোগ দেখা । এক বেকসুর আদমিকো থাপ্পড় মারা ভক্কা । হাম থানেমে যায়গা । আপলোগ সব সাক্ষী দেঙ্গে । ইস্‌কো হাম নেহি ছোড়েগা ।"

ভক্কা-ভাই কোনও কথা বলল না । লোকটার হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে টেবিল আর চেয়ারের মাঝখান থেকে বাইরে নিয়ে এল । তারপর মরা ইঁদুরের মতো উঁচু করে ধরে একেবারে রাস্তায় । পাঁচ-দশ মিনিট লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়েও চেঁচাল । লোক জড়ো করে ফেলল । তারপর যখন রাস্তার লোকেরা মোটামুটি আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে তাকেই ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল তখন সে "ঠিক হ্যায় । আভ্‌ভি আতা হ্যায় হাম পুলিশ লেকে । ছোড়েগা নেহি তুমকো ।" বলতে-বলতে সরে পড়ল । আর সর্বক্ষণ যেন কিছুই হয়নি এমনি গম্ভীর মুখে ভক্কা-ভাই কাউন্টারে বসে খদ্দেরদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গেল । লোকটাকে রাস্তায় নামিয়ে দেবার পর তার দিকে একবার ফিরে চাইল না পর্যন্ত ।

হোটেলে যারা বসে ছিল লোকটাকে নিয়ে তারাও কেউ মাথা ঘামাল না । কার দোষ, কী ব্যাপার, এ-নিয়েও আলোচনা হল না কোনও টেবিলে । যে যার নিজের কাজে ও-কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল । আমার হঠাৎ মনে হল এখানে যারা আছে তারা সবাই ভক্কা-ভাইকে ভয় পায় । আমি খানিকটা খেয়েছিলাম, তারপর গণ্ডগোল শুরু হয় ।

প্রিয় লেখক, প্রিয় বই

শুধু ঘনাদার গল্প লিখেই প্রেমেন্দ্র মিত্র অমর হয়ে থাকতে পারতেন। বল্‌গাহীন কৌতুককল্পনার রাজা এই ঘনাদার বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, অনিঃশেষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মজাদার মেসবাড়ি ও তার স্মরণীয় বাসিন্দারা, সন্দেহ নেই, ছোটদের মহলে যেমন বড়দের মহলেও তেমনি, চিরকালের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এহেন ঘনাদার দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যে-চারটি বই বেরিয়েছে, প্রত্যেকটিই দারুণ জনপ্রিয়। আবার এই ঘনাদাকে কোথা থেকে পেলেন তিনি, ঘনাদার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী সংকলনে—'ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস'-এ— যখন শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, তখন মনে না হয়ে যায় না যে, বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য-রোমাঞ্চও কোনো অংশে কম নয়। এ-বই ছাড়াও আরেকটা যে-ছোটদের বই তার নাম হল 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'। উচ্ছল কৌতুকে, হালকা গড়নে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগে, বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ায় যে-সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদ, তারই নমুনা এই ছড়ার বইতে। সঙ্গে সুধীর মৈত্রের চোখ-জুড়োনো ছবি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের গ্রন্থসম্ভার :

যাঁর নাম ঘনাদা ১০·০০ ঘনাদার ফুঁ ১০·০০ তেল দেবেন ঘনাদা ৮·০০ মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা ১০·০০ ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ৫০·০০ ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০
ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত দাম ১২·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

রূপকথা, উপকথা, লোককথা

সত্যজিৎ রায়ের
সুজন হরবোলা ২০·০০
শিবনাথ শাস্ত্রীর
উপকথা ৫·০০
জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বিদেশী লোককাহিনী ১০·০০

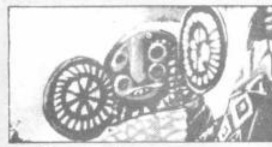

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
ক্ষীরের পুতুল ১০·০০
ননীগোপাল চক্রবর্তীর
চরকাবুড়ী ৮·০০
ফুড়ুৎ গুড়গুড়ি ১০·০০
পুণ্যলতা চক্রবর্তীর
ছোট্ট ছোট্ট গল্প ১৫·০০
রমেশচন্দ্র দাশের
পদ্মদীঘির ডাইনি ৮·০০
শৈলেন ঘোষের
বনসবুজের দ্বীপে ১০·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৮·০০
আমার নাম টায়রা ৮·০০
বাজনা ৬·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ১০·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৮·০০
জাদুর দেশে জগন্নাথ ৮·০০
আজব বাঘের আজগুবি ৮·০০

এখন বাকিটা শেষ করলাম। আমি ভক্কা-ভাইকে ভয় পাই না। অনেক ভেবেও তবু এই ঘটনায় তার কোনও দোষ খুঁজে পেলুম না। দোষ লোকটারই। শুধু ভক্কা-ভাই যদি চড়টা না মারত··· । গৌতম এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। এখন হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "গায়ের জোর দেখলি ভক্কা-ভাইয়ের ? লোকটাকে কেমন উঁচু করে তুলে বাইরে নামিয়ে দিল।"

খেয়েদেয়ে একটু বাদে আমরা বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছি, পেছন থেকে ভক্কা-ভাই ডাকল, "এ বাঙালি ! ইধার আ। এক বাত্ শুনে যা।"

গৌতম ঘাবড়ে গেল। আসতে চাইছিল না। আমি তার হাত ধরে টেনে তাকে নিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভক্কা-ভাই এক মুহূর্ত দেখল আমাদের। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম হ্যায় তোর ?"

"সত্যকাম। সত্যকাম পাল।"

"সত্কাম ! বড়া আজিব নাম ভাই ! হাঁ বেটা, যব্ আমার হোটেলে কুছু খারাপ পাবি, ইস তরিকাসে বল না। সোজা এখানে এসে আমার কাছে বলবি। হাল্লাগুল্লা নেই। ঠিক হ্যায় ?"

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ করলুম। ভক্কা-ভাই জিজ্ঞেস করল, "তোদের মালিক যাদব জরিঅলা কোথায় ?"

আমি বললুম, "তা তো আমরা জানি না। পনেরো-কুড়িদিন হয়ে গেল আমরা দেখিনি তাকে।"

"কারখানায় আতা নেহি ?"

"আসে। তবে অনেকদিন আসেনি।"

"তোরা জানিস না। উস্‌কি মেনেজার মুজিব জরুর জানে। আগে তো হপ্তায় হপ্তায় টাকা মেটাচ্ছিল। তো ছ' মাহিনা আগে একদিন এসে বলল কি ইয়ে হপ্তা হপ্তাকা হিসাব ঠিক নেহি হ্যায়। মাহিনা বাদ হিসাব চুক্তি করেগা। আজ তক্ হামি দেখল না কি ও মাহিনা পুরা হোনেসে হিসাব দিয়া। হর মাহিনা পাঁচ সাত রোজ বাদ আসবে হিসাব দিতে। ও থোড়েই আসবে। মুজিব কো ভেজ্‌বে। আর এবার এক মাহিনা দশ রোজ হয়ে গেল। আভিতক্ না যাদব, না মুজিব, কিসিকো না দেখাই পড়া। ঠিক হ্যায় ভাই, ও সিন্ধি হ্যায়, হাম পাঠান, দোনোই পাকিস্তানকা রহনেবালা। দেখা যায়গা।" শেষ কথাটা বেশ একটু রাগের সঙ্গে বলল ভক্কা-ভাই। আমরা কী বলব ভাবছি এমন সময় একজন খদ্দের এল পয়সা দিতে। ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "দো রুপিয়া সত্তর পয়সা।" ভক্কা-ভাই লোকটার কাছ থেকে দু' টাকা সত্তর পয়সা নিয়ে গৌতমকে জিজ্ঞেস করল, "তোর কী নাম আছে ?"

"গৌতম বাগ।" গৌতম নামটা বলল বটে, কিন্তু গলাটা কীরকম অদ্ভুত শোনাল।

ভক্কা-ভাই বলল, "হিন্দুরা তো এত্ত কম বয়সে নোকরি করে না। হামি জানে। হামি কলকাতায় ছিলুম। এক হোটেলমে পান্ সাল নোকরি করেছি। ইসি লিয়ে তো পানিকা মাফিক বাংলা বুলি বলতে পারি। ইস্ উমরমে ও লোক সব স্কুল-কালেজে পড়ে। কী, ঠিক হ্যায় কি নেহি ?"

আমি বোকার মতো মাথা নাড়লুম।

ভক্কা-ভাই বলল, "কাঁহা বাঙাল আর কাঁহা মধ্যপ্রদেশকা রায়পুর। তেলোক বহুত দূর চলা আয়া নোকরিকে লিয়ে। মা-বাপ নেই তোদের ?"

আমি একটু হাসলুম। ভক্কা-ভাই বলল, "ঔর ও নৌকরি কিস্‌কো পাশ ? যাদব জরিঅলা। যো হ্যায় এক নম্বর চারশো বিশ। রিফ্যুজি হ্যায়, রিফ্যুজি। গভ্‌মেন্ট সে বহোত পয়সা নিল। আভ্ বনা হ্যায় জরিঅলা। তেলোককো ও জরুর ফাসায়গা। বুঝা কুছু ? যা। ভাগ আভি।" চোখ নাচিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে ভক্কা-ভাই আমাদের চলে যেতে বলল। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। চটপট রাস্তায় নেমে এলুম দু'জনে। রাস্তায় নেমেই গৌতম বলল, "আঃ ! জ্বর দিয়ে ঘাম ছাড়ল আমার।"

আমি বললুম, "জ্বর দিয়ে ঘাম নয়, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বল।"

গৌতম বলল, "হ্যাঁ। ঘাম দিয়ে। সত্যদা, তোমার কিন্তু খুব সাহস। আমরা কেউ জীবনে ভক্কা-ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলিনি।"

"চেহারা দেখলে একটু যে ভয়ভয় করে না তা নয়। তার ওপর মুখ-ভর্তি বসন্তের দাগ।"

"ভক্কা-ভাইকে কাউন্টারে দেখলে আমরা নিজেদের মধ্যেও কথা বলি না।"

"হুঁ। কিন্তু যাদবজির ব্যাপারটা কী বল তো। কোথায় গেলেন ?"

"কোথায় আর যাবে ? বোম্বাই।"

"রায়পুরে কারখানা। বোম্বাইতে এত কী কাজ ? আর যদি কাজ থাকেও ভক্কা-ভাইয়ের টাকা মেটাল না কেন ?"

"টাকা কি শুধু ভক্কা-ভাইয়ের ? আমাদের টাকা নেই ? তোমার কি মনে আছে, তুমি আসবার দিনকয়েকের মধ্যে এক সকালে মুজিব-ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হল ?"

"হ্যাঁ মনে আছে। সকালে ঝগড়া করে নাইট শো-এ মুজিবরদা সকলকে সিনেমা দেখাল, রোটি কপড়া ঔর মকান।"

"শোনো সত্যদা, এসব ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। তোমার জন্যেই আমি সকাল থেকে হোটেলে এসে বসে আছি।"

"বলিসনি তা হলে, অতক্ষণ হোটেলে থাকলুম।"

"হ্যাঁ। হোটেলে কখন বলব ? এক তো তুমি পচা গুলগুল্লা না খেয়ে কামাল করে দিলে। আমার পেটের মধ্যে এখনও ভুটভাট করছে। তার ওপর এসে পড়ল সেই লোকটা। জি চাহে গুলগুল্লা খায়ে, কী যেন কথাটা বলল ?"

"ও বাবা ! আমি হিন্দি জানি না। ঠিক আছে, এখন হিন্দি থাক। তুই কী বলবার জন্য সকাল থেকে হোটেলে বসেছিলি তাই বল।"

"বলব। কিন্তু সে-কথা তো এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। কোথাও বসে বলতে হবে।"

"কোথাও তা হলে বসি চল।"

"না। তার আগে তোমাকে আমি শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব।"

"শহর ঘুরিয়ে দেখাবি ?"

আমি অবাক হয়ে গৌতমের মুখের দিকে তাকালাম। "কেন ?"

"তুমি চার-পাঁচ মাস এখানে এসেছ। আমি জানি আমাদের কেউ তোমাকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখায়নি।"

"তা অবশ্য দেখায়নি, কিন্তু··· ।"

"কোনও কিন্তু-টিন্তু নয় সত্যদা। আমি ঠিক করেছি আজ আমি তোমায় যতখানি সম্ভব শহর ঘুরিয়ে দেখাব। একবেলায় যতখানি পারা যায়। তারপর কোথাও বসে বলব। কটা বাজে এখন ?"

"সাড়ে আটটা হবে।"

"ও ঢের সময়। যা পচা গুলগুল্লা খেয়েছি, একটার আগে আর খিদে পাবে না। চলো হাঁটি। একটা নাগাদ হোটেলে ফিরব।"

"চল।" বলে বেশ মজা পেয়ে আমি গৌতমের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম। খটখটে শুকনো দিন। রোদের তেজ খুব। কিন্তু সর্বক্ষণ ঝিরঝির করে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না। ভালই লাগছিল হাঁটতে। শহরের চারদিকে আজ জমজমাট ছুটি ছুটি ভাব। রিকশয়, সাইকেলে লোকেরা বাজার করে ফিরছে। ও আমাকে নিয়ে প্রথমে গেল শ্যাম পার্কে। বুড়া তলাওয়ের মধ্যে এই

পার্ক। তলাও মানে পুকুর। এই হিন্দি শব্দটা আমার জানা। সেভেন এইটে আমাদের দু-বছর হিন্দি পড়তে হয়েছিল। তখন শিখেছিলুম। কিন্তু বুড়া তলাওকে পুকুর বলে ঠিক বোঝানো যাবে না। সে একটা বিশাল কাণ্ড। যে চওড়া রাস্তাটা পুকুরের মাঝখানের ওই পার্কে গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা হেঁটে যেতে লাগে সাত-আট মিনিট। এত বড় পুকুর। পুকুরের একধার দিয়ে চলে গেছে বুড়া তলাও লেন। সে রাস্তাটাও বেশ বড়। সাইকেল, রিকশ, মানুষজন ও গাড়িতে জমজমাট। রাস্তার পাশে একটা সিনেমা হল। নাম শ্যাম টকিজ। পুকুরের বাকি তিন দিকে, সে দিকগুলো অবশ্য এখান থেকে অনেক দূরে, শুধু বাড়ি আর বাড়ি। পার্ক থেকে তিন দিকের শহর ও এক দিকের বুড়া তলাও লেনকে ছবির মতো দেখাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে মুগ্ধ করে দিতে পেরে গৌতমের মুখ-চোখে খুশি উপচে পড়ছিল। সে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভারী সুন্দর না জায়গাটা ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ রে, খুব সুন্দর।" কথাটা বলে গৌতমের ওপর আমার মায়া হল। বেচারা জানে না আজ যেসব জায়গা ও দেখাবে সেগুলি সব আমি আগে দেখে নিয়েছি। কারখানার কোনও ছেলে আমাকে নিয়ে আসেনি। আমি গোটা শহরটা একা-একা ঘুরেছি। রোববার সকালবেলা জলখাবার খেয়ে আজকের মতোই আমি বেরিয়ে পড়েছি এবং অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে-হাঁটতে এ শহরের প্রায় সব দ্রষ্টব্য জায়গাই দেখে ফেলেছি। শ্যাম পার্কে এর আগে অন্তত তিন-চারবার এসেছি। আমাদের কারখানার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা এসে পড়েছে দূরের ওই বুড়া তলাও লেনে। কিন্তু গৌতমকে বলিনি কথাটা। এত উৎসাহ নিয়ে ও শহর ঘুরিয়ে দেখাতে চাইল যে, বলা গেল না। এখনও কিছু বললাম না। "খুব সুন্দর" বলে পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লুম।

গৌতম তাড়া দিয়ে বলল, "না সত্যদা, শুয়ো না। শুলে দেরি হয়ে যাবে। চলো।"

"এ-জায়গাটা এত ভাল, এখান থেকে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ, যারা পার্কে আছে তারা সবাই শুয়ে আছে।"

গৌতম হেসে বলল, "মোটেই না। ওই দ্যাখো কত লোক হাঁটছে।"

"হাঁটছে মানে কী ? হাঁটছে মানে হেঁটে-হেঁটে ওরা পার্ক থেকে চলে যাবে। আমি তো ওদের কথা বলিনি। আমি বলেছি যারা পার্কে আছে।"

"তা হলে যারা বসে আছে ?"

"হ্যাঁ। তারা বসে আছে কেন ? বসে আছে এক্ষুনি শুয়ে পড়বে বলে। তুই শুনিসনি বসতে পেলে শুতে চায় ?"

"শুনেছি। তুমি এখন ওঠো। এখন আমরা একটা দারুণ জায়গায় যাব। গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তা। উঠে পড়ো সত্যদা।"

অগত্যা উঠতে হল এবং আধ ঘণ্টা হেঁটে আমরা গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তায় এসে হাজির হলাম। গ্র্যান্ড রোড একটা বিশাল চওড়া রাস্তা। ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো। বোধ হয় তার চেয়েও বড়। দু'পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ি আর তাদের তলায় দারুণ-দারুণ সব দোকান। এই রাস্তা দিয়ে স্রোতের মতো ছুটে চলেছে বাস, লরি, মোটর ও রিকশ। রায়পুরের রিকশগুলো খুব মজার। পাঁচজন পর্যন্ত বসতে পারে। ভারী অদ্ভুত দেখায় যখন পাঁচজন লোক নিয়ে রিকশ ছোটে। এর আগে যেদিন আমি একা-একা ঘুরতে-ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিলাম, ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এত চওড়া রাস্তা হয় আমার ধারণা ছিল না। গৌতম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, "বলো তো, এ-রাস্তাটার কী নাম ?"

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "সে কী ! তুই তো এখানে আসার আগেই আমাকে বললি রাস্তাটার নাম গ্র্যান্ড রোড।"

গৌতম হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "হল না। গ্র্যান্ড রোড হল রায়পুর শহরের এইটুকুর নাম। তুমি কি ভেবেছ রাস্তাটা এইটুকু ?"

"তবে ?"

"এ রাস্তাটা কলকাতা থেকে বোম্বাই গেছে। এর আসল নাম বোম্বাই রোড। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে এসেছে, মনে আছে ?"

"হাই রোড ?"

"হ্যাঁ। সেই হাই রোড। ভারী অদ্ভুত না সত্যদা। কত দূরে আমাদের সেই গ্রাম, রাস্তাটা সেখান দিয়ে গেছে। প্রথম যেদিন আমি শুনলুম আমি বিশ্বাস করিনি।"

চারদিকে তাকিয়ে আমারও বিশ্বাস হল না। ট্রেনে করে এখানে আসতে আমাদের চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা লেগেছিল। চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা ধরে একটা রাস্তা ক্রমাগত চলে গেছে ভাবতে কীরকম অস্বস্তি হচ্ছিল। আসলে ভাবতেই পারছিলাম না। আমাদের গ্রামের পাশেও রাস্তাটা যথেষ্ট চওড়া। যতবার সেই রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বিশালতায়। বাস, ট্রাক, ম্যাটাডোরের ঘন-ঘন ছোটাছুটিতে হকচকিয়ে গেছি। তা হলেও তার দু'ধার ছিল নির্জন। দু-তিনটে পান বিড়ির দোকান আর তিন-চারটে রিকশ ছিল তার সম্বল। সেই রাস্তাটা এখানে এসে যা হয়েছে তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। যেন রাজবাড়িতে বিয়ে লেগেছে। তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। গৌতম উত্তেজিত হয়ে বলল, "দু'পাশে যে বড়-বড় হোটেল-রেস্টুরেন্ট দেখছ এগুলো সারা রাত খোলা থাকে।"

"সারা রাত ?"

"হ্যাঁ। সারা রাত। আমি আসবার পর মুজিব-ভাই আমাকে একদিন রাত দুটোর সময় নিয়ে এসে দেখিয়েছিল। আমরা রাত দুটোর সময় ওমলেট আর কফি খেয়েছিলাম।"

আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মনে-মনে ঠিক করে ফেললাম একদিন রাত দুটোর সময় কাউকে নিয়ে আসব। ওমলেট আর কফি খাব। যদি কাউকে না পাই একলা আসব। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তার দিকে। এমন ভয়ানক জাঁকজমকপূর্ণ জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছিল না আমার। মনে হচ্ছিল আরও থাকি, আরও অনেকক্ষণ থাকি। আজ ছুটি। ইচ্ছে করলে তো আজ সারাদিন আমরা এখানেই থেকে যেতে পারি। কিন্তু গৌতমটা যা-তা। থাকতে দিল না। তাড়া লাগিয়ে বলল, "চলো,চলো। এবার গান্ধী পার্কে যাই।" তাই শেষ পর্যন্ত থাকা হল না। এর আগে যেদিন একলা এসেছিলাম, এত হকচকিয়ে গেছিলাম যে, ভয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি থাকতে পারিনি। আজ গৌতমের সঙ্গে এসে ভয়টা কেটে গেল। এর পর যেদিন আসব, সে দিনেই হোক কিংবা রাত্রে, অনেকক্ষণ থাকব।

এখন আমার হাঁটতে একটু ক্লান্তি লাগছিল। আমি গ্রামের ছেলে। শহরে হাঁটার অভ্যাস নেই। অনবরত লোকজনের ভিড় ঠেলে, গাড়িঘোড়া থেকে আত্মরক্ষা করে হাঁটার জন্য ক্লান্তি। আরও ক্লান্তি লাগছিল অনিচ্ছায় যেতে হচ্ছে বলে। আমি জানি শ্যাম পার্ক একটা গাছপালার বাগান। ভেতরে সরু-সরু পিচের রাস্তা আর গাছ। গাছ আমাদের গ্রামে কম নেই। জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি তাদের। তাই শুধু গাছ দেখতে অতদূর যেতে ভাল লাগছিল না আমার। খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল বলে দিই, "গৌতম, শ্যাম পার্ক আমি আগে দেখেছি। কী হবে সেখানে গিয়ে ? চল ফিরে গিয়ে গ্র্যান্ড রোড চৌরাস্তায় আরও খানিকটা বসে থাকি।" বলিনি। কিন্তু মনটাকে চাঙ্গা

করেও তুলতে পারছিলাম না। গৌতম জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছ বলো তো সত্যদা? তোমার তো পা চলছেই না।"

সত্যি, অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে ধরে ফেললাম গৌতমকে। একটা রাস্তা দেখিয়ে গৌতম প্রশ্ন করল, "এটা কোথায় গেছে বলতে পারো?"

"এটাও আমাদের গ্রামে গেছে নাকি?"

"দূর। এটা হল মানা ক্যাম্প যাবার রাস্তা। মানা ক্যাম্প কী জানো তো? উদ্বাস্তুরা থাকে। সবাই বাঙালি।" এবারে গৌতম আমার পাশে-পাশে থেকে সর্বক্ষণ কথা বলতে-বলতে চলল। "আমরা একবার দলবেঁধে মানা ক্যাম্প গেছিলাম। কেন গেছিলাম জানো? রসগোল্লা খেতে।" বলে নিজেই হেসে খুন। হাসি থামতে বলল, "বাঙালি কিন্তু রায়পুর শহরেও কম নেই। অনেক। আর সকলেই বড়লোক। একবার কী হয়েছে শোনো। তখন আমি নতুন এসেছি। একটা হলে সকালবেলা বাংলা বই দিয়েছে। হলটার নাম 'আনন্দ টকিজ'। তুমি আনন্দ টকিজের ওদিকে গেছ?"

"না।"

"ঠিক আছে। আজ হবে না। সামনের রোববার আনন্দ টকিজে তুমি আর আমি একটা সিনেমা দেখব। তারপর শোনো। আনন্দ টকিজে বাংলা বই দিয়েছে। আমরা সকলে মিলে দেখতে গেছি। দেখি হলের সামনেটা মোটরগাড়িতে ভর্তি। আমরা ভেবেছি এদেশী লোকেরা বুঝি গাড়ি নিয়ে বাংলা সিনেমা দেখতে এসেছে। আমাদের ঢুকতে একটু দেরি হয়েছিল তাই কিছু বুঝতে পারিনি। অন্ধকারে হলের মধ্যে ঢুকে নিজেদের সিটে বসে পড়ার পর সিনেমা দেখতে-দেখতে বাংলায় খুব যা-তা বলাবলি করেছি। হাসাহাসি করেছি। অবশ্য জোরে নয়। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে। হাফটাইমের সময় দেখি, ওমা, চারপাশের সবাই যে বাঙালি। গোটা হল বাঙালিতে ভর্তি। ভাগ্য ভাল কেউ কিছু মনে করেনি। হলের মধ্যে ফিসফিস করে বললেও বেশ শোনা যায়। কিন্তু কিছু মনে করেনি কেউ। বরং উলটে আমাদের খোঁজখবর নিয়েছিল। কোথায় থাকি, কী করি, এইসব। কিন্তু তুমি ভাবো, বাঙালিদের অত মোটরগাড়ি আর আমরা কিনা জরির কারখানার কারিগর?" আবার হাসল গৌতম। হেসেটেসে নিয়ে বলল, "একটা মজার কথা শোনো, এখানকার যারা আদিবাসী তাদের বলে ছত্রিশগড়ি, কিন্তু তারা সবাই ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে পারে। আমাদের দেশ থেকে এতদূরে এরা বাংলা জানল কী করে বলো তো? ভাঙা হোক, বাংলা তো।" এখন প্রায় নিজের মনে একা-একাই বকছিল গৌতম। আমার মনে হল এক বছর ধরে যেসব কথা ও বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে তার সব ও আজই বলে দিতে চায়। যেসব জায়গা দেখে ও নিজে একদিন অবাক হয়েছিল সেসব জায়গা আমাকে দেখাতে চায়। আমার সঙ্গে এ ক' মাস তেমন করে কথা বলেনি, মেশেনি বলে ওর ওপর আমার রাগ ছিল। দেখলুম সে-রাগ আর নেই। বিদেশে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া আত্মীয়ের মতন এখন লাগছিল ওকে আমার।

গান্ধী পার্কে এসে পড়লাম আমরা। ক্লান্ত ভেতরে ভেতরে গৌতমও হয়েছিল। বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি। "সত্যদা, এই হল গান্ধী পার্ক।" বলে ভেতরে ঢুকে একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। "এখানে তেমন কিছু দেখবার নেই। শুধু গাছপালা আর ভেতরে-ভেতরে পিচের রাস্তা। এখানে এলুম সেই কথাটা তোমাকে বলব বলে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।"

আমি বসে পড়লাম। পা ছড়িয়ে বসলাম ঘাসের ওপর। বললাম, "একটা কথা বলবার জন্য এতদূর নিয়ে এলি? কী এমন জরুরি কথা তোর?"

"শুধু আমার নয় সত্যদা। আমাদের সকলের জরুরি কথা। জীবনমরণ সমস্যা।" খুব গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলল গৌতম। আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। তাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললুম, "তার মানে?"

গৌতমও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল দু' মিনিট। তারপর বলল, "আমরা সবাই তোমাকে মুজিব-ভাইয়ের লোক বলে সন্দেহ করি। তুমি নিশ্চয় খেয়াল করেছ যে, আমরা কেউ তোমার সঙ্গে মিশতে পারি না। সত্যদা, ঠিক করে বলো তুমি কি সত্যি

মুজিব-ভাইয়ের লোক ?"

মুজিবরদার বয়েস তিরিশ-বত্রিশ হবে। বেশিও হতে পারে। তাকে মুজিবরদা না বলে গৌতম খালি মুজিব-ভাই বলছে দেখে আমি মনে-মনে বেশ অবাক হচ্ছিলুম। তারপর এখন এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করায় আমার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না গৌতম। যাদবজির কারখানায় আমরা যারা কাজ করি তারা সকলেই তো মুজিবরদার লোক। আমাকে একলা এ-কথা বলার মানে কী ?"

গৌতম বুড়ো মানুষের মতো একটা নিশ্বাস ফেলল। গম্ভীর মুখে তারপর বলল, "তা ঠিক। আমাদের সে নিয়ে এসেছে এখানে। আমরা তার লোক। কিন্তু সে বোধ হয় কোনওদিন আমাদের লোক ছিল না।"

"গৌতম, আমি তোর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। হেঁয়ালি রেখে কী হয়েছে বল।"

"বলব। তোমাকে সব বলব বলেই এখানে ডেকে এনেছি। ওরা সবাই বারণ করেছিল। আমি বলেছি, না। আমি সত্যদাকে ছোটবেলা থেকে চিনি। সত্যদাদের সবাইকে চিনি। সত্যদা কখনও মুজিবরদার লোক হতে পারে না।"

দু'পাশে গাছের সারির মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। গাছগুলো বেশি বড় না। গাছের পাতা দেবদারু গাছের মতো, কিন্তু ঠিক দেবদারু নয়। ডালগুলো নীচের দিকে এলিয়ে পড়া। এখানে বসে গাছের সারির মধ্য দিয়ে যাওয়া রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল একটা সুড়ঙ্গ যেন। সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম আমি। আমার মনে হচ্ছিল গৌতম রহস্যময় কথাবার্তা বলে যেন জোর করে আমাকে ওরকম একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে। সত্যি, এখন পর্যন্ত তার কথাবার্তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে আছি দেখে পেছন ফিরে গাছের সারি দিয়ে তৈরি সুড়ঙ্গটাকে গৌতমও দেখল একবার। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আমরা দেশ ছেড়ে এতদূরে কেন এসেছি বলতে পারো ?"

একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁতে কাটছিলুম। প্রশ্ন শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললুম, "আরে এ আর না বলতে পারার কী আছে। আমরা এতদূরে এসেছি দুটো বেশি টাকা পাব বলে।"

"কিন্তু কোথায় বেশি টাকা ? বাড়িতে কেউ আমরা একশো টাকার বেশি পাঠাতে পারি ?"

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, "হ্যাঁ। না। তা এখনও পারি না বটে।"

উত্তেজিত গলায় গৌতম বলল, "এখনও মানে কী ? কোনওদিন পারবে না। আমাদের দু'জনের কথা বাদ দাও। তোমার পাঁচ-ছ' মাস হয়েছে, আমার বছরদেড়েক। কিন্তু বাকি যাদের চার-পাঁচ বছর হয়ে গেল তাদেরও বাড়িতে পাঠাবার বাঁধা বরাদ্দ ওই একশো টাকা।"

"কেন ?"

"তা হলে আর বলছি কী তোমায়। একশো টাকা বাড়িতে, একশো টাকা হোটেলে আর তিরিশ টাকার মতো হাতখরচা। ব্যস, বাকি টাকার কথা বললেই শুনবে, যখন বাড়ি যাবি তখন হিসেব করে দিয়ে দেওয়া হবে।"

"বাড়ি যাবার সময় বাকি টাকা দিয়ে দেয় না ?"

"কেউ বাড়িই যায়নি কোনওদিন তো দেবে কী করে ?"

"বাড়ি যায়নি কেন ?"

"বাঃ ! যেতে দিলে তো যাবে। তুমি একবার বাড়ি যাবার কথা বলে দ্যাখো না। বলবে, এ মাসে না। সামনের মাসে যাবি। সামনের মাস এলে বলবে, এ-বছর যাওয়া চলবে না। কাজের ভীষণ চাপ। সামনের বছর যাবি। সামনের বছর এলে···। মাসুদ আর ফজলুর আজ দু' বছর ধরে বাড়ি যাবার কথা বলে-বলে হয়রান। না কত টাকা জমেছে তার হিসেব পাচ্ছে, না বাড়ি যেতে পারছে।"

এতক্ষণে যেন অল্প-অল্প ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলুম আমি, আর এক অজানা ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল আমার। অবাক হয়ে বললুম, "যাদব জরিঅলার কারখানায় যারা কাজ করে তারা কেউ কখনও বাড়ি যায়নি ?"

"না। কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি।"

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল আমার। "কত টাকা জমেছে ওদের এক-একজনের ?"

"হিসেব দিচ্ছে যে জানবে ?"

"ওদের নিজেদের হিসেব নেই ?"

"সবাই তো আমার মতো বিদ্বান সত্যদা। কোত্থেকে রাখবে হিসেব ?"

"বাঃ ! একটা আন্দাজও তো থাকবে।"

"হ্যাঁ, তা আছে। ওরা বলে চার-পাঁচ হাজার টাকা করে পাবে। তুমি একবার চট করে মনে-মনে দ্যাখো না কত হয় ?"

"হপ্তা কত ?"

"তোমার আমার মতো। আশি, নব্বই। দু-একজনের একশো আছে।"

আমি বললুম, "ঠিক আছে। নব্বই, একশো থাক। সকলের আশি করে হিসেব করি।" বলে মনে-মনে নয়, বেশ জোরে-জোরে হিসেব করতে থাকলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল গৌতমকে তাক লাগিয়ে দেওয়া। "সপ্তায় আশি হলে মাসে হচ্ছে চার আশি তিনশো কুড়ি। তার থেকে বাদ যাচ্ছে বাড়িতে পাঠানোর একশো, হোটেলের একশো আর হাতখরচা তিরিশ, মোট দুশো তিরিশ টাকা। তিনশো কুড়ি থেকে দুশো তিরিশ বিয়োগ করলে কত থাকে ?"

বোকা-বোকা মুখে গৌতম বলল, "কত থাকে ?"

"নব্বই। নব্বই টাকা করে মাসে জমলে বছরে জমে নব্বই ইনটু বারো, মানে দশশো আশি টাকা। তা হলে পাঁচ বছরে জমছে, হ্যাঁ, সত্যিই তো, এক-একজনের জমেছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। আঠারোজনের নব্বই হাজার। উরেব্বাস ! সে যে অনেক টাকা গৌতম !" গৌতমকে তাক লাগাতে গিয়ে আমার নিজেরই তাক লেগে গেল।

গৌতম বলল, "এর ওপর আছে ওভার টাইম। তার কোনও হিসেব নেই। সে মুজিব-ভাই খাতায় কী লিখে রেখেছে কে জানে।"

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম। বললুম, "এত টাকা ! লাখ টাকার ওপর ! হ্যাঁ রে, গৌতম, জরিঅলা মেরে দেবে না তো টাকাটা ?"

"হুঁ। মেরে দিতে পারে।" ভারী সহজ গলায় গৌতম বলল, "আমরা বিদেশী। কোনও চেনা লোক নেই আমাদের। কেউ দাঁড়াবে না আমাদের হয়ে। অন্যদিকে জরিঅলাকে সবাই চেনে, সে যা বলবে, তাই বিশ্বাস করে নেবে সবাই। সে যদি বলে আমার কাছে কারও এক পয়সা পাওনা নেই, তবে তাই। সবচেয়ে বড় কথা যে মুজিব-ভাই আমাদের মুরুব্বি, যে আমাদের সকলকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে, সে-ও জরিঅলার হয়ে সাক্ষী দেবে।"

জরিঅলার কাছে আমার জমা টাকা বেশি নয়। নব্বই করে পাঁচ মাসে চারশো পঞ্চাশ টাকা। আর সকলের তুলনায় সামান্য। তবু সেই সামান্য টাকার ভবিষ্যৎ ভেবেই আমার হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

রোভার্সের রয়
রয় ছুটে মাঠে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে রোভার্স আর-একটা চোট খেয়েছে!
দুস্থ স্ট্যানথর্প ইউনাইটেডকে সাহায্য করতে রোভার্স শক্তিশালী কারমোডিস ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে কয়েকটি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে। প্রথম খেলায় র‍্যালফ মিকারের দুর্দান্ত ফাস্ট বলে আহত হয়েছে এবং রয় বোলড আউট!
পেনি, তা হলে এই কথাই রইল। ওর নাম হবে ডায়না!
এবং আশা করা যাক, ওদের বাচ্চাও এমনই সুন্দর হবে!
এবার আমাকে মাঠে ছুটে যেতে হবে, তুমি বিশ্রাম করো! রোভার্স সম্ভবত ফিল্ড করতে নেমেছে…
রয় ঠিকই বলেছে। রয়ের অনুপস্থিতিতে ব্ল্যাকি গ্রে ক্যাপ্টেন…
চার্লি, আমি জানি গোলকিপাররা প্রয়োজনে উইকেটকিপার হতে পারে…কিন্তু তাই বলে অত কাছে দাঁড়ানো কি ঠিক?
কেন নয়, ব্ল্যাকি? স্টিভের এমনকী বিশেষত্ব আছে?
স্টিভ নেলোর মেলচেস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ওপেনিং বোলার। ওর বল জোরেই আসে!
চিন্তা নেই, ব্ল্যাকি… ওর বল মণ্ডার মতো তুলে নেব!
কিন্তু স্টিভের দ্বিতীয় বল কারমোডির প্যাডে লেগে উঠে গেলে…
উহহহ!
উফ! চার্লি নিশ্চয় বলটা দেখতে পায়নি…
আর বলটা কণ্ঠার হাড় ভেঙে দিয়েছে!
ভাগ্যক্রমে রোভার্সের প্রশিক্ষক ট্যাফি মরগ্যান খেলাটা দেখছিল…
…ব্ল্যাকি, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ভাল। কণ্ঠার হাড় চিড় খেয়েছে মনে হয়!
সর্বনাশ!
চার্লিকে যখন মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে…
প্রথমে মারভিন, এখন আবার চার্লি। হয়তো মরসুমের প্রথম দিকে খেলতেই পারবে না!
এইজন্যেই রয় পেশাদার ক্রিকেটার নিয়ে খেলতে চেয়েছিল।

পরের সংখ্যায় : রয় বল করছে এবং প্রথম বলেই চার !

অথই সমুদ্রে, জাহাজে জাহাজে

দেবব্রত মল্লিক

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাহাজ পরিচালনাকেই বলা হয় 'নেভিগেশন'। বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি যেমন সহজ নয়, তেমনই কঠিনও কিছু নয়।

জাহাজের পূর্ণ দায়িত্বে থাকেন ক্যাপ্টেন। প্রশাসন থেকে শুরু করে অন্যান্য সবকিছুই নির্ভর করে তাঁর ওপর। তবে এঞ্জিন রুমের দায়িত্বে থাকেন এঞ্জিনিয়াররা। তাঁদের ওপরে থাকেন চিফ এঞ্জিনিয়ার।

জাহাজের ক্যাপ্টেন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার জায়গা ভারতে মাত্র একটাই। বোম্বাইয়ের বিশাল প্রশিক্ষণ-জাহাজ 'টি এস রাজেন্দ্র'-এ এই ট্রেনিং দেওয়া হয়। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর ট্রেনিং নিতে হয় দু' বছরের। তার পরের দু' বছর ক্যাডেট হয়ে ঘুরতে হয় জাহাজে জাহাজে। এই চার বছরের অভিজ্ঞতা না হলে সেকেন্ড মেট-এর জন্য পরীক্ষায় বসা যায় না। সেকেন্ড অফিসার হওয়া পর্যন্ত সেকেন্ড মেট পাশ করাই যথেষ্ট। অবশ্য তেমন যোগ্যতা থাকলে অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেকেন্ড অফিসার হয়ে যেতে পারেন। এর পরের মেটস পরীক্ষায় বসতে হয় চিফ অফিসার হওয়ার জন্য। আর ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য প্রয়োজন মাস্টারশিপ ডিগ্রি। ক্যাপ্টেন হওয়ার পর কেউ-কেউ এক্সট্রা মাস্টারশিপ করে থাকেন, শিক্ষাগত মান বাড়ানোর জন্য।

ডাইরেক্টর অব মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং, সংক্ষেপে ডি· এম· ই· টি· থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার পর জাহাজে এঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দেওয়া যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. পাশ।

তবে যাঁরা ডি· এম· ই· টি'তে যাওয়ার সুযোগ পান না, তাঁরা জাহাজ তৈরির বা জাহাজ মেরামতের কারখানায় চার বছর শিক্ষানবিশি করে মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্টের সেকেন্ড ক্লাস পার্ট 'এ' ট্রেনিং নিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষানবিশির সময় অবশ্যই তাঁদের আড়াই বছর ফিটিং মেশিন শপে ট্রেনিং নিতে হবে। পার্ট এ পাশ করার পর ফিফ্থ এঞ্জিনিয়ার হিসেবে জাহাজে কাজ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ডি·এম·ই·টি·পাশ করার পরও ফিফ্থ এঞ্জিনিয়ার হয়ে যোগ দিতে হয়।

আমাদের দেশে ডি·এম·ই·টি·পড়ার ব্যবস্থা মাত্র দু' জায়গায় আছে। কলকাতায় (তারাতলা) এবং বোম্বাইয়ে। পড়ার সময় চার বছর। তিন বছর কারখানায় প্র্যাকটিক্যাল করতে হয়, আর এক বছর

ভাসমান জাহাজেই আছে অনেক চাকরি

থিওরিটিক্যাল (ডি·এম·ই·টি·কলেজে পড়ানো হয়)।

ফিফ্‌থ এঞ্জিনিয়ার থেকে চিফ এঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য পর পর পরীক্ষায় বসতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে থাকার অভিজ্ঞতাও চাই। জাহাজে যোগ দেওয়ার আঠারো মাস পর, অথবা ৩৬০ দিন ক্রমান্বয়ে জাহাজে চলার পর যে কোনও ফিফ্‌থ এঞ্জিনিয়ার এম· ও· টি'র (সেকেন্ড ক্লাস) পার্ট 'বি' পরীক্ষায় বসতে পারেন।

পার্ট বি পাশ করার পরই ফার্স্ট ক্লাসের পার্ট এ পরীক্ষায় বসা যায়। তারপর বাকি থাকে ফার্স্ট ক্লাসের পার্ট বি। এই পরীক্ষায় বসার জন্য একুশ মাসের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ফার্স্ট ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাস সম্পূর্ণ পরীক্ষা পাশ করার পর জাহাজের চিফ এঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। এর পরও আছে, এক্সট্রা ফার্স্ট ক্লাস পরীক্ষা। এর জন্য ন' মাসের স্টিম এন্ডোর্সমেন্ট এবং ছ' মাসের মোটর এন্ডোর্সমেন্ট থাকা প্রয়োজন। শিক্ষাগত মান বাড়ানোর জন্য এঞ্জিনিয়াররা এই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েও সরাসরি জাহাজে যোগ দেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে কিছু সময়ের জন্য শিক্ষানবিশ থাকতে হয়। জাহাজ থেকে অন্য জাহাজের খবর আনা এবং পৌঁছে দেওয়ার ভার রেডিও-অফিসারের ওপর। ওয়ারলেস কোর্স পাশ করার পর জাহাজে কিছুদিনের জন্য শিক্ষানবিশি করতে হয়। তারপর রেডিও-অফিসারের পদে নিযুক্ত হওয়া যায়। রেডিও অফিসার থাকার সময় দুটো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। প্রথমে সেকেন্ড ক্লাস, তারপর ফার্স্ট ক্লাস।

আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনীতেও জাহাজে যাওয়ার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর নৌবাহিনীর শিক্ষানবিশ হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। সময় চার বছর। পুনে'র লোনাভালায় 'আই· এন· এস· শিবাজি'তে এই ট্রেনিং হয়। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর ভারতীয় নৌবাহিনীতে নিযুক্ত থাকতে হয় দশ বছর। যাঁরা একটানা পনেরো বছর নিযুক্ত থাকেন তাঁরাই পেনশন পাওয়ার যোগ্য হন। নৌবাহিনীতে থাকার সময় পদোন্নতির ব্যবস্থা আছে।

এম ও টি· পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ এঁদেরও আছে। শিক্ষাগত মান বাড়ানোর জন্য পর পর পরীক্ষায় বসতে পারেন।

জাহাজে ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারের পদে যাঁরা বহাল হন, তাঁদেরও শিক্ষানবিশ থাকতে হয়। ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারের ট্রেনিং দেওয়া হয় 'আই· এন· এস· ভালমুরা'য়—গুজরাতে।

এ ছাড়াও জাহাজের অন্যান্য পদ রয়েছে। যেমন ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, অয়েলম্যান, পেটি অফিসার ইত্যাদি। এঁদের প্রি সি ট্রেনিং কোর্স (ছ' মাস) পাশ করে ঢুকতে হয়। তবে বর্তমানে এই ট্রেনিং কোর্স বন্ধ আছে।

শুধু জল আর জল। অথই সমুদ্রে জাহাজ যখন ভাসতে ভাসতে চলে, তখন অদ্ভুত অনুভূতি হয়। রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতা। তবে ভাবতে ভাল লাগে, এই জলভ্রমণ উদ্দেশ্যহীন নয়। এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পাড়ি দেওয়ার সময় সুদক্ষ কয়েকজন মানুষ অন্যদের দেখাশোনা করেন। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। এটাই বড় কথা।

কে প্রথম

চন্দ্রের কক্ষপথ পরিক্রমা

চন্দ্রের কক্ষপথ প্রথম পরিক্রমা করেন আমেরিকার ফ্র্যাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লোভেল এবং উইলিয়ম অ্যান্ডার্স। ১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে রকেট জ্বালিয়ে তাঁদের নিয়ে আকাশে উঠল অ্যাপোলো-৮।

মাঝপথে তাঁরা তিনজনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পৃথিবীতে বসে চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয় করলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং চিকিৎসার বিধান দিলেন। মহাকাশচারীরা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার রকেট জ্বালিয়ে চন্দ্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে যানটিকে স্থাপনের সময় এসে গেল। কাজটি এমন সময়ে করতে হল যখন তাঁরা চন্দ্রের পিছন দিকে এবং পৃথিবীর সঙ্গে বেতার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন। অ্যাপোলো-৮-এর সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আগে কেটে গেল রুদ্ধশ্বাস পঁয়তাল্লিশটি মিনিট।

ন' বার কক্ষপথ প্রদক্ষিণের পরে যানটিকে পৃথিবীর পথে পরিচালিত করতে রকেট জ্বালাবার প্রয়োজন ছিল। এ-কাজে সামান্য ভুলের অর্থ যানটিকে অনন্তযাত্রার পথে ঠেলে দেওয়া।

বড়দিনের সকালে সাফল্যের সঙ্গে রকেট জ্বলল এবং লোভেল বেতারে বার্তা পাঠালেন, 'সান্তা ক্লজ আছেন!' কিন্তু পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রথম পুনঃপ্রবেশের সমস্যা তখন সামনে। ঘণ্টায় ২৪,৫০০ মাইল গতিবেগের সঙ্ঘর্ষ কি মহাকাশযান সহ্য করতে পারবে? তাপ-বর্ম প্রচণ্ড উত্তাপে সাদা হয়ে ঝলসে উঠল— কিন্তু অ্যাপোলো-৮ নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করল ২৭ ডিসেম্বর।

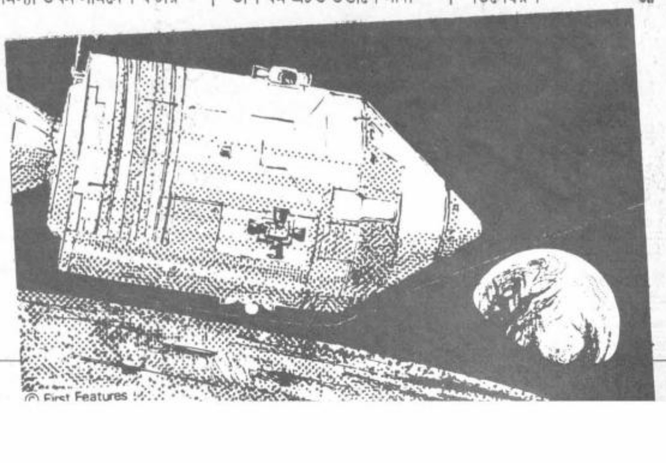

© First Features

!?!
!
বাঁচাও ! বাঁচাও ! ভূত ! টিনটিনের ভূত তাড়া করেছে !
বাহ্ ! কী যোগাযোগ ! এ-কথা বলতেই হবে আমাকে আবার দেখে ও বিশেষ খুশি হয়নি !
ওর বিবেচনার তুলনা নেই—আমার জন্যে কিছু খাবার রেখে গেছে । ওর উদারতার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ··· সত্যি বলতে কী, খিদেয় মরে যাচ্ছি···
আ-আম্মো !
সর্দার !···সর্দার··· ! একটা ভূত দেখেছি ! বাচ্চা পাঁশুটে-মুখটার ভূত ! দিব্যি করে বলছি ও মরে গিয়েছিল ! গুলি খেয়ে ও খাদে পড়ে গিয়েছিল···এখন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে !
কী বললে ?···মাটি ফুঁড়ে ?···তা হলে ও আমাদের গোপন গুহা দেখে ফেলেছে ! আমাদের ওখানে নিয়ে চলো । ওই খুদে শয়তানটাকে শেষ করে ফেলতে হবে !
প্রায় দু' মাইল পথ···
ওর খুলির ছাল ছাড়িয়ে ঘরের চাল সাজাব !
এই চাঁদপারা চোখ পাঁশুটে-মুখটা মেয়ের মতো ভিতু !
?
সোঁওওও
খুদে পোকাটা পালিয়েছে !
তা হলে ওর পিছু নাও !
এসো ! আমার তরুণ বীররা তাদের সর্দারের পিছনে এসো !
যাও ! জলদি ! আরও জলদি ! আশ্চর্য, লোকে ভাববে সর্দারের সঙ্গে যেতে তোমরা ভয় পাচ্ছ !

আমেরিকায় টিনটিন

ওরা ভিতরে ঢুকেছে দশ মিনিটের ওপর । জানি না ওখানে কী হচ্ছে···
অবশেষে ফিরলে !···খবর কী ?
মহান ওয়াকণ্ডা তাঁর বীরদের বিজয়ী করেছেন ! পুঁচকে পাঁশুটে-মুখটা হেরে গেছে !
আমাদের মহান সর্দার নিজেই কাজটা করেছেন । উনি শিকার নিয়ে আসছেন···
চমৎকার ! চমৎকার !
সর্দার শ্যেনচক্ষু ছুঁচো আবার তার নাম বজায় রেখেছে । মহান ওয়াকণ্ডার সাহায্যে অন্ধকারে দারুণ লড়াই করে আমি পাঁশুটে-মুখটাকে টিট করেছি । আমার তরুণ বীররা ওকে গর্ত থেকে তুলে আনুক !
দ্যাখো !···হতচ্ছাড়া বুনো কুকুর আর জ্বালাবে না !
এ কী ! এ তো খুদে পাঁশুটে-মুখটা নয় !
সর্বনাশ ! ভুল করেছি ! এ যে খোঁড়া হাঁস !
ফন্দি মাথায় এসেছে···পুঁচকেটা ওখানেই থাক । না খেয়ে মরুক !
যা-খুশি করো, কিন্তু ওকে শেষ করতে হবে ! অনেক জ্বালিয়েছে !
এই মুখে বড় পাথর—অন্য মুখে গভীর খাদ ! ও কোথায় যাবে ? মরতেই হবে ···
ভয় নেই, কুট্টুস । আমরা এই গর্তে পচে মরব না । ওরা ভাবছে ফাঁদে পড়েছি, কিন্তু আমরা পালাচ্ছি । দ্যাখ, আমি কার্তুজগুলি খালি করে বারুদ বের করে নিয়েছি । এবার ওদের পাথর উড়িয়ে দেব !
মনে হয় এতে কাজ হবে ?
তুই এখানে বোস, কুট্টুস । আমি বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করছি···
সাবধান, আমরাও যেন উড়ে না যাই !
হয়ে গেছে !···এবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে···আর ওই পাথরটা শোলার মতো ছিটকে যাবে···যে-কোনও মুহূর্তে আমরা মুক্তি পাব !···

কিন্তু পরদিন সকালে জেলের হাসপাতালে···
খটাং খট
ও ও ও
ও
উ উ উ
উ
সার, কয়েদি বেট্‌স আর স্যান্ডার্সন পালিয়েছে !
এক্ষুনি ইন্সপেক্টর বন্ডকে খবর দাও !
গভর্নর

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

সুইডেনে নতুন ট্রেন

যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে সুইডেন নতুন এক ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্প্রতি সেখানে চালু হয়েছে উচ্চগতিসম্পন্ন এক আধুনিক ট্রেন। 'X2' নামের এই ট্রেনের গতি ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার। তা বলে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা দিয়ে চলাচলেও এর কোনও বিধিনিষেধ নেই। এমনকী, সে দৌড়তে পারে যে-কোনও সাধারণ রেলওয়ে ট্র্যাক দিয়ে। বলা যেতে পারে স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ও গতির এক সুষম সমাহার হল এই 'X2' ট্রেন। সুরক্ষার জন্য চালু করা হয়েছে অটোম্যাটিক সিগন্যাল ও স্পিড-চেকার। আর সেই সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে 'X2' ট্রেনের মডেলও, যার সৌন্দর্য সবারই নজর কেড়ে নেয়।

পার্লামেন্ট স্থাপত্য

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার নতুন 'পার্লামেন্ট হাউস' তৈরি হয়েছে রাজধানী শহর ক্যানবেরাতে। ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্যাপিটাল হিলের ওপর তৈরি এই স্থাপত্যের অভিনবত্ব দূর থেকে নজর কাড়ে। পুরনো ভবনটিও এই ক্যাপিটাল হিলেই ছিল। বর্তমান পার্লামেন্ট হাউস এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যাতে একুশ শতকেও স্থানাভাব না হয়। তাই পার্লামেন্ট হাউস তৈরির জন্য বিশ্ববন্দিত স্থাপত্যসংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ২৮টি দেশের ৩২৯টি বিখ্যাত সংস্থার মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান এক কম্পানি। নাম তার পিচেল, গিউরগোলা অ্যান্ড থর্প। ক্যাপিটাল হিলের নীলাভ আকাশ ও সবুজের প্রেক্ষাপট অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট হাউসকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

ইউরোপা আন্দোলন

'ইউরোপা' আন্দোলনের ফলে ইউরোপের নানান বৈশিষ্ট্য আজ আমরা সহজে জানতে পারছি। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ইউরোপীয় দেশগুলির ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার নানা দিক বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। সম্প্রতি এই আন্দোলনের মাধ্যমে ইউরোপের পুরনো দিনের যানবাহন সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে অবহিত করা হচ্ছে। এতদিন আমরা কলকাতার ঘোড়ায় টানা ট্রাম নিয়ে গর্ব করতাম। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন শহরও যে একসময় এই ট্রামের আওয়াজে মুখরিত হত, সে-খবর কে জানত? এদের মধ্যে ফিনল্যান্ড ও আইল অব ম্যান দ্বীপের নাম উল্লেখযোগ্য। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়েছিল ১৮৮১ সালে। প্রায় দশ বছর চালু ছিল এই সার্ভিস। ইউরোপ থেকে দূরে নিউজিল্যান্ডে ঘোড়ায় টানা ট্রাম অবশ্য চলে এর অনেক আগে, ১৮৬২ সালে। চালু করেন নেলসন নামে এক ব্যক্তি। একটি মাত্র ঘোড়ায় টানা এই কোচটি সেদিন দেড় কিলোমিটারের কিছু বেশি পথ চলেছিল। আইল অব ম্যান দ্বীপের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য ঘোড়ায় টানা ট্রামের খুব চল ছিল। এইসব ট্রামের নমুনা ইউরোপের জাদুঘরে রয়েছে।

১৮৯১ সালে ফিনল্যান্ডের রাস্তায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম

গ্লোব-স্টেডিয়াম

সুইডেনের রাজধানী শহর স্টকহোম-এর আকাশরেখায় গম্বুজের মতো দেখতে একটি স্থাপত্যশিল্প সম্প্রতি সবার নজর কেড়ে নিয়েছে। 'স্টকহোম গ্লোব এরেনা' নামের দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপত্যশিল্পটি আসলে একটি ক্রীড়ামঞ্চ।

এ-বছর এপ্রিল মাসে বিশ্ব আইস-হকি প্রতিযোগিতা দিয়ে এই ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। স্থাপত্যটি উচ্চতায় ৮৫ মিটার এবং চওড়ায় ১১০ মিটার। ১৬ হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই গ্লোব-স্টেডিয়ামে আইস-হকি ছাড়াও, হ্যান্ডবল, ভলিবল, শো-জাম্পিং, বিভিন্ন ধরনের সার্কাস ও অপেরা অনুষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই স্টেডিয়ামের সব আসন একটি বছরের জন্য ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়ে গেছে।

বিশ্ব আইস-হকি ছাড়াও ইউরোপিয়ান জিম্‌নাস্‌টিক্‌স ও ভলিবল এ-বছর এখানেই হওয়ার কথা। সম্প্রতি পোপের প্রথম সুইডেন আগমন উপলক্ষে এই নতুন গ্লোব এরেনা বেশ মেতে উঠেছিল।

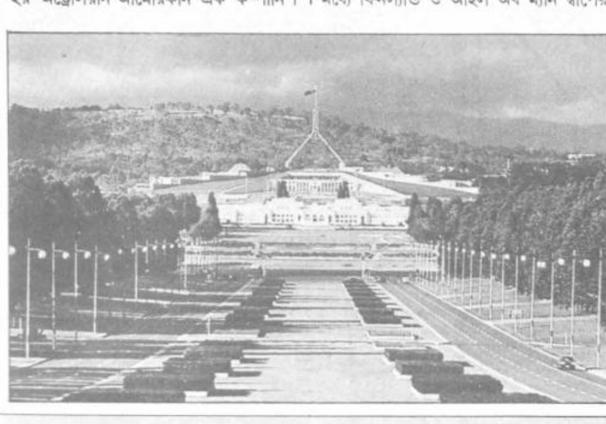

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মহারাজ মহাচূড়ামণিকে কেউ জাগাল না, তিনি নিশ্চিন্তে মহা আরামে একটানা ঘুমোলেন বাইশ ঘণ্টা। তিনি জাগলেন অনেক রাতে।

জাগার কিছুক্ষণ আগে তাঁর ছটফটানি দেখেই দাসদাসীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। রান্না-বান্না সব তৈরি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। মস্ত বড় এক ঘটি জল নিয়ে একজন দাসী দাঁড়িয়ে রইল তাঁর শয্যার কাছে।

মহারাজ উঠে বসে সবটা জল খেয়ে নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "আঃ!"

বেশ ভাল ঘুম হয়েছে, তাঁর মনটা প্রসন্ন আছে। খিদেও পেয়েছে বেশ। হাত-মুখ ধুয়ে তিনি আহারে বসে গেলেন। অন্য দিনের চেয়ে বেশিই খেলেন অনেকটা।

খাওয়া শেষ করার পর তিনি প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুললেন। তাতে বোঝা গেল, আজকের খাওয়াদাওয়া বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। ঠিক বাঘের গর্জনের মতন হাউ-উ হাউ-উ করে তিনি ঢেকুর তুললেন আরও কয়েকবার।

এবার তাঁর স্নান করার পালা।

কিন্তু সন্ধেবেলা খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটু যেন শীত-শীত ভাব। মহারাজ স্নান করার খুব একটা গরজ অনুভব করলেন না।

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, প্রাসাদটি বড় বেশি নিঃশব্দ। দাসদাসীরা ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু তাদের মুখগুলো থমথমে। কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু নীরবে আদেশ পালন করে যাচ্ছে। অবশ্য মহারাজ নিজে কিছু জিজ্ঞেস না করলে কারও কিছু বলার কথাও নয়। কিন্তু কারও মুখে একটু হাসিও নেই।

রাজ্যে আবার কোনও বিপদ হল নাকি?

মহারাজ মহাচূড়ামণি হাঁক দিলেন, "মহামন্ত্রী!"

একজন দৌবারিক দরজা দিয়ে উঁকি মারতেই মহাচূড়ামণি আবার বললেন, "মহামন্ত্রী কোথায়? তাঁকে ডেকে আনো! তিনি ঘুমিয়ে থাকলেও তাঁকে তুলে আনবে।"

দৌবারিক মাথা চুলকে কিছু বলতে গেল। তারপর কিছু না বলেই দৌড়ে গেল পেছন ফিরে। একটুক্ষণের মধ্যেই সে ডেকে আনল নগর কোটাল বীরবাহুকে।

মহাচূড়ামণি তখন তাঁর হিরণ্যক নামে বিশাল তরবারিখানা খাপ থেকে খুলে ধরে ধার পরীক্ষা করছেন। বীরবাহুকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, "তুমি এলে কেন?" তোমাকে তো ডাকিনি। মহামন্ত্রী জীবককে খবর দিতে বলেছি।"

বীরবাহু আমতা-আমতা করে বলল, "মহারাজ, তিনি তো নেই!"

মহাচূড়ামণি বললেন, "নেই মানে? কোথায় গেছেন? আমার হুকুম ছাড়া মহামন্ত্রী অন্য কোথায় গেলেন?"

বীরবাহু বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, তিনি কোথাও যাননি। আপনিই আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁকে..."

মহাচূড়ামণির এবার মনে পড়ল। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "ওঃ হো, আমি আদেশ দিয়েছিলাম তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে। তিনি একজন মিথ্যুক! তা কারাগারে অখাদ্য খেয়ে তাঁর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এবার তাঁকে ছেড়ে দাও। এখানে নিয়ে এসো!"

বীরবাহু বলল, "মহারাজ, তিনি বেঁচে নেই!"

মহাচূড়ামণি এবার খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "বেঁচে নেই মানে? এক রাত্তির কারাবাস করেই তিনি মরে গেলেন? তাঁকে আমি শূলে চড়াবার ভয় দেখিয়েছিলাম। শুধু ভয়ই দেখিয়েছিলাম, সত্যি-সত্যি কি আর মারতাম! এর মধ্যেই তিনি ভয়ে মরে গেলেন? তিনি এত কাপুরুষ! ছিঃ!"

বীরবাহু বলল, "তিনি এমনি-এমনি মরে যাননি। নিহত হয়েছেন!"

"নিহত হয়েছেন? জীবককে কে হত্যা করল? এক্ষুনি সেই হত্যাকারীকে ধরে আনো আমার কাছে!"

"মহারাজ, কে খুন করেছে তা এখনও ধরা যায়নি।"

"তুমি নগর কোটাল, তুমি একটা খুনিকে ধরতে পারোনি। তুমি অপদার্থ! তুমি নিষ্কর্মার ঢেঁকি! তোমাকেই শাস্তি দেওয়া উচিত! তোমাকে আমি...তোমাকে আমি..."

মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ারখানা তুললেন। মনে হল যেন তিনিই এখুনি এক কোপে বীরবাহুর মুণ্ডুটা কেটে ফেলবেন!

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে মহাচূড়ামণি বলতে লাগলেন, "তোমাকে আমি এমন শাস্তি দেব, এমন শাস্তি,...যাও, আজ থেকে তুমি মহামন্ত্রী হয়ে গেলে! তুমি নগর কোটাল থাকার যোগ্যই নও!"

বীরবাহু হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। এই নাকি শাস্তি? নগর কোটালের থেকে মহামন্ত্রী পদ অনেক উঁচুতে!

মহাচূড়ামণি বললেন, "বীরবাহু, এই মুহূর্ত থেকে তুমি মহামন্ত্রী হলে! এবার বলো তো রাজ্যের অন্যান্য খবর?"

বীরবাহু গদগদ কণ্ঠে বলল, "মহারাজ, আপনাকে শতকোটি প্রণাম। আপনি আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিলেন তা আমি যথাসাধ্য পালন করব। আপনি জেগে উঠলেই রাজপুরোহিত ছন্তী একবার দেখা করতে চেয়েছেন।"

মহাচূড়ামণি বললেন, "প্রথম দায়িত্বটাই তো পালন করোনি দেখছি! আমি অনেকক্ষণ জেগে উঠেছি, তবু রাজপুরোহিতকে খবর দাওনি? যাও!"

বীরবাহু দৌড়ে চলে গেল, আবার ফিরে এল একটু পরেই। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মহারাজ, রাজপুরোহিত ছন্তী এখন যজ্ঞে বসেছেন!"

মহারাজ মহাচূড়ামণি একবার দাঁত কিড়মিড় করলেন, রাজপুরোহিত যখন যজ্ঞ করতে বসেন, তখন কেউ তাঁকে ডাকতে পারে না। এমনকী রাজার আদেশেও তিনি যজ্ঞ ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য নন। এ-রাজ্যে এরকমই নিয়ম।

একটুক্ষণ চিন্তা করে মহারাজ বললেন, "চলো, আমি যজ্ঞশালায় যাব!"

লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি প্রাসাদ থেকে নেমে এলেন। রাজসভার পাশেই যজ্ঞশালা। এই সময় কোন্ যজ্ঞ হবার কথা, তা মহাচূড়ামণির মনে পড়ল না। অবশ্য রাজপুরোহিত যখন-তখন যজ্ঞের ব্যবস্থা করতে পারেন।

যজ্ঞশালায় একটি কুণ্ডের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেখানে আর কোনও পুরোহিত নেই, বিশেষ কিছু আয়োজনও নেই, শুধু ছণ্ডী একা মন্ত্র পাঠ করে চলেছেন।

রাজা এসে বসলেন ছণ্ডীর পাশে। বীরবাহু একটু দূরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছণ্ডী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখলেন রাজাকে, কিন্তু মন্ত্র পাঠ থামালেন না। অনেকক্ষণ ধরে চলল সেই যজ্ঞ। তারপর এক সময় তিনি ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওঃ! কী লম্বা-লম্বা শ্লোক আপনি মুখস্থ রাখতে পারেন। মনে হচ্ছিল যেন সারা রাত্রিতেও আপনার যজ্ঞ শেষ হবে না!"

ছণ্ডী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এ-রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই আমি যজ্ঞ করছিলাম। মহারাজ, এ-রাজ্যে আবার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।"

মহাচূড়ামণি বললেন, "রাজ্য চালাতে গেলে পদে-পদে বিপদ ঘটবেই। আমার মাথায় এই যে স্বর্ণ মুকুট, তা আসলে কাঁটার মুকুট, তাই না! তবে, কোনও বিপদকেই আমি ভয় পাই না। মহারানি তলতাদেবীর বুদ্ধি আর আমার বাহুবলে সব বিপদকেই জয় করতে পারি। রাজপুরোহিত, আপনি শুনেছেন কি, এ-রাজ্যের ভূতপূর্ব মহামন্ত্রী জীবককে কেউ খুন করেছে?"

ছণ্ডী বললেন, "হ্যাঁ শুনেছি। তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।"

মহারাজ বললেন, "কে তাঁকে খুন করল? কার আদেশে মারল? আমি মহামন্ত্রীকে শূলে চড়াবার ভয় দেখিয়েছিলাম মাত্র। আমি জেগে ওঠার আগে তো তাঁকে মারার কোনও কথা ছিল না!"

ছণ্ডী বললেন, "জীবক নিশ্চয়ই কোনও গোপন কথা জানতেন। সেই জন্যই কেউ তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।"

মহারাজ বললেন, "বীরবাহু, কাল দুপুরের আগেই আমি সেই হত্যাকারীকে দেখতে চাই।"

তারপর তিনি ছণ্ডীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি রাজ্যের কোন্ বিপদের কথা বলছেন?"

ছণ্ডী হাতের ইঙ্গিতে বীরবাহুকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। তারপর একটা প্রসাদের ফল রাজার হাতে তুলে দিলেন।

মহারাজ বললেন, "আমি আজ এত ভোজন করেছি যে আর একটা ফল খাওয়ারও জায়গা নেই পেটে। এটা আমি মাথায় ঠেকিয়ে রাখলাম। এবার আপনার বিপদের খবর বলুন।"

ছণ্ডী ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, "মহারাজ, বিপদের সংবাদ দুটি। প্রথমটাই আগে বলি। চম্পক বিদ্রোহ করেছে।"

মহারাজ খুবই অবাক হয়ে বললেন, "চম্পক? সে আবার কে?"

ছণ্ডী বললেন, "চম্পককে চিনতে পারছেন না? আপনার সেনাপতি। যাকে আপনি সেনাপতির পদ থেকে ছাড়িয়ে আপনার জুতো পরাবার কাজ দিয়েছিলেন!"

মহারাজ ভুরু নাচিয়ে বললেন, "সেই চম্পক?"

সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আকাশ ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন। এমন মজার কথা যেন তিনি জীবনে শোনেননি। হাসির দমকে তাঁর সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

তারপর তিনি বললেন, "ওই ননীর পুতুল চম্পক! সে তো যুদ্ধ করতেই জানে না! সে আবার বিদ্রোহ করবে কি?"

ছণ্ডী বললেন, "সে অনেক পাহাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করেছে। তাদের নিয়ে উত্তর দিকের জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।"

মহারাজ বললেন, "ওই ছুঁচোটার বুঝি মরার সাধ হয়েছে? আমার নামে উত্তরে সব ক'টি রাজ্য ভয়ে কাঁপে, আমার সঙ্গে লড়াই করবে ওই ছুঁচোটা? ওকে আমি কচু-কাটা করব। ওর মুণ্ডুটা কেটে ফেলে তা নিয়ে আমি গেণ্ডুয়া খেলব। ওর হাত-পা টুকরো টুকরো করে চিতাবাঘ দিয়ে খাওয়াব। না, না, এতেও ওর ঠিক শাস্তি হবে না, ওই ফর্সা মর্কটটাকে ধরে গলায় শিকল বেঁধে নিয়ে আসব, ওকে দিয়ে আমার জুতো পরাবার কাজটাই করাব। প্রত্যেকদিন ও জিভ দিয়ে আমার জুতো চাটবে।"

ছণ্ডী বললেন, "মহারাজ, তার বেশ কিছু দুর্ধর্ষ সৈন্য আছে। আপনি তো জানেন। পাহাড়ি জাতির যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেও রাজি, তবু তারা কখনও ভয়ে পালায় না!"

মহারাজ বললেন, "তারা আমাকে দেখে ভয় পাবে! কত সৈন্য সংগ্রহ করেছে চম্পক? এক হাজার, দু' হাজার! বীরবাহু কোথায় গেল! এক্ষুনি আমার সৈন্য সাজাতে বলো! এই দণ্ডেই আমি

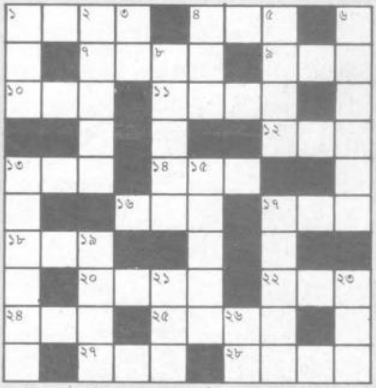

সংকেত : পাশাপাশি : (১) কৃষ্ণের নামে নদ। (৪) এমন লোককে চট্ করে বিশ্বাস কোরো না। (৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস। (৯) বর্ষার ফুল। (১০) বরদাত্রী দেবী। (১১) সৈন্যদল। (১২) ভেক। (১৩) নমাজের জন্য সকলকে উদাত্ত আহ্বান। (১৪) লোভ। (১৬) মূর্খ এমনও হয়। (১৭) প্রথা, নিয়ম। (১৮) অতি চঞ্চল প্রাণী। (২০) ভারতে মুঘল-আধিপত্যে আঘাত হেনেছিলেন এই পাঠান সম্রাট। (২২) জাহাজে বা নৌকোয় পাল-তোলার স্তম্ভ। (২৪) পৃথিবীর উত্তরে আছে। (২৫) 'সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি —'। (২৭) যে-দিদিটিকে কবিতার শিশুটি খুঁজছে। (২৮) দক্ষিণ-ভারতের পর্বত-বিশেষ।

উপর-নীচ : (১) দেবতাদের শত্রু। (২) ঘরের মতো যে-বারান্দা। (৩) সমুদ্র যার আকর। (৪) শিলা। (৫) লাল পদ্ম। (৬) যে-দরবারে সর্বসাধারণের অভাব-অভিযোগ শোনেন রাজা বা মন্ত্রী। (৮) দেশলাই। (১৩) অসম্ভব কল্পনা। (১৫) দূরভ্রমণে যাত্রীদের সঙ্গে থাকবেই। (১৭) বিষ্ণুপুরে দ্রষ্টব্য, তবে মন্দির নয়। (১৯) মেরুদণ্ডের এক-একটি অংশ। (২১) যা চিনেছে গোপালঠাকুর। (২৩) ভাগ্যপরীক্ষা। (২৬) মান্য ব্যক্তি।

গত সংখ্যার সমাধান

কি	ন্ন	র		প	র্ব	ত		ম	উ
ং		সা	কা	র		স	র	সি	জ
ক	যা	য়		শ	ব	র			বু
র্ত		ন	ল	পা			গু	বা	ক
ব্য	গ্র			থ	ই		হা	য়	
	হ	ল		র	ব			না	চ
আ	ণ	ব			ন	বা	বি		ম
ঙ্গি			গ	র	ব		হ	ঠা	ৎ
র	ঘু	প	তি		তু	র	ঙ্গ		কা
স	ম		ক	বি	তা		ম	ন্দা	র

যুদ্ধযাত্রা করব!"

মহাচূড়ামণি তাঁর বুকে চাপড় মারতে মারতে বললেন, "যুদ্ধ করতেই আমার ভাল লাগে! একবার বেরোলে চম্পকটাকে তো শেষ করবই, আরও দু'-একটা রাজ্য জয় করে আসব। মহারানিকে একটা খবর দিতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই এখন ঘুমিয়ে আছেন। একবার তাঁকে বলে না গেলে দুঃখ পাবেন।"

ছন্তী বললেন, "মহারাজ, এখনও আপনি দ্বিতীয় বিপদের সংবাদটা শোনেননি!"

মহাচূড়ামণি বললেন, "ও, আর একটাও আছে নাকি! আর কেউ বিদ্রোহ করেছে? বলুন, বলুন, তার কথাও বলুন?"

ছন্তী তাঁর উত্তরীয়ের তলা থেকে একটি রেশমের কাপড়ের পত্র বার করলেন। তারপর একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এটা পড়ে দেখুন, মহারাজ।"

মহাচূড়ামণি অস্থির ভাবে বললেন, "ও-সব লেখাপড়ার ব্যাপার তো আপনাদেরই। আমি কি পড়তে জানি! আপনিই পড়ে শোনান!"

ছন্তী বললেন, "মহারাজ, এটা পড়তে আমার খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে। আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না! এই পত্র পাঠিয়েছে চম্পক। সে লিখেছে যে সে এই রাজ্যের লক্ষ্মী, প্রজাদের পরম শ্রদ্ধার মহারানি তলতাদেবীকে বন্দী করেছে!"

কথাটা যেন মহারাজ বুঝতেই পারলেন না। তিনি কপাল পর্যন্ত ভুরু তুলে বললেন, "মহারানিকে বন্দী করেছে? তাঁকে পেল কোথা থেকে? আপনি যে বললেন, সে উত্তর সীমান্তের জঙ্গলে শিবির ফেলেছে? মহারানি তো রাজপ্রাসাদে ঘুমিয়ে আছেন?"

ছন্তী বললেন,"না মহারাজ, মহারানি এখানে নেই। চম্পক বিদ্রোহ করেছে এই খবর পেয়ে মহারানি নিজে সেই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েছিলেন!"

মহাচূড়ামণি বললেন, "রানি আমাকে না জানিয়ে সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে গেছেন?"

ছন্তী বললেন, "সৈন্য নিয়ে যাননি। সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে ছিল। তিনি ভেবেছিলেন তিনি নিজে গিয়ে বুঝিয়ে বললেই চম্পক শান্ত হবে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ চম্পক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সে এমন নরাধম যে মহারানি তলতাদেবীকে বন্দী করতে তার হাত কাঁপল না!"

মহারাজ মহাচূড়ামণি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটি ঘুরতে লাগল।

তারপর তিনি বিরাট এক হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "ওই নরকের কীট চম্পক কাল আর সূর্যের আলো দেখবে না! আজ রাতেই সে শেষ হবে! আমার রানির গায়ে যে হাত দেয়, তার ছিন্ন মুণ্ড ধুলোয় গড়াবে, তার রক্ত কুকুরে চাটবে!"

মহারাজ তক্ষুনি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে ছন্তী হাত তুলে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "মহারাজ দাঁড়ান। চম্পকের পত্রের বাকি অংশটা এখনও বলা হয়নি! চম্পক লিখেছে, আপনি সিংহাসন ত্যাগ করে দক্ষিণ দেশে চলে যান। সে এসে সিংহাসনে বসবে। আর আপনি যদি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান, তা হলে দূর থেকে আপনাকে দেখেই সে রানি তলতাদেবীকে হত্যা করবে! চম্পককে দমন করতে গেলে আপনি আর মহারানিকে ফিরে পাবেন না!"

মহাচূড়ামণি ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ

সুকুমার রায়কে ক্যাসেট-বন্দী করার কয়েকটি প্রয়াস নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবিদার। দুই খুদে শিল্পী দেবযানী ও অনুপমা ঘোষালকে সঙ্গে নিয়ে অনুপ ঘোষাল সুকুমারের আবোলতাবোলের অদ্ভুতুড়ে জগৎটাকে অবিকল সঙ্গীত-রূপ দিয়েছেন। আবোলতাবোল, গানের গুঁতো, বোম্বাগড়ের রাজা, শব্দকল্পদ্রুম, কী মুস্কিল, খুড়োর কল, রাম গরুড়ের ছানা, প্যাঁচা আর প্যাঁচানী, ভাল রে ভাল

ইত্যাদি বিখ্যাত সব মজাদার ছড়াগুলি সুরের মায়ায় সুন্দর গায়কীতে হয়ে ওঠে এক অসাধারণ সৃষ্টি। সুকুমারের রচনার আজব বর্ণনাগুলি বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনুপ ঘোষালের সুর-সংযোজন এ-ক্ষেত্রে একটি সম্পদ বিশেষ। প্রায় ধ্রুপদী সুরে সুকুমারের মজাদার পঙক্তিগুলিকে সাবলীল সঙ্গীত-রূপ দিয়েছেন তিনি। যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহারও যথোচিত, চমৎকার। তবে কখনও যেন গুপি-বাঘার সুর মনে পড়ে যায়। 'ডানপিটে', ছড়াটিতে পাশ্চাত্যধর্মী যন্ত্র ও সুর-ব্যবহার ঈষৎ কানে লাগে।

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি 'আবোলতাবোল' ক্যাসেট। প্রদীপ ঘোষের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সহ খিচুড়ি, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, ট্যাঁশ গরু, একুশে আইন, কুমড়োপটাশ, আহ্লাদী, রামগরুড়ের ছানা, সৎপাত্র, ফস্কে গেল ইত্যাদি ছড়ার সঙ্গীতরূপ এখানেও হয়ে উঠেছে অসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী এবং শ্রুতিমধুর। দেবদূত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতালি সেনগুপ্ত, অনুসূয়া ঘোষ, চৈতি রায়, শুভা মুখোপাধ্যায়, অশ্রুজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন দত্ত, গোপাল পুরোকায়েত, শঙ্কর ঘোষাল ও পৃথা ঘোষ প্রমুখ শিল্পীরা সুন্দর গেয়েছেন। কিন্তু প্রতিটি গানের আগে গদ্য-ভূমিকার কোনও প্রয়োজন ছিল না। মনে হয়, পরিচালক

যেন শ্রোতার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তত নির্ভর করতে পারেননি, সে-জন্যেই একটু ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন!

কুশল চক্রবর্তীর পরিচালনায়, জ্যোতিভূষণ চাকীর সঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার রায়ের অনবদ্য রচনা 'হযবরল' এবং হাসির নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' শীর্ষক এক জোড়া ক্যাসেট। 'আবোলতাবোল'-এর ছড়ার ছন্দে সুর-যোজনা করা যদিও সম্ভব, কিন্তু 'হযবরল'-এর গদ্যরচনাকে ছন্দোবদ্ধ করা ততটাই দুরূহ। তবে সে-ক্ষেত্রে পরিচালক নাটকীয় সংলাপের সাহায্য পেয়েছেন। সংলাপ, গান, সুর, আবহ মিলে ক্যাসেটটি হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য উপহার। তবে সংলাপের ক্ষেত্রে কখনও-সখনও মূল রচনা থেকে একটু-আধটু অপ্রয়োজনীয় পার্থক্য চোখে পড়ে।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল সুকুমার সাহিত্যের একটি অন্যতম সম্পদ। আবোল তাবোল বা হযবরল-এর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত হলেও লক্ষ্মণের শক্তিশেল যে কোনও অংশেই কম শক্তিশালী নয়, তা ক্যাসেটটি শুনে আর-একবার বোঝা গেল। রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, হনুমান, জাম্বুবান ইত্যাদি পৌরাণিক চরিত্রগুলি নিয়ে সুকুমার রায় যে অনায়াস মজা করেছিলেন তা প্রতিটি খুদে অভিনেতা এত সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে যে অবাক না-হয়ে উপায় থাকে না। সুকুমারের রচনার রূপ, রস, ঘ্রাণ সম্পূর্ণ টের পাওয়া যায় ক্যাসেটটিতে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, হাসির ফোয়ারায় এ-এক আশ্চর্য প্রকাশনা। ক্যাসেটটি শোনার আগে সুমুদ্রিত ভুল বানানে 'লক্ষনের' শব্দটি দেখে যে-চক্ষুপীড়া হয় তা সম্পূর্ণ মুছে যায় এর আদ্যোপান্ত সার্থকতায়।

আবোল তাবোল। এইচ এম ভি
আবোল তাবোল, হযবরল ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল। সাউন্ড উইং

গৌতম ঘোষদস্তিদার

শিশুকণ্ঠের গান

শিখা ও মানিক সরকারের কথায়, মানিক সরকারের সুরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের দুই কন্যা আট বছরের পিয়া ও পাঁচ বছরের পায়েলের কণ্ঠে 'পিয়া পায়েলের গান' শীর্ষক একজোড়া ক্যাসেট। ছড়ার গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে ক্যাসেট দুটি শ্রুতিমধুর। প্রথমটিতে (তাই তাই তাই) মিষ্টি সকাল আকাশে, তাই তাই তাই, হারাধনের দশটি ছেলে, মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, স্বপ্নপুর থেকে, ছোট্ট পুতুল সোনা, বুড়ি ছোঁয়া ইত্যাদি গানগুলির সঙ্গে রয়েছে যন্ত্রসঙ্গীতে দুটি গানের সুর। দ্বিতীয়টিতে (ছুঁচো কত্তার বিয়ে) আছে ছুঁচো কত্তার বিয়ে, সান্টা ক্লজ, ঝিঁঝি পোকা, অজগর, যাচ্ছি আমি মোস্কোকো, অ্যাস্ট্রোনট ইত্যাদি ছড়ার গান এবং দুটি গানের যন্ত্রসঙ্গীত-রূপ।

গানের কথা এবং সুরে ঈপ্সিত মজা খুব একটা নেই। নেই নতুনত্ব আবিষ্কারের তেমন কোনও আনন্দ। ছড়ার গানে চড়া বাজনা, চড়া সুর একেবারেই সুপ্রযুক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রানুষঙ্গ গানের কথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। পিয়া ও পায়েলের গলায় সুর আছে। কিন্তু তাদের উচ্চারণ বিষয়ে পরিচালকের আরও সচেতনতার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

'ছুটি'-র বদলে 'চুটি' বা 'ফুল'-এর উচ্চারণ 'পুল', কিংবা 'সঙ্গে'-র পরিবর্তে 'সোঙ্গে' বড় শ্রুতিকটু। মানিক সরকার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গেয়েছেন 'হারাধনের দশটি ছেলে'। তাঁর কণ্ঠে নিজস্বতা তেমন একটা নেই। প্রচলিত হিন্দি গানের ম্যানারিজিমেও তিনি কিছুটা আক্রান্ত।

তবে দূর বিদেশে রক্তে বাংলা গানের দোলা অনুভব করা এবং তা প্রকাশ করার প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

পিয়া পায়েলের গান। সাউন্ড উইং

ধাঁধা

আমাদের পাড়ার ছবি-আঁকার স্কুলটা রমরম করে চলছে। এবারের বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে আঁকার স্কুলটায় সুন্দর সুন্দর সব অনুষ্ঠান হল। ছবি-আঁকার প্রতিযোগিতা তো ছিলই। বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। স্কুল বাড়িটার সামনের বারান্দা জুড়ে টাঙানো হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিযোগীর আঁকা রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি। কত রকমভাবে যে রবীন্দ্রনাথের মুখ এঁকেছে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তা বলে এমন ভেবে নেবার কারণ নেই যে, নানারকম মানেই 'সাতনকলে আসল খাস্তা'। সত্যি-সত্যিই অবাক করে দেওয়ার মতো এক-একটা ছবি। কয়েকজন ছেলেমেয়ে আবার কাগজের উপর কলম-পেনসিল-তুলি চালানোর বদলে ডিমের খোলার উপরে চাইনিজ কালি দিয়ে এঁকেছে রবীন্দ্রনাথের মুখ। এগুলো অবশ্য মূল প্রতিযোগিতার বাইরে। এগুলো তাই বিক্রি করা হচ্ছিল পাঁচ টাকা করে। ঘরের মধ্যে সাজানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের কিছু সংলাপ। তার পাশে আঁকা নাটকের দৃশ্য। এগুলো অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের করা নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৈরি। এ ছাড়াও দুটো সন্ধে জুড়ে হল গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা। ছোট্‌কা একদিন গিয়েছিল বক্তৃতা করতে। সেদিন আমি যাইনি। আমাকে নিয়ে ছোট্‌কা ধাঁধার মতো করে বলল স্কুলটা সম্পর্কে। সেটা বলছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ ছবি-আঁকার স্কুলে ছেলেরা আঁকা শেখে, মেয়েরাও। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এখনই ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রসংখ্যার থেকে ১৬ বেশি। মজা এই যে, ছাত্রসংখ্যা যদি যা আছে তার আটগুণ হত, আর ছাত্রীসংখ্যা হত এখনকার ছ' গুণ, তা হলেও মেয়েদের মোট সংখ্যা বেশি হত। আরও মজার ব্যাপার হল, সেক্ষেত্রেও ব্যবধান একই থাকত। অর্থাৎ সেই ১৬। ক'জন ছাত্রী এখন স্কুলটায়, ছাত্রসংখ্যাই বা কত ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ তারা আকাশে থাকে না, থাকে দেওয়ালে ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

কেপতলিশ

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৪০ টাকার জামা ৩৫ টাকায় কিনলে লাভ হয় শতকরা ১৪·২৮ টাকা। ৩৫ টাকার জামা ৩০ টাকায় কিনলে লাভ শতকরা ১৬·৬৬ টাকা। তাই দ্বিতীয়টি কেনাই বেশি লাভজনক। (২) ৮টা ডিম। (৩) নতনাসিক মানে খ্যাঁদা নাক।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলা বারোটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা বারোটা টুথপিক দিয়ে।

কাঠি বারোটাকে টেবিলের উপর এখানে দেখানো ছবির আদলে সাজাও। আদলটা অবশ্য চেনাই মনে হবে। জ্যামিতির বইতে দেখে থাকতে পারো। ইংরেজিতে বলা হয় Mexagon, বাংলা পরিভাষায় ষট্‌কোণ। নাকি ষড়ভুজ ? সে যাই বলুক না কেন, আমাদের দরকার কাঠি দিয়ে ছবিটা তৈরি করে ফেলা। সেটা প্রথমে করে ফেলো।

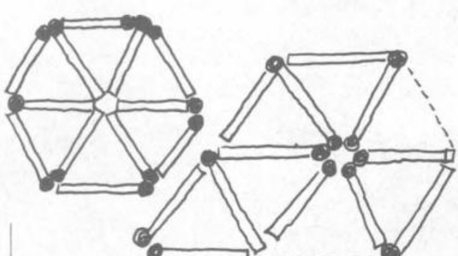

করেছ তো ? বেশ। এবার কী করতে হবে বলছি। যে-কোনও দুটো কাঠি তুলে ফের সেই কাঠি দুটোকে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে এই ছবির ছ'টা ত্রিভুজের বদলে তখন টেবিলে থাকে মোট পাঁচটা ত্রিভুজ।

ছবিটা কি তখন একই রকম দেখতে থাকবে ? এ-প্রশ্ন যদি মনে ওঠে, তা হলে বলব, ভুল ভেবেছ। কেননা, ছবি তো পালটাতে বাধ্য। আর সেই পরিবর্তিত ছবিটার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, কীভাবে করতে হবে সমস্যার সমাধান। নিজে এই সমাধান না করতে পারলে কিন্তু বন্ধুদের ঠকাতে যেয়ো না। তারাই তখন দুয়ো দেবে তোমাকে।

যে-কাঠি দুটো তুলবে তা···চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।

মজারু

কত কথা

চাঁদের দুটি প্রতিশব্দ 'চন্দ্র' আর 'চন্দ্রমা'। খেয়াল করো, 'চন্দ্র' শব্দটিকে বাড়িয়েই 'চন্দ্রমা' করা হয়েছে। যেখানে 'চন্দ্র' বললেই চলে সেখানে 'চন্দ্রমা' বলার দরকারটা কী ? আসলে সমার্থক হলেও দুটি শব্দ দু'রকমের ভাব প্রকাশ করে, ব্যবহারের ক্ষেত্রও হয়

আলাদা-আলাদা। এবারে 'উট' ও 'ঘোড়া'র এরকমই দুটি করে প্রতিশব্দ বলো তো। মনে রেখো, একটিকে বাড়িয়ে তৈরি করতে হবে আর-একটি প্রতিশব্দ যেমন চন্দ্র থেকে চন্দ্রমা।

২। প্রশ্নের মারপ্যাঁচ বুঝে চটপট উত্তর দিতে হবে :

(ক) কোন্ রস ফুল ?

(খ) কোন্ রথ সারথি ?

(গ) কোন্ পথ পথ নয়, পথ বলে ভুল হয় ?

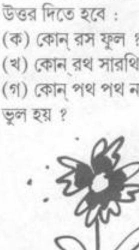

উত্তর : ১। উট (ক্রমেল, ক্রমেলক), ঘোড়া (তুরঙ্গ, তুরঙ্গম)। ২। (ক) তামরস, অর্থাৎ পদ্মফুল। ((খ) অধিরথ। (গ) ছায়াপথ।

কথক

ধাঁধানো ছবি

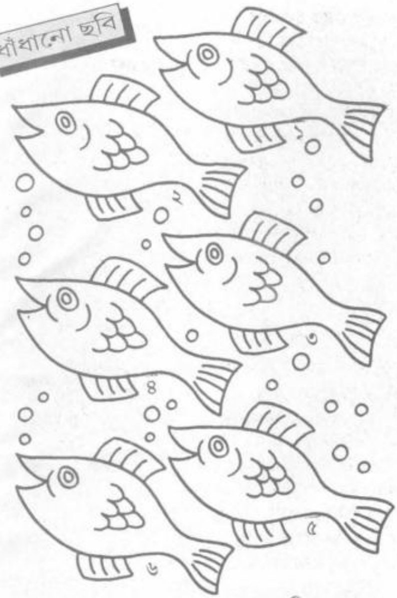

ছবিতে আছে মোট ছ'টি মাছ। এর মধ্যে দুটি মাছ হুবহু এক। দেখে মনে হচ্ছে সবক'টিই একরকম। তা কিন্তু নয়। এবার খুঁজে বার করার পালা—কোন্ দুটি এক।

তারপর যদি ভাল লাগে অ্যাকোয়োরিয়ামের পাশে বসে তোমার মনের মতো রং করে নিও।

উত্তর : ১ নম্বর এবং ৪ নম্বর।

চিত্রক

ট্যানগ্রাম

সাতটা টুকরো দিয়ে যে অসংখ্য ছবি বানানো যায় তা তোমরা কিছুটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এই ছবি দিয়ে দেওয়াল-পত্রিকা অথবা স্ক্র্যাপ-বুক সাজাতে পারো। কিংবা অবসর সময়ে নতুন-কিছু ছবি তৈরিতে ব্যস্ত থাকতে পারো।

গত সংখ্যার খরগোশের সমাধান দেওয়া হল। সঙ্গে রইল আরও একটা খরগোশ। এবার দু'খানা

পাখির ছবি দেওয়া হল। উপরের পাখিটা নিজেরা চেষ্টা করে দ্যাখো। না পারলে আগামী সংখ্যায় দেখে নিও। সঙ্গে থাকবে আরও কয়েকটা পাখি।

প্রবীর

হাসিখুশি

বন্যার জলে পথঘাট ডুবে গেছে। মালগাড়ি যাচ্ছিল, তাই দেখে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, "কী সর্বনাশ! রেললাইন জলের তলায় ডুবে গেছে—কী করে যে ড্রাইভার পথ খুঁজে পাচ্ছে সেই জানে।"

কিসের ফোটো

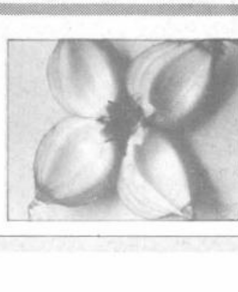

গত সংখ্যায় ছিল গোরুর মুখের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

আঁকিবুকি

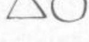

কল্পনায় ফুটে উঠুক

এবারে দ্যাখো তিনজন মানুষ বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কাজ করছে। তোমরা এ-থেকে আরও অনেক কিছু কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে পারো। চেষ্টা করে দ্যাখোই না।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার কলকাতা

একশো কবির কলকাতা
সম্পাদনা : অমিতাভ চৌধুরী, সরল দে
মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩
দাম : ১৫ টাকা

কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে 'একশো কবির কলকাতা'-র মতো একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, সঙ্কলনটির যা হওয়া উচিত তা

হয়ে ওঠেনি। এর জন্য সম্পাদকদের দায়ী করা ছাড়া উপায় থাকে না। গোড়ার দিকে উঁচু মানের কিছু রচনা সযত্নে পরিবেশিত হলেও, পৃষ্ঠা-সংখ্যা যতই বেড়েছে, যে-কোনও কারণেই হোক, হেঁজিপেঁজি লেখাগুলো ততই সদর্পে স্থান করে নিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আরও কিছু শ্রম ও চিন্তার প্রশ্ন থেকে যায়। কলকাতা কবির শহর, কবিতার শহর, সঙ্কলনটিতে এমন কিছু কলকাতাপ্রেমী প্রধান ও নবীন কবি বাদ পড়েছেন, যাঁদের রচনা ছাড়া এ-ধরনের সঙ্কলন প্রকাশের কোনও অর্থ হয় না। আরও একটি কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, এত ছবি ও এহেন সব ছবির পরিকল্পনা সহসা কেন সম্পাদক, প্রকাশক ও শিল্পীর মাথায় এল! প্রতিটি পাতায় যত্রতত্র ছবি আর ছবি। দুঃখে মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে : হায় কলকাতা, 'স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর', হেরি এ কী দুর্দশা তোর! আর চিরকাল সব ব্যাপারেই কি 'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' হয়ে থাকবে? না হলে 'দেখায়'-এর সঙ্গে 'বানায়', 'থেকে'-র সঙ্গে 'লোকে'-র আজব মিল আজব শহর কলকেতা-কে উপহাস করার আজব উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়? এতৎ সত্ত্বেও সম্পাদকরা ধন্যবাদার্হ হন যখনই 'সব শেয়ালের মাথায় টুপি/সব কুকুরের লেজ কাটা', 'মাথা বনবন/ ঘোরে, পনপন/ ওড়ে কী—মশা না বিচ্ছু?' কিংবা 'সুড়ং দিয়ে নামছে মানুষ/ যাচ্ছে রসাতল', অথবা 'কলকাতাতে কাল কাটাতে/ রাখবে শুধু মালুম/ ডাইনে বাঁয়ে চতুর্দিকে/ মিনিবাসের হালুম' মন ভাল করে দেয়।
প্রচ্ছদ এবং ছাপা সুন্দর।

হিমাংশু জানা

বিরাট মাপের মানুষের ছোট্ট জীবনকথা

ভারতপথিক জওহরলাল
আশিস সান্যাল
মণ্ডল অ্যান্ড সন্স
কলকাতা-৭৩
দাম : ১০ টাকা

এ-বছর স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা এবং নব ভারতের অন্যতম রূপকার জওহরলাল নেহরুর জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে দিকে দিকে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে। চিন্তানায়ক জওহরলালের জীবন ও কর্মকাণ্ডের অনেক কাহিনী জানা যাচ্ছে। বইও বেরোচ্ছে প্রচুর। 'ভারতপথিক জওহরলাল'ও এরকম একটি বই। শিশুদের

মতো করে জওহরলালের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী। টুকরো টুকরো ভাবে বইটিতে জওহরলালকে উপস্থিত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনকাহিনী। অনিবার্যভাবেই বইটিতে এসেছে মোতিলাল নেহরু, গান্ধীজি, অ্যানি বেসান্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ। রয়েছে ছোট ছোট কৌতূহলকর কয়েকটি ঘটনা, বিশেষত শিশু জওহরলালের কিছু কীর্তি-কাহিনী। ঝরঝরে তরতরে ভাষা। সহজ সরল ভঙ্গিতে লেখা। এক নিশ্বাসে টানা পড়ে ফেলা যায়। বড় বড় টাইপে পরিষ্কার ঝকঝকে ছাপা। পাতায় পাতায় ছবি। সব মিলিয়ে যাদের জন্য বইটি লেখা, সেই ছোটরা খুশি হবে বইটি হাতে পেলে।

নীলাঞ্জন সরকার

নানা রঙের গল্প

ছুটির দিনে
অলকা মজুমদার
নবপত্র প্রকাশন
কলকাতা-৭৩
দাম : ১৫ টাকা

এই বইটির লেখিকা সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্ভবত নবাগত। এঁর লেখা আগে কখনও সেভাবে পড়েছি বলে মনে পড়ে না। হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রোমাঞ্চ কাহিনী—সব মিলিয়ে আটত্রিশটি গল্পের সঙ্কলন 'ছুটির দিনে' বইটিতে লেখিকার সামর্থ্যের পরিচয় মিলবে। তিনি গল্প বলতে জানেন। কাহিনী-গ্রন্থনায় তাঁর কুশলতা আছে। তাঁর ভাষাও গল্পের উপযোগী, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল।
'আশুকাকা' ও 'ছুটির দিনে' গল্প দুটিতে মহত্ত্বের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। পুরীর সমুদ্রে প্রবল ঢেউয়ে তলিয়ে যাওয়া প্রবীরের জীবনরক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন 'আশুকাকা'। আর 'ছুটির দিনে' গল্পে দেখতে পাই গাছগাছালি ও ফুলেফলে ভরা বাগানে কিশোর তোতন প্রজাপতি আর ফড়িং ধরতে গিয়ে অসাবধানে পুকুরের জলে তলিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামলাল

ক্ষিপ্র গতিতে জলে নেমে তার জীবন বাঁচান। কাহিনীর ঠাসবুননে দুটি গল্পই সত্য এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'ঘেরাও' গল্পটিতে লেখিকা পাঠকদের ওপর সুবিচার করেননি। কলেজের অধ্যক্ষ অশ্বিনীবাবু পরীক্ষার হলে ছাত্রদের তাড়া খেয়ে যেভাবে আত্মরক্ষা করলেন—তা অত্যন্ত অসঙ্গত ও অরুচিকর। 'দুর্ঘটনা' গল্পে নীরব শিল্পী পরেশবাবুকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কাহিনীটিও সাহিত্যরুচিকে বিঘ্নিত করে। ভবিষ্যতে, লেখিকা এ-ব্যাপারে সতর্ক হলে পাঠকরা উপকৃত হবেন।

পরেশচন্দ্র সরকার

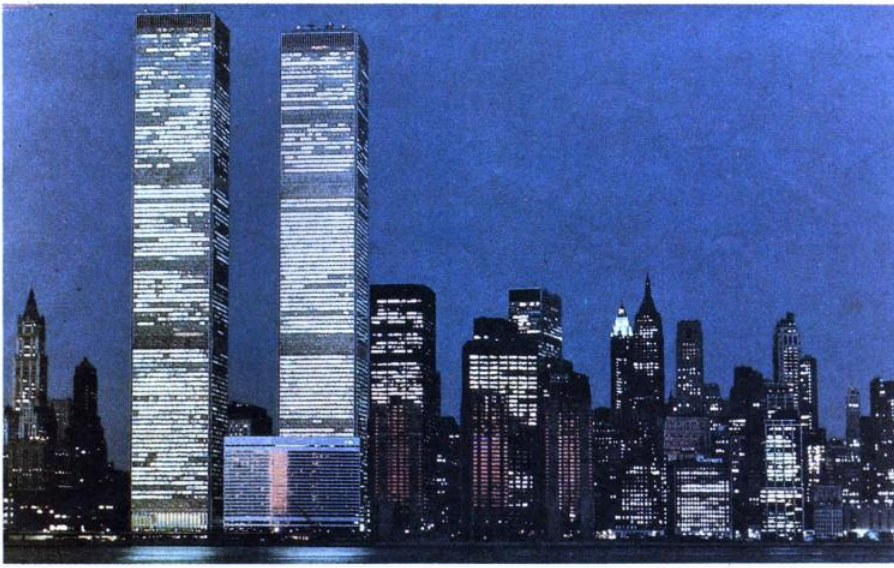

Any Bengali living here probably reads Prabasi Anandabazar every week.

New York

Prabasi Anandabazar was created exclusively
for the Bengalis living abroad.
Every week, we lead our readers to places of great interest.
We give them a complete package of news and features.
With topics ranging from politics to recipes; from
beauty-tips and fashion to literature and sport.
Thirty two pages with offset-printing clarity—
including eight pages in sparkling colour.
We sell the kind of quality that's tried and true.
We give advertisers an exclusive, affluent clientele
and a perfect environment.

Prabasi Anandabazar: The international weekly from The Ananda Bazar Group of Publications.

প্রবাসী আনন্দবাজার

WB CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN MS(C) 731
আর যখন নিঝুম সন্ধ্যার আমেজে মন ছেয়ে যায়
সেই মধুর মুহূর্ত গুলির অংশ গ্রহণে আরও
আনন্দ পাওয়া যায়!
nutrine
Chocolate
Eclairs
নিউট্রিন
চকোলেট এক্লায়ারে
THE FINEST, WIDEST RANGE
nutrine
India's largest selling sweets
আরও দুধ, আরও মাখন, আরও চকোলেট
Visesh/NC/8829/Ben